রহস্যভেদী বাসব

(পঞ্চম খণ্ড

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

RAHASYAVEDI BASAB (5th Part)

By

Krishanu Bandhopadhyay

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৫৬

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকা

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ : দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স

৩২, বিডন রো : কলিকাতা-৬

আমার পরমহিতৈষী—
শ্রীযুক্তা অমিয়া মুখোপাধ্যায়
মাননীয়াষু—

ব আড়চোখে শৈবালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পাইপ ধরাল।
টেরটপের উপর তাস পেতে পেতে এক মনে শৈবাল পেসেন্স খেলে চলেছে।
এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ার পর বাসব বলল, ডাক্তার, তোমার কত বয়স হল ?
মুখ তুলে বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, আমার বয়স ! হঠাৎ—
—বলই না।
—বিয়াল্লিশ চলেছে। কি ব্যাপার বলতো ?
—তেমন কিছু নয়। তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছি। গত জানুয়ারিতে
মও পা দিয়েছি বিয়াল্লিশে।
মুখে হাসি টেনে শৈবাল বলল, তোমার কি একবারও মনে হয় না, গত
/ চৌদ্দ বছর আগেই তোমার বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ?
—ছিল তো বটেই। হয়নি। অর্থাৎ আমি করিনি। ব্যাপারটা কি জানো,
ম যে পেশায় যুক্ত আছি তাতে ঐ সব ঝামেলার মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়।
—তুমি বলতে চাও গোয়েন্দাদের বিয়ে করতে নেই। কোন গোয়েন্দা
নও বিয়ে করেনি ?
বাসব মৃদু হেসে বলল, আমি একবারও সে কথা বলিনি। অনেকেই
য় করেছে—অনেকেই বিয়ে করবে। তবে বলতে বাধা নেই ঐ সব গোয়েন্দা-
পেশার প্রতি মমত্ববোধ নেই। তারা রহস্যের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে
একাগ্রতার অভাবে।
দ্রুত গলায় শৈবাল বলল, দেখা যাচ্ছে, তুমি বলতে চাও সোমা কে আমি
ুণ ভালবাসি কাজেই অপারেশনের টেবিলে আমি ব্যর্থ ?
·একেবারেই তা নয়। আমি বলতে চাই রহস্যের মধ্যে থাকাই আমার
ন্দ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিবিড় রহস্যময় ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে
জকে যুক্ত রাখব। লোকও তাই পছন্দ করে। দেখ না, কত জটিল সমস্ত
পার নিয়ে লোকে আমার কাছেই আসে। পিছুটান নেই বলেই তো সঙ্গে
ঝাঁপিয়ে পড়ে কত হেলায় কুলে পেঁাছে যাই।
·········এদন্ত কিন্তু বাসবের সাজে। পাঠক সাধারণ যে তাকে গভীর
ব পছন্দ করেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত "রহস্যভেদী
ব" এর বিপুল চাহিদা। পঞ্চম খন্ড প্রকাশের মুখে আমি আশা রাখব,
রও বাসব প্রতিবারের মত সকলকে মুগ্ধ করবে—হতবাক করে দেবে।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

ডার্লিং ডেন

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সুনীল আকাশের দিকে তাকালো। পশ্চিমদিকে অল্প অল্প মেঘ জমেছে। সারারাত ধরে বৃষ্টি হবে কিনা এখনই অবশ্য জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। রাণীগঞ্জ বাজারের একধারে সুনীল নিজের গাঢ় নীল রং-এর অ্যাম্বাসাডারে বসে ছিল। আজই ঘণ্টা দুয়েক আগে যাত্রী নিয়ে এখানে এসেছে, ফিরিয়ে নেবার তাগিদ না থাকলে এতক্ষণ বর্ধমানের পথে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

বর্ধমানে সকলে সুনীলকে মনা মাস্টার নামেই বেশি করে চেনে। ওখানকারই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সে। খেলাধুলা নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় মাতামাতি করার দরুণ লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঠিক যুৎসই হল না। বারকয়েক পরীক্ষার হলে উপস্থিত হয়েও গ্র্যাজুয়েট হতে পারল না সুনীল।

অগত্যা জীবন সংগ্রামে নেমে পড়তে হল। সে ভালই জানত চাকরির চেষ্টা করার অর্থই হল সময়ের অপচয় করা। খুঁটির জোর যখন নেই তখন ওপথ না মাড়িয়ে ব্যবসার চেষ্টা করতে লাগল। ভাগ্যক্রমে হাতে এসে পড়ল এই অ্যামবাসাডারখানা। তারপর থেকেই সে মোটামুটি দূরপাল্লার যাত্রীদের নিয়ে আসা-যাওয়া করছে। আয় খারাপ নয়। বলতে গেলে সুনীল এখন ভালই আছে। অবশ্য একটা খুঁত রয়ে গেছে। তার ট্যাক্সির পারমিট নেই। ধরা পড়ে গেলেই চিত্তির। অবশ্য সুনীল নিজের মনকে বুঝিয়েছে, রিস্ক নিতেই হয়—নাহলে আজকের দিনে স্বাধীনভাবে টাকা রোজগার করা সহজসাধ্য নয়।

দুপুরে রাণীগঞ্জ এসেছিল জনাকয়েক লোককে নিয়ে। খাওয়া দাওয়া এখানেই সেরেছে। তারপর থেকে চলেছে অপেক্ষার পালা। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে মন চায় না। প্যাসেঞ্জারের আশায় থাকতেই হয়। অবশ্য সন্ধ্যা উতরে যাবার পর আর অপেক্ষা করবে না। প্যাসেঞ্জার পাওয়া না গেলেও ফিরে যাবে বর্ধমান।

সময় গড়িয়ে চলল।

ইতিমধ্যে সুনীল তিনটে সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করেছে। ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মেঘ আকাশে আরো বিস্তার লাভ করেছে। কিছুটা বিরক্তভাবে চতুর্থ সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল—লক্ষ্য করল, দুজন লোক গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। দুজনের পরণে জেল্লাদার পোশাক। চালচলনে বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে।

—গাড়ি খালি আছে ?

বক্তার চেহারা দেখবার মত। গজস্কন্ধ মহাভুজ। মাথার চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এলেও সুবিন্যস্ত। ভরাটগলার আওয়াজ ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। সঙ্গীটি কিন্তু ঠিক বিপরীত।

ছোটখাট চেহারা। মুখের ভাব দেখলে মনে হয় ধূর্ততা আর ভালমানুষী

এরকম জোচ্চর প্যাসেঞ্জারের মুখোমুখি আগে হতে হয়নি। এখন কি করা যায়। এতগুলো টাকা তো ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। ভেতরে ঢুকে গিয়ে ব্যাটাকে ধরবে নাকি? ব্যাপারটা তাহলে অন্যদিকে মোড় নিতে পারে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুনীল সিগারেট ধরাল।

ওদিকে—

ডার্লিং ডেনের প্রধান হল তখন জমজমাট। লাইলাক পেরেরা সবেমাত্র মিষ্টি গলায় গান শেষ করে ডাইস থেকে সরে গেছে। অবশ্য অরকেস্ট্রা পার্টি এখনও রয়েছে। মৃদু ছন্দে বেজে চলেছে ড্রাম। এইবারের প্রতিষ্ঠা খুব বেশি দিনের না হলেও, খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই অর্জন করে ফেলেছে। অনেকের ধারণা মেয়েদের নিয়ে এখানে যে ধরনের কেলেঙ্কারি চলে তার তুলনা মেলা ভার। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন এমন অভিজাত-বার কলকাতায় আর দুটি নেই।

এহেন ডার্লিং ডেনের সুবিখ্যাত ম্যানেজার শিবশংকর চক্রবর্তী তীক্ষ্ন চোখে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করছিলেন একপাশে দাঁড়িয়ে। ছিপ ছিপে শিব-শংকরের মুখের দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। তিনি দেখছিলেন ওয়েটাররা ঠিক মত গ্রাহকদের আদেশ পালন করছে কিনা। বলাবাহুল্য এই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি ছিল, নামী ও দামীরা কে কে আসছেন এবং কোথায় বসছেন।

—চক্রবর্তী—

ঝটিতে মুখ ঘোরালেন শিবশংকর।

থ্রিপিস স্যুটে সজ্জিত ডার্লিং ডেনের স্বত্বাধিকারী মলয় গাঙ্গুলী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারা যায়নি। দৈর্ঘে তিনি আশাতীত না হলেও প্রস্থে তিনি ভালই। মুখে গাম্ভির্যের আবরণ। ডান হাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে ডিউক অব ডারহাম জ্বলছে।

—বলুন স্যার—

—ওই লোকটি কে? আগেও যেন কয়েকবার দেখেছি।

—কার কথা বলছেন স্যার।

—রিসেপশন কাউন্টারের সামনে যে সুবেশ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কথা বলছি। ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শিবশংকর বললেন, স্যার উনি অনুপ ভট্টাচারিয়া। ব্যাংক জগতের একজন নামকরা লোক।

—অর্থাৎ—

—ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের ছোটকর্তা।

—আই সি। মলয় গাঙ্গুলী ডিউক অব ডারহামে ঘন ঘন কয়েকবার টান দেবার পর আবার বললেন, এমন সমস্ত লোক আমাদের এখানে যত বেশি আসে ততই ভাল। তবে—

—বলুন স্যার।

—ভদ্রলোক রিসেপশান কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি করছেন বলতো?

—উনি মণিকার সঙ্গে কথা বলছেন স্যার। যখনই আসেন লক্ষ্য করেছি, মণিকার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা না বলে ড্রিংকের অর্ডার দেন না।

—ভাল কথা নয় চক্রবর্তী। মণিকার মত সুন্দরী রিসেপশনিষ্টদের সঙ্গে দামী খদ্দেররা মাখামাখি করুক তা আমি কখনই চাইব না। তুমি আজই শ্রীমতীকে সাবধান করে দেবে।

মণিকা স্যার সেরকম মেয়ে নয়।······মানে······

—মেয়েদের সম্পর্কে কিছু জোর দিয়ে বলতে যেও না। ওরা ভারি ভাবপ্রবণ। ওই সুবেশ ভদ্রলোকের রকম সকম আমার খুব ভাল ঠেকছে না। উনি যদি মণিকাকে ম্যানেজ করে ফেলেন, ভারি ঝামেলা হবে। ওর মত ভাল রিসেপশান গার্ল আমরা আর পাব না। তুমি এগিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ কর।

শিবশংকর সবেমাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন, মলয় গাঙ্গুলী আবার বললেন আর হ্যাঁ, মণিকাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

রিসেপশান কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অনুপ ভট্চায তখন বলছেন, এই একঘেয়ে কাজ আপনার ভাল লাগে? আপনার মত মেয়ের আরো বেটার অ্যাটাচমেণ্টে থাকা উচিত। মিষ্টি মেয়ে মণিকা একটু হেসে বলল, বেটার সুযোগ আর কে দিচ্ছে বলুন?

—আপনি রাজি থাকলে আমি দেব।

ঠিক এই সময় শিবশংকর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—কি সৌভাগ্য আপনি এসেছেন। এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন স্যার, আপনার জন্য ভাল একটা টেবিলের ব্যবস্থা করি।

আচমকা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনুপ ভট্চায বিলক্ষণ বিরক্ত হলেন। অবশ্য কিছু বললেন না। মুখে ভদ্রতার হাসি ছায়া ফেলল। স্মার্ট চেহারার অধিকারী তিনি। একমাথা কোঁকড়া চুল আর লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা তাঁকে আরো সুদৃশ্য করে তুলেছে। ইতিমধ্যে তুড়ি বাজিয়ে শিবশংকর একজন ওয়েটারকে ডেকেছেন।

সে কাছে আসতেই বললেন, সাহেবকে সাত নম্বর টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাও। বাকী চেয়ারগুলো সরিয়ে নেবে। যান স্যার, ফরেন লিকার প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই করে জানাবেন। আমরা সব রকম ব্যবস্থাই রাখি।

ভট্চায আর বাক্য ব্যয় না করে ওয়েটারকে অনুসরণ করলেন। ঠিক এইসময় ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত ভরাট গলা এবং তাঁর সঙ্গী নিরীহ স্বভাবের কালিদাস।

—একি, তাপসবাবু যে! অনেকদিন পরে······

ঘন ঘন এখানে না আসাই ভাল। আমাকে মিঃ লাহা বলবেন, বুঝেছেন।

ও সমস্ত বাবু-টাবুতে আমার রুচি নেই।

তাপস লাহা গলা নামালেন।

—আপনার কর্তা আছেন না সন্ধ্যার মুখেই কেটে পড়েছেন?

—আছেন মিঃ লাহা।

—দ্যাটস্ রাইট। সময় নষ্ট করে লাভ নেই কালিদাস। চল, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি। কালিদাস নির্বিবার মুখে বলল, যা বলেছেন বস্। কিন্তু—

—কি হল আবার?

—সেই চিঁড়িয়া এখনও রয়েছে। কেমন কায়দা মেরে বসে আছে দেখছেন?

—তাইতো।

তাপস লাহা ভাল করে একবার মণিকাকে দেখে নিলেন।

ময়না এখনও ডালে বসে আছে। ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়নি! ওহে ম্যানেজার আপনাদের কর্তার বাহাদুরী আছে।

কথা শেষ করেই তিনি কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে এগুলেন।

কপাল কুঁচকে মণিকা বলল, ভারি অসভ্য।

—কি আর করা যাবে বল? শিবশঙ্কর বললেন, কর্তার বন্ধুদের তো আর কিছু বলা যাবে না। শোন, অতিথিরা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেই তুমি কর্তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

—ব্যাপার কি?

—বলতে পারব না।

ইতিমধ্যে তাপস লাহা আর কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে মলয় গাঙ্গুলী নিজের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। দরজায় চাবি লাগিয়ে বসতে অনুরোধ করছেন অতিথিদের। তারপর এগিয়ে ধরেছেন ডিউক অব ডারহামের প্যাকেট।

প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে, নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে তাপস লাহা বললেন, আপনার স্ট্যাণ্ডার্ড তো ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখছি। ফুরিয়ে গেলে পাচ্ছেন কোথায়?

মৃদু হেসে গাঙ্গুলী বললেন, পয়সা ফেললে কলকাতা শহরে সব কিছুই পাওয়া যায় একথা কে না জানে বলুন?

—তা বটে। নাও হে কালিদাস, একটা বিলিতি চুসকাঠি ঠোঁটের আগায় তুলে নাও। গাঙ্গুলী মশাই, প্যাকেটের বাকী কটা সিগারেট কিন্তু আমি নিজের পকেটেই রাখলাম।

—রাখুন। টাকা এনেছেন?

—মাল তৈরি আছে?

—আছে।

কালিদাসের হাতে একটা বড় সাইজের ব্রিফকেস ছিল। সেটা টেবিলের

উপর রেখে তাপস বললেন, ত্রিশ হাজার আছে।

—মাত্র! ফোনে আপনাকে জানিয়েছিলাম, এবারের কারবার প'চাত্তর হাজার টাকার কমে হবে না।

—আমার মনে আছে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এর চেয়ে বেশি টাকা সংগ্রহ করা গেল না।

—তাহলে আজ আসুন।

—তার মানে?

সিগারেটটা অ্যাসট্রের উপর চেপে ধরলেন তাপস লাহা।

—কি বলতে চাইছেন আপনি।

মলয় গাঙ্গুলী পকেট থেকে একটা চকচকে চাকতি বার করে একবার লুফে নিলেন। তারপর সেটা ফেললেন পুরু কাচে আচ্ছাদিত টেবিলের উপর। অল্প শব্দ তুলে, উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে উঠল দশভরির সোনার বিস্কুট।

—আমি আলু পটলের কারবার করি না মিঃ লাহা। এমন একটা ব্যাপার নিয়ে রয়েছি যাতে যার তার পক্ষে মাথা গলানো সম্ভব নয়। যদিও আমি মিডলম্যান। তবু আমার কাছ থেকে যাঁরা মাল নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরাও প্রচুর লাভ করছেন।

—বুঝলাম। কিন্তু—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। পুরো টাকাটা ফেলুন, মাল নিয়ে যান। আধ খেঁচড়া ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে তাপস লাহা বললেন, আমি আপনার পুরানো খদ্দের। কিছু সুযোগ সুবিধা আমাকে দেওয়া উচিত।

—মাল হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর পাঠিয়েছি, এর চেয়ে বেশি সুযোগ আপনি আর কি চান? একজন ক্রেতাকেই আমি পুরো মালটা ছাড়বো। আপনার পক্ষে বর্তমানে যখন নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন আর কিছু করার রইল না। বুঝতেই পাচ্ছেন, আমার সময়ের দাম আছে। আপনারা তাহলে এখন আসুন—।

কালিদাস এতক্ষণ পরে কথা বলল, আপনি এভাবে কথা না বললেই ভাল করতেন।

মলয় গাঙ্গুলী হাসলেন।

—ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। সোনা স্মাগলিং-এর কাজে যারা নেমে পড়েছে, তাদের বুকের পাটা মেপে দেখবার মত ফিতে সকলের কাছে থাকে না। আর কিছু বলবার আছে আপনাদের?

—কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই কালিদাস—তাপস লাহা বললেন, আমরা এখন রং বক্সে। পরে মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন নিশ্চয় ওঁর বুকের পাটা মাপবার ফিতে আমাদের পকেটে থাকবে।

ডার্লিং ডেনের বাইরের দৃশ্য তখন অন্য রকম।

তিতিবিরক্ত সুনীল তখনও নিজের গাড়িতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা তিনেক সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লোক দুটো এখনও বেরিয়ে আসেনি। বেরিয়ে আসার পর কিভাবে টাকা আদায় করবে তার পরিকল্পনা যদিও মাথায় নেই। তবু সুনীল এখানে অধৈর্য ভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে।

ওর হাত কয়েক দূরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

প্রকৃত অর্থেই লম্বা বলা চলে এমন একজন ট্যাক্সি থেকে নামলেন। বয়স ত্রিশের কোঠা অতিক্রম করেনি। মভ কালারের থ্রিবটন সুটে সজ্জিত তিনি। অতিমাত্রায় স্মার্ট। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, বার-এর দিকে এগুতে গিয়ে থামলেন। সুনীলের উপর দৃষ্টি পড়তে বিলক্ষণ সচকিত হয়েছেন।

—একি, মনা! তুমি এখানে?

সুনীলও কম অবাক হয়নি।

—সঞ্জীব, তুমি! কলকাতায় কবে এসেছ?

—দিন পনের হল। এখন কয়েক বছর কলকাতায় থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে এখানে যে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি। কি করছো আজকাল?

সুনীল আর সঞ্জীব একই জায়গাকার ছেলে। একই স্কুলে পড়েছে, একই সঙ্গে দুষ্টুমি করে বেড়িয়েছে। বয়সকালে কাফেতে বসে চা-এর আসরে তুফান তুলেছে। তারপর সঞ্জীব এক জার্মান মেডিক্যাল ফার্মের প্রতিনিধিত্ব করতে চলে গিয়েছিল বিহারের নানা শহরে। বহুদিন দুই বন্ধুর আর দেখা হয়নি।

মুখে হাসি টেনে সুনীল বলল, ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না জানতাম। তাই নিউজ পেপারে সিচুয়েসন ভ্যাকেন্ট দেখা ছেড়ে দিয়ে এই গাড়িটা নিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। আয় মোটামুটি খারাপ হচ্ছে না।

—বহুদিন পরে দেখা হল।

—বছর তিনেক পরে তো বটেই। কলকাতায় কোথায় বাসা নিলে?

—ভাগ্যক্রমে মহানির্বান রোডে একটা ভাল ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি। দেখা যখন হল, তোমায় কিন্তু ছাড়ছি না। গল্প করে রাত কাবার করে দেব। আগে কি রকম কেটেছে বলতো? সে সমস্ত দিনের কথা মনে পড়ে?

মৃদু হেসে সুনীল বলল, সে সমস্ত দিন আর ফিরে আসবে না। কলকাতায় এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে উদয় হলে কিভাবে?

এবার সঞ্জীব হাসল।

—হৃদয় ঘটিত ব্যাপারে বলতে পার।

—অর্থাৎ—

—কাজের ব্যাপারে মুঙ্গেরে ছিলাম কিছুদিন। ওখানেই একটি মেয়ের

সঙ্গে বেশ জমে উঠেছিল। তোমাকে কি বলব, ভারি মিষ্টি মেয়ে।

—তারপর কি হল ?

—আমার কপাল ভাঙল বলতে পার। হঠাৎ আমায় মুঙ্গেরের বাইরে যেতে হল মাস ছয়েকের জন্য। ফিরে এসে আর দেখা পেলাম না। ওর বাবা রিটায়ার করে সকলকে নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন।

—খুবই পরিতাপের বিষয়। তবু তো ব্যাপারটা সরল হচ্ছে না। তুমি সেই মেয়েটিকে খুঁজতে এই বার-এ এসেছ ?

সঞ্জীব দ্রুত-গলায় বলল, ধীরে বন্ধু ধীরে। আগে আমার কথাটা শোন। ওই রকম পরিস্থিতিতে পড়ে দারুণ মুসড়ে পড়লাম। কিভাবে তার সন্ধান পাওয়া যায় তাই নিয়ে যখন খুব মাথাটাতা ঘামাচ্ছি, তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে একদিন বলেছিল, কলকাতার ডার্লিং ডেন নামে একটা বারে তার এক বান্ধবী কাজ করে—বান্ধবীকে চিঠি লেখে মাঝে মাঝে।

—বুঝলাম। সেই বান্ধবীর কাছ থেকে তুমি তার ঠিকানাটা সংগ্রহ করতে চাও এই তো ?

—একজ্যাক্টলি।

—বান্ধবীর নাম জান ?

—না। এখানকার রিসেপসনিস্ট।

—এমনও তো হতে পারে, সেই মেয়েটি আর কাজ করে না। এখন যে রিসেপসানে আছে সে অন্য কেউ।

—হতে যে না পারে তা নয়। তবু আমায় একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ ? কোন প্যাসেঞ্জার দাঁড় করিয়ে রেখেছে নাকি ?

আক্ষেপের স্বরে সুনীল বলল, আর বল না। দুটো হস্তেল ঘুঘুর পাল্লায় পড়েছি। শালারা দেড়শ টাকার কড়ারে রাণীগঞ্জ থেকে এখানে এসেছে—কি বলব ভাই। ত্রিশ টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

অবাক হয়ে সঞ্জীব বলল, সেকি ! তুমি ছেড়ে দিলে তাদের ?

—ছেড়েছি আর কই। তাইতো এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না। ভেতরে চল। ব্যাটাদের ওখানে পাকড়াও করা যাক।

—ভেতরে যাব !

—না যাবার কি আছে ?

—আমার সাজ-পোশাকটা ঠিক—

—রাখ তোমার সাজ-পোশাক।

সঞ্জীব জোর করে সুনীলকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে তাপস লাহা বেরিয়ে এসেছিলেন মলয় গাঙ্গুলীর ঘর থেকে। জীবনে তিনি অনেক দুরন্ত বাঁক অতিক্রম করেছেন, রাগে সমস্ত

শরীর ঝলসে গেলেও মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না। নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং ফেলতে ফেলতে দুজনে এগিয়ে আসছিলেন।

সঞ্জীব ও সুনীল ভেতরে ঢুকেই মণিকাকে দেখতে পেল। সুনীল বলল, আমার আগে তোমার সমস্যার সমাধান হোক। এবার তুমি কপাল ঠুকে ওই মহিলার দিকে এগিয়ে যাও। উনিই হয়ত তোমার সখী সংবাদের চাবিকাঠি।

—দেখা যাক।

সঞ্জীব টাই নট ঠিক করে নিয়ে মণিকার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আগন্তুককে একঝলক দেখে নিয়ে মিষ্টি গলায় মণিকা বলল, বলুন?

—আপনি পাতা মুখার্জীকে চেনেন?

মণিকার কাজল পরা চোখে বিস্ময়ের ঢল নামল।

সঞ্জীব আবার প্রশ্ন করল, আপনি কতদিন এখানে কাজ করছেন?

—বছর দুয়েক।

—তবে তো আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। বলুন কাইণ্ডলি, আপনি চেনেন তাকে?

—আপনি কে জানতে পারি কি?

—সঞ্জীব ভট্চায। মুঙ্গেরে আমাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। মানে······

মণিকার মুখে হাসির আভাস দেখা গেল এবার।

—পাতার মুখে আপনার নাম শুনেছি।

সঞ্জীব উচ্ছ্বাস চেপে বলল, চেনেন তাহলে। যদি তার ঠিকানাটা বলেন—. মানে···তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হঠাৎ কেটে গেছে। তারপর থেকেই···

—তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? কিন্তু আমি যে তার ঠিকানা জানি, জানলেন কিভাবে?

—আপনি যেমন আমার কথা শুনেছেন, আমিও ঠিক তার মুখ থেকে আপনার কথা শুনেছিলাম। সেই সূত্র ধরেই এখানে চলে এসেছি।

মণিকা কি বলতে গিয়েও থামল।

—প্লিজ, ঠিকানাটা বলুন?

—চক্রবেড়িয়ায় ওরা থাকে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।

ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বার করে ঠিকানাটা মণিকা লিখে দিল। মন্থর পায়ে শিবশঙ্কর এসে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দুজনকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন একবার। উচ্ছ্বসিত সঞ্জীব ধন্যবাদ জানিয়ে সুনীলকে নিয়ে এগুলো একটা টেবিলের দিকে। এবার গলা ভিজিয়ে নেবে।

শিবশঙ্কর বললেন, লোক দুটো কে?

—পরিচয় নেই।

—কি যেন লিখে দিলে ওদের?

আমার এক বান্ধবীর ঠিকানা চাইলেন। ঠিকানাটা লিখে দিলাম।

—তুমি জান, মিঃ গাঙ্গুলী এসমস্ত পছন্দ করেন না। ইদানিং তোমার ব্যাপার স্যাপার একটু অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। বার-এর কাজ মনপ্রাণ ঢেলে করবে এইজন্যই তোমাকে মোটা মাইনে দেওয়া হয়। একথা সব সময় মনে রাখাই ভাল।

তীক্ষ্ণ গলায় মণিকা বলল, মিঃ গাঙ্গুলীও কয়েকবার এই ধরনের কথা আমাকে বলেছেন। তাঁকে জানিয়ে দেবেন আমি কারুর কেনা বাঁদী নই। খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারে আমাকে শাসন করা চলবে না।

—শিবশংকর কিছু বলতে গিয়েও থামলেন। কারণ এই সময় কাচের দরজা ঠেলে যে স্ত্রীলোক প্রবেশ করলেন, তিনি এই বারের পুরানো খদ্দের। মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত আগন্তুক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ক্রীম কালারের সুটে তাঁকে মানিয়েছেও চমৎকার। শিবশংকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

খালি একটা টেবিল ছিল হলের অন্যপ্রান্তে। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই তাপস লাহা আর কালিদাসের উপর দৃষ্টি পড়ল সুনীলের। সে সঞ্জীবের হাত চেপে ধরল।

—কি হল ?

—ষণ্ডা চেহারার লোকটাকে দেখছ ? পাশে ছোটখাট আরেকজন রয়েছে—ওদেরই আমি রাণীগঞ্জ থেকে নিয়ে এসেছি।

—তাই নাকি। এস, ধরা যাক ওদের। প্রথমে মোলায়েম গলায় ভাড়াটা চাইবে। যদি না দেয়, আচ্ছা মত চেপে ধরতে হবে।

ওরা দ্রুত তাপস লাহা আর কালিদাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সুনীল শান্ত গলায় বলল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছি। এবার ভাড়াটা দিয়ে দিলে ভাল হয়।

কালিদাস খিঁচিয়ে উঠল, কিসের ভাড়া ?

ভারি গলায় তাপস লাহা বললেন, আর ঝামেলা বাড়িও না। হাতে এখন অনেক কাজ। ভাড়াটা মিটিয়ে দাও।

অনিচ্ছার সঙ্গেই পকেট থেকে কালিদাস টাকা বার করল। হিসাব মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া তাপস লাহার পিছনে ধাওয়া করল।

—ভালয় ভালয় ব্যাপারটা মিটে গেল। মৃদু হেসে সঞ্জীব বলল, এবার তাহলে নিশ্চিন্তে গেলাসে সাঁতার দেওয়া যেতে পারে।

ওদিকে—

শিবশংকর তখন পুরানো খদ্দেরকে বলছেন, আপনি কয়েকদিন আসেননি স্যার। আমরা তো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। শরীর খারাপ হল নাকি—

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পুরানো খদ্দের সকলকে সচকিত করে

গলা ছেড়ে হাসলেন। তিনি ঈষৎ টলছেন। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে অন্যত্র কয়েক পেগ গলায় ঢেলে তবে এখানে এসেছেন।

বললেন টেনে টেনে, খদ্দের নিয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনার শেষ নেই দেখছি। অবাক কাণ্ড! তবে কি জানেন, স্বর্ণকমল মুখার্জী—মানে এই শর্মা, সহজে অসুখে টসুখে পড়ে না। ভীমের স্বাস্থ্য নিয়ে সে দুনিয়ায় এসেছে।

—তাতো বটেই। কোথায় বসবেন স্যার? ভাল কোন টেবিলের ব্যবস্থা এখানেই করব না, কেবিনে যাবেন?

—কেবিন?

কয়েক পা এগিয়ে স্বর্ণকমল আবার বললেন, কেবিনে সবরকম সুবিধা পাওয়া যাবে তো? আমি কিন্তু বোতলের সঙ্গে একজন সঙ্গীও চাই।

বিনীত ভঙ্গীতে শিবশঙ্কর বললেন, যদি অনুমতি করেন স্যার। তবে আপনার সঙ্গে আমি থাকতে পারি।

—আপনি !!!

আবার স্বর্ণকমল গলা ফাটিয়ে হাসলেন।

—আপনাকে নিয়ে আমি কি করব? আমার সঙ্গিনী চাই মশাই। নেশায় মেজাজ আনতে গেলে ওরকম একটা কিছু না হলে চলে না। লাইম উইথ জিন আর মদালসা একটি মেয়ে, বুঝলেন না—

আবার হাসলেন তিনি।

বিব্রত ভঙ্গীতে শিবশঙ্কর বললেন, আমাদের এখানে তো সে রকম ব্যবস্থা নেই।

—বড়ই পরিতাপের বিষয়। আগে এখানে যতবারই এসেছি বড়ই পানসে লেগেছে। বার-এর নাম দিয়েছেন ডার্লিং ডেন অথচ ডার্লিং এর কোন পাত্তা নেই।

—আসুন স্যার। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো রাম আছে। চেখে দেখুন। স্বাদে গন্ধে একেবারে অপূর্ব।

—চাখতে আপত্তি নেই।

এবার গলা নামালেন স্বর্ণকমল।

—আপনাদের রিসেপশানিস্ট মেয়েটি মনে দাগ কাটার মত। ওকে পাঠিয়ে দিন আমার কেবিনে। এক্সট্রা চার্জ যা লাগে দেব।

শিবশঙ্কর দ্রুতগলায় বললেন, তা হয় না স্যার। মানে···প্রতিষ্ঠানের রেপুটেশানের কথা চিন্তা করে···মানে···

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। আপনাকে আর খাবি খেতে হবে না। এখানে আসা আমার এই শেষবার। নামাবলী গায়ে দেওয়া ব্যাপার আমার একেবারে পছন্দ নয়।

স্বর্ণকমল এগ‍ুলেন।

মণিকা নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল, দশটা বাজতে মিনিট-দ‍ুয়েক দেরি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার ডিউটি শেষ। দশটা বাজার পর এক মিনিট বেশি এই কাউণ্টারের পাশে সে বসে থাকেনি কোনদিন। দ্রুত হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। কাউকে জানিয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই।

বার থেকে বেরিয়ে এল মণিকা।

জওহরলাল নেহের‍ু রোডের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। তারপর বাস বা ট্রাম ধরে নেবে। বসন্ত রায় রোডের একটা ফ্ল্যাটে মণিকা থাকে। বাড়িটা মলয় গাঙ্গ‍ুলীর। তিনতলাটা বাদ দিলে মোট ছটা ফ্ল্যাট আছে। প‍ুরো তিনতলাটা নিয়ে গাঙ্গ‍ুলী একাই থাকেন। মণিকা কল্যাণীর মেয়ে। তার নিজের বলতে কাকা-কাকীমা আর খ‍ুড়তুতো ভাইবোনেরা—তাঁরা সেখানেই থাকেন। বাবা-মা বহ‍ু আগে মারা গেছেন।

চাকরি নেবার পর কল্যাণী থেকে নিয়মিত-যাতায়াত করা অস্ুবিধাজনক বিবেচনা করে মণিকা শ্যামবাজারে একটা ঘর নিয়েছিল। সেই ঘরে অবশ্য ভাগাভাগি করে থাকতে হত খাদ্য দপ্তরের কর্মী রমলা চৌধ‍ুরীর সঙ্গে। কিছ‍ুটা অস্বস্তিকর পরিবেশ ওখানেও ছিল। মাস ছয়েক আগে মিঃ গাঙ্গ‍ুলী প্রস্তাব দিলেন তাঁর একটা ফ্ল্যাটে এসে থাকতে। সানন্দে রাজী হয়ে গিয়েছিল মণিকা। তারপর থেকে ওখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলাকার নানা কথা ভাবতে ভাবতে মণিকা এগিয়ে চলল। বিশেষে সঞ্জীবের নাটকীয়ভাবে আগমন এবং পাতার ঠিকানা জানার জন্য আকুলতার কথাই বেশি করে মনে পড়ছিল। এপথে লোক চলাচল কম। রাত বাড়ার দর‍ুণ পথচারী নেই বললেই চলে। আত্মলীন মণিকা হঠাৎ চমকে উঠল! হর্ণ বাজিয়ে ফুটপাথ ঘেঁসে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজা খ‍ুলে দিয়ে অন‍ুপ ভট্চায বললেন, উঠে আস‍ুন—

দ্বিধাজড়িত গলায় মণিকা বলল, দরকার পড়বে না। কাছেই তো—আমি চলে যেতে পারব।

—প্রত্যহই তো ট্রামে বাসে যান। আজ না হয় আমি পেঁাছে দিলাম।

—না···মানে···

অন‍ুপ একটু শব্দ করে হাসলেন।

—ভয় নেই। আমি একজন সজ্জন ব্যক্তি। মহিলাদের কিভাবে সম্মান দেখাতে হয় তা আমি জানি। উঠে আস‍ুন গাড়িতে, কিছ‍ু কথা আছে।

ইতস্ততভাব নিয়েই মণিকা উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি আবার সচল হল।

—আপনি তো বসন্ত রায় রোডে থাকেন?

সবিস্ময়ে মণিকা বলল, আপনি কিভাবে জানলেন ?

অনুপের মুখে হাসির আভাস দেখা দিল।

—আপনার সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর আমায় নিতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অনধিকার চর্চার অর্থ কি ? ওই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, কিছু যদি মনে না করেন তবে জানতে চাইছি, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন ?

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন ?

—বি. এ পাশ করেছি।

—চমৎকার ! তবে তো কোন অসুবিধাই নেই। শুনুন মিস চৌধুরী, ডার্লিং ডেন-এর মত নোংরা পরিবেশে আপনার মত মেয়েকে মানায় না। আপনি বোধহয় জানেন, আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন পদস্থ কর্মচারি। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারি। যেমন পারি, আপনার মত গ্র্যাজুয়েট মেয়ের ভাল একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে।

—কিন্তু আপনি আমার জন্য এসমস্ত করবেন কেন ?

—ঠিক কথা। চমৎকার পয়েণ্ট রেজ করেছেন। আজকের দিনে অকারণে কেউ কিছু করে না। আমি এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি নই যে, কোন কারণ ছাড়াই আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি। আসল কথা হল, আপনার সহযোগিতা পেলে আমার একটা স্বার্থ পূরণ হয়।

—আমি আপনার কি কাজে লাগব বুঝতে পাচ্ছি না।

—পারবেন। সমস্ত কথা বললেই পারবেন।

—বলুন ?

—এখন নয়। আমরা প্রায় এসে পড়েছি। সমস্ত গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। সপ্তাহে এমন কোনদিন আছে যেদিন আপনার ডিউটি নেই ?

—ড্রাই-ডেতে আমায় বার-এ যেতে হয় না।

—সেদিন আমাদের কথা হতে পারে। কখন এবং কোথায় আমাদের আলোচনা হবে আগেই আমি জানিয়ে রাখব।

মণিকা এবার কি বলবে ভেবে পেল না।

অনুপ ভারতীর সামনে গাড়ি থামালেন।

ঝুঁকে ওপাশের দরজা খুলে দিয়ে উনি বললেন, ওই কথাই রইল। তবে—

—বলুন ?

—সত্যি যদি আপনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান তবে আমাদের আজকের দেখা সাক্ষাতের কথা কাউকে বলবেন না।

—বেশ।

মণিকা গাড়ি থেকে নেমে সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পার হল। মিনিট

কয়েকের বেশি সময় লাগল না তার বসন্ত রায় রোডের মোড়ে পৌঁছাতে। এখান থেকে মলয় নিবাস-এর দূরত্ব দু'শ গজের মত হবে। এই পথটুকু মণিকা ছায়াচ্ছন্ন মনেই অতিক্রম করল। সন্ধ্যা থেকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বৈচিত্রে ঠাসা ছিল যেন। এমন সমস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে আগে কখনো হতে হয়নি।

মলয় নিবাস-এর দোতলার কোণের দিকের ফ্ল্যাটে সে থাকে।

আস্তানায় পৌঁছে চাবি দিয়ে দরজা খুলল মণিকা। ঘর অন্ধকার। অন্ধকার হাতড়ে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলে উঠল। বুঝতে পারা যায়, এই মাঝারি আয়তনের ঘরখানা অতিথি আপ্যায়নের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে শোবার ঘর, ডায়নিং স্পেস, কিচেন ইত্যাদি। বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে মণিকা কিচেনে এসে দাঁড়াল।

অধিকাংশ দিন বার-য়েই রাতের খাওয়া শেষ করে আসে। চাকরির সর্তের মধ্যেই পড়ে এটা। আজকের মত মাঝে মধ্যে না খেয়ে চলে আসে। এখন যে খুব খিদে পেয়েছে তা নয়, স্টোভ জেনলে তবু মিটসেফ থেকে দুটো ডিম বার করে আনল। পোচ তৈরি হয়ে যাবার পর, চার স্লাইজ রুটিতে মাখন লাগিয়ে দ্রুত সেরে নিল দক্ষিণ হাতের কাজ।

এই সময়টা বড় নিঃসঙ্গ লাগে মণিকার। আগে বই পড়ে বা ট্রানজিস্টার শুনে কিছু সময় কাটিয়ে দিত, এখন আর ও সমস্ত ভাল লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি, তার এই জীবন ভাল লাগে না। আর দশটা মেয়ের মত সে স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। উপায় থাকলে চাকরি সে কোনদিনই করত না। আশার কথা, তার এই জীবনের উপর যবনিকা পড়তে চলেছে। অনুপ ভট্টাচায যে ভাল চাকরির লোভ দেখিয়েছেন তার কোন প্রয়োজন পড়বে না।

তবু ভদ্রলোক কি বলতে চান শুনবে। আর কিছু নয়, আগ্রহ চরিতার্থ করবার জন্যই শুনবে। মণিকা রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল, এগারটা বাজতে দশ। পাতাকে একবার ফোন করলে কেমন হয়? মুঙ্গেরের বন্ধুটি তার খোঁজ খবর করছেন শুনলে সে খুশীই হবে। ঘরে অবশ্য ফোন নেই—নিচে কেয়ার-টেকারের ঘরে আছে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। পাতা নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজ নেই ফোন করে।

আড়মোড়া ভেঙ্গে মণিকা হাই তুলল।

এবার শুয়ে পড়া যেতে পারে।

ঠিক এই সময় দরজায় করাঘাত হল। এই অসময়ে আবার কে এল? ভ্রু-কুঁচকাল মণিকা। আবার মৃদু করাঘাত। দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল সে। সাড়া না নিয়ে দরজা খোলা বোধহয় ঠিক হবে না।

—কে—

—খোল। আমি।

মণিকার মুখের রং বদলে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। স্বর্ণকমল ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ আগে, ডার্লিং ডেন-এ তাকে মাতাল অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। এখন কিন্তু স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিয়েই রয়েছে মনে হল।

—চলে এলাম।

দরজা বন্ধ করতে করতে মণিকা বলল, ভাল করনি। এত সাহস দেখানো মোটেই ভাল নয়।

মৃদু হেসে স্বর্ণকমল বলল, সাহস হল পুরুষের ভূষণ। তাছাড়া কি যেন, এই ফ্ল্যাটবাড়ির মালিক মলয় গাঙ্গুলী হতে পারে, কিন্তু তোমার হৃদয়ের অধীশ্বর আমি। আমার যখন ইচ্ছে হবে এখানে আসব কারুর আপত্তি গ্রাহ্য না করেই।

—কিন্তু সাহসী পুরুষটি আবেগের মাথায় একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের মেলামেশাটা সকলের চোখের আড়ালে হোক এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।

—আমি ভুলে যাইনি দেবী। এখনও সেই পরিকল্পনাই স্ট্যাণ্ড করে আছে। আসল কথাটা হল, আমি সত্যেনকে দিয়ে জব্বর একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। ব্যবস্থাটা এমন হয়েছে যে গাঙ্গুলী রাত তিনটের আগে এখানে ফিরছে না।

—সত্যেন কে?

—আমার একজন বন্ধু। ও সমস্ত কথা থাক। কতদূর এগুলে তাই বল?

—একপাও নয়। মিঃ গাঙ্গুলীর ফ্ল্যাটে তাঁর অজান্তে ঢোকার কোন সুযোগই আমি পাচ্ছি না।

—বলেছিলাম একটু অভিনয় করতে। সাদা কথায় গা বাঁচিয়ে ঢলাঢলি করা যাকে বলে। দেখবে কাতারে কাতারে সুযোগ তোমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তুমি ওপথ দিয়েই হাঁটলে না!

—তুমি বিরক্ত হচ্ছ। কিন্তু দেখ—

—ঠিক আছে। এবার যা করবার আমিই করব।

স্বর্ণকমল মণিকার কাঁধে হাত রাখল।

বললেন আবার, তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে আমি তখন এক ফোঁটাও ড্রিংক করিনি, স্রেফ অভিনয় করে দিয়েছিলাম ডার্লিং ডেনকে।

—আমার ওই রকম সন্দেহ হচ্ছিল। একটা কথা বলবে—মন খুলে বলতে হবে কিন্তু। স্বার্থের জন্য ঘনিষ্ঠতা করছ না, সত্যি আমায় ভালবাস?

মণিকাকে নিজের কাছে টেনে নিল সে।

—স্বার্থের জন্যই আমি তোমার কাছাকাছি হয়েছিলাম এটা ঠিক। বুঝতে কি পাচ্ছ না, এখন গভীরভাবে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। এই

মাসের শেষে কাজে তুমি ইস্তফা দেবে। আমাদের বিয়ে হবে তারপর।

—আমি সব জানি। তবু কেমন সন্দেহ হয়।

—সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবন নিরর্থক। ওকথা এখন থাক। এবার আমি কিন্তু যাব। সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই।

—কোথায় যাবে ?

—এই বাড়ির তিনতলায়। গাঙ্গুলী রাত তিনটের আগে ফিরবে না। এই সুযোগে আমি তার ফ্ল্যাটটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

মণিকার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

—না, তোমার যাওয়া হবে না। ধরা পড়ে গেলে কি বিশ্রী ব্যাপার হবে বলতো ? তাছাড়া ওখানে ঢুকবে কিভাবে ?

—ঝুঁকি না নিয়ে আমার উপায় নেই। তোমার উপর কতদিন ভরসা করে বসে থাকব। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যে তুমি আমার মনমত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আপত্তি কর না। যাহোক একটা হেস্তনেস্ত আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলতে চাই।

মণিকার কাছ থেকে সরে এলেন স্বর্ণকমল।

—চললাম। বুঝলে—

—আপত্তি যখন শুনবে না তখন আর কি বলব।

—রাগ কর না, প্লিজ—

—আমি কিন্তু অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকব। আমার সঙ্গে দেখা করে তবে তুমি বাড়ি যাবে।

—বেশ।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় মণিকা দ্রুতগলায় বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—কি বলতো ?

অনুপ ভট্টাচায-এর প্রস্তাব ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত কথা বলল সে।

স্বর্ণকমলের ভ্রূ-কুঁচকে উঠল।

—একি ঝামেলা। ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মচারি—না, ব্যাপার খুব সুবিধার ঠেকছে না। লোকটা কি ধরনের প্ল্যান ভাঁজছে ভগবান জানেন। যাহোক, এ নিয়ে পরে ভালভাবে মাথা ঘামাতে হবে। এখন আর দামী সময় নষ্ট করতে চাই না। চলি—

সে দরজার দিকে এগুলো।

এখানে স্বর্ণকমল সম্পর্কে দুচার কথা বলে নেওয়াটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বচ্ছল পরিবারেই সে জন্ম নিয়েছিল। বাবার ছিল ওষুধের কারবার। কি খেয়াল হল, অল্প বয়সেই ছেলেকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে

দিলেন। কলেজের প্রথম দিকের বেড়াগুলো পার করতে করতে, একেবারে বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট পাশ করে ছেলে দেশে ফিরবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

মোট আট বছর স্বর্ণকমল লণ্ডনে ছিল। লেখাপড়া ভালভাবেই চালিয়ে গেছে বলা চলে। ওদেশের মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি যে করেননি তা নয়, তবে ওই পর্যন্তই—বিয়ে করবে বলে কাউকে ভরসা দেননি। দেশে ফিরতে হল বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। তিনি কিন্তু স্বচ্ছন্দে আরো কুড়ি বছর বাঁচতে পারতেন।

শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পর স্বর্ণকমল জানতে পারল বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। জানতে পারল মা এবং দুজন পুরানো কর্মচারির মুখ থেকে। কয়েক বছর আগে মলয় গাঙ্গুলী নামে একজনকে নিজের কোম্পানির ম্যানেজার রেখেছিলেন তিনি। লোকটি খুবই বিশ্বস্তজন হয়ে পড়েছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত সেই মলয় গাঙ্গুলীই তাঁকে ডুবিয়েছে। পার্টিদের কাছ থেকে আদায় করা মোটা টাকা নিয়ে সে একদিন সরে পড়েছে। ব্যাপারটা এমন চমৎকার প্ল্যানের সাহায্যে করা হয়েছে যে মলয়কে পুলিশে দেবার কোন উপায় থাকেনি। বলাবাহুল্য এরপর কারবার আর টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ওই শোকেই তিনি মারা গেছেন।

স্বর্ণকমলের মাথায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

তবে রাগের মাথায় তখনই কিছু করে বসল না। পনের দিন ধরে ব্যাপারটা নিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করল, তারপর এসে পেঁছাল সমাধানে। ইতিমধ্যেই সে জানতে পেরেছিল, মলয় গাঙ্গুলী মোটেই গা ঢাকা দিয়ে নেই। বরং বুক ফুলিয়ে আধুনিক ধাঁচের এক 'বার' খুলে বসেছে। কোন বিরল অবকাশে স্বর্ণকমল তাকে গুলি করে মারতে পারে। তবে তা হবে খুব সহজ সমাধান। তাছাড়া নিজেকেও বিপদে জড়িয়ে ফেলা হবে।

চুটিয়ে প্রতিশোধ নিতে গেলে পা ফেলতে হবে বিপরীত কায়দায়। খোওয়া যাওয়া টাকাটা ফেরত আনতে হবে। তারপর মলয়কে জড়িয়ে ফেলতে হবে চূড়ান্ত বেকায়দায়। ওই পথ ধরেই এগুলো স্বর্ণকমল। তার একটা বিষয়ে সুবিধা ছিল, তার মুখ মলয় গাঙ্গুলীর কাছে পরিচিত নয়। এগিয়ে যাবার সহায়ক হিসাবে প্রথমেই সে বেছে নিল মণিকাকে।

মেয়েটি যে শুধু ডার্লিং ডেন-এর রিসেপসানিস্ট তাই নয়, মলয় গাঙ্গুলীর ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকে। মেয়েটিকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। এরপর একটু একটু করে যে কিভাবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলল, সে হল আরেক ইতিহাস। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে এগুলেও, মণিকাকে সত্যি তিনি ভালবেসে ফেললেন শেষ পর্যন্ত।

ক্রমে মণিকার কাছ থেকে কিছু মূল্যবান সংবাদ পাওয়া গেল। মলয় গাঙ্গুলী সোনার চোরাকারবার করেন। ক্রেতারা বার-এই আসে। তবে

তাদের চিহ্নিত করা কঠিন। সোনা কিভাবে সংগৃহীত হয় তা অবশ্য জানা যায় না। ট্যাক্স এবং পুলিশের ভয়ে মলয় সন্দেহ হয় এমন অঙ্কের এক পয়সা বেশি ব্যাঙ্কে রাখেন না। কালো টাকার পাহাড় তাঁর কাছেই থাকে। এই সংবাদই সবচেয়ে জরুরী।

টাকাটা কোথায় রাখা হয়, নিজের ফ্ল্যাটে না ডার্লিং ডেন-এর কোথাও? ভালভাবে মণিকাকে তালিম দিল স্বর্ণকমল। টাকা রাখার ঠিকানাটা যে কোন উপায়ে হোক সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে মলয়ের সংগে ঢলাঢলি করতেও যেন পশ্চাৎপদ না হয়। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মণিকা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সঙ্কোচ আর ভয় তাকে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। অগত্যা স্বর্ণকমলকেই অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এগুতে হচ্ছে।

মণিকার ঘর থেকে বেরুবার পর, এধার ওধার তাকিয়ে সুইচটা স্বর্ণকমল খুঁজে বার করল। এগিয়ে গিয়ে নিভিয়ে দিল বারান্দার আলো। তেতলায় উঠে গেল এবার। পুরো তেতলাটাই মলয় গাঙ্গুলীর দখলে। পরপর তিনখানা ভারি পাল্লাযুক্ত দরজা চেপে বন্ধ করা। ভেতরে সেঁধিয়ে যাবার কোন ফাঁক ফোকরই দেখা যাচ্ছে না। স্বর্ণকমল অবশ্য হতাশ হল না। কারণ সে আগেই জানতো এই পথ ধরে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

তেতলার বারান্দার আলোটাও নিভিয়ে দিল এবার।

অন্ধকারে ভরে গেল চারিধার। বারান্দার রেলিং টপকে কার্নিসের উপর গিয়ে দাঁড়াল। ভাগ্যক্রমে কার্নিস খুব সরু নয়। বেশ ভয় করছে, কিন্তু উপায় নেই। দেওয়ালের সঙ্গে শরীর ঠেসে দিয়ে ঘসটে ঘসটে অতি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল। হাত তিনেক দূরেই পাওয়া গেল ছাদ থেকে নেমে আসা জলের পাইপ।

পাইপ চেপে ধরে দম নিল স্বর্ণকমল। এখান থেকে ঝুলন্ত ব্যালকনির দূরত্ব বেশি নয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। শরীরের ভারে কার্নিসের চুনবালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। পা হড়কালে আর দেখতে হবে না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে সে ক্রমে ব্যালকনির কাছে এসে পড়ল। এইটুকু আসতেই পনের মিনিটের কম সময় লাগেনি।

রেলিং টপকে স্বর্ণকমল ব্যালকনির মধ্যে গিয়ে পড়ল। মণিকার ফ্ল্যাটের ধাঁজ থেকেই সে অনুমান করে নিয়েছিল, এধারের দরজা কাচের হওয়াই সম্ভব। দেখা যাচ্ছে অনুমান তার মিথ্যা নয়। বছর দুয়েক আগে লণ্ডনে কেনা ডানহিল লাইটারটা পকেট থেকে বার করল। তারপর সেটা উঁচিয়ে ধরে সজোরে আঘাত করল কাচের উপর। অল্প শব্দ তুলে কাচের কয়েকটা টুকরো খসে এল।

এরপরের কাজের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। ভাঙ্গা অংশের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে সহজেই দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলা সম্ভব হল। রুমাল দিয়ে

ঘাড় আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে স্বর্ণকমল ভেতরে ঢুকল। এঘরের আলো জ্বালা ঠিক হবে না। আলো রাস্তা থেকে দেখা যেতে পারে। সঙ্গে করে টর্চ না আনার জন্য ভারি খারাপ লাগতে লাগল। অগত্যা লাইটার জ্বালল।

যতদূর মনে হচ্ছে এই ঘরখানা ডাইনিং রুম। লাইটার জ্বালতে জ্বালতে প্রতিটি ঘর মাড়িয়ে এসে ড্রইংরুমে থামল। জানলার বালাই নেই। আলো বাইরে যাবার সম্ভাবনা না থাকায়, সুইচ খুঁজে নিয়ে লাইট জ্বালল স্বর্ণকমল। টাকা যদি এই ফ্ল্যাটেই থাকে তবে কোথায় রাখা হয়েছে অনুমান করা শক্ত। একটা গোদরেজের আলমারি রয়েছে শোবার ঘরে—নিশ্চিতভাবে ওখানে টাকা না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

স্বর্ণকমল এবার নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। প্রাণ হাতে করে এখানে এসে ঢোকার ছেলেমানুষী সে না করলেই পারত। এতগুলো ঘরের কোন দেওয়ালের ফাঁকা অংশে যদি টাকা লুকানো থাকে তার সন্ধান পাবে কি ভাবে? কোন সূত্র হাতে না নিয়েই এইভাবে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করার কোন মানে হয় না।

হতাশ ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ওর মনে পড়ল, খাবার ঘরের ডায়নিং টেবিলটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড়। অন্ততঃ কুড়িজন বসে খেতে পারে। মলয় গাঙ্গুলী এখানে একলা থাকেন। এতবড় ডায়নিং টেবিল রাখার অর্থ কি? অতিথিদের আপ্যায়ন যদি করতে হয়, তবে ডার্লিং ডেনে করবেন, নিজের আস্তানায় এই বিশাল ব্যবস্থা কেন?

ব্যাপারটা বেখাপ্পা ঠেকেছে। স্বর্ণকমল চাঙ্গা হয়ে উঠল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিল একবার, সাড়ে বারটা বাজে। যে ব্যবস্থা করে এসেছে তাতে হাতে এখন প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। টেবিল ঘটিত ব্যতিক্রম নিয়ে এখন স্বচ্ছন্দে খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে। ড্রইংরুমের আলো নিভিয়ে ও আবার ডায়নিং রুমে এল। আলো জ্বালতে না পারার দরুণ পর্বত-প্রমাণ অসুবিধা রয়েই গেল। ডানহিল আবার মিটমিট করে উঠল।

স্তিমিত, কাঁপা কাঁপা লালচে আলোয় টেবিলটা যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল স্বর্ণকমল। সুদৃশ্য ফরমাইকা লাগান দামী আবরণ। চতুর্দিকে চামড়ায় মোড়া সারি সারি চেয়ার। গোটা দুয়েক চেয়ার সরিয়ে, টেবিলের তলার দিকটা সবে দেখছে—ওধার থেকে মৃদু কথাবার্তার রেশ ভেসে এল। ঝটিতে স্বর্ণকমল উঠে দাঁড়াল। প্রত্যাশার অনেক আগেই গাঙ্গুলী ফিরে এসেছে। সঙ্গে আর একজন কেউ রয়েছে।

এখানে অপেক্ষা করা সমিচীন হবে না। দ্রুত হাতে চেয়ার দুটো যথাস্থানে রেখে, ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। যে পথ ধরে এখানে এসেছে, সেই পথ দিয়ে ফেরা যাবে না। ওধারের বারান্দার আলো নিশ্চয়ই জেলে দেওয়া হয়েছে।

গাঙ্গুলীর সঙ্গী এখনই হয়ত বিদায় নেবে—ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

জলের পাইপের সাহায্যেই নিচে নেমে যাবে স্থির করল। ব্যাপারটা খুবই রিস্ক। কিন্তু উপায় কি? আশার কথা পাইপ সরু নয় এবং মাঝে মাঝে লোহার বেড় দেওয়া রয়েছে। দুর্গা বলে নিচে নামতে শুরু করল। অনভ্যাসের দরুণ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছিল। এধারে যদি মণিকার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি পাওয়া যেত, তাহলে তো কথাই ছিল না। অসীম বলে মনের জোর সংগ্রহ করে স্বর্ণকমল নেমে চলল।

ওদিকে মলয় গাঙ্গুলীর ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে তাপস লাহা তখন বলছেন, মাস্টার কী-টা কিরকম উপযোগী দেখছ? এক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা খুলে ফেললাম।

কালিদাস বলল, কিন্তু বস্, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়াই বোধহয় ভাল।

—তুমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও। সিঁড়ির উপর নজর রাখবে। এদিক ওদিক দেখলেই আমাকে খবর দেবে। আমি দ্রুত হাতে কাজ গুছিয়ে নেবার চেষ্টা দেখি।

—মাল কি সত্যি এখানে আছে?

—থাকাতো উচিত। ভালভাবেই জানি, গাঙ্গুলীর আর কোন আস্তানা নেই। হয় মাল এখানে, নয়তো ডার্লিং ডেন-এ আছে। শোন কালিদাস, মাল যেখানেই থাকুক, চোট আমি মারবই। তাপস লাহাকে বেকায়দায় ফেলে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি, মলয় গাঙ্গুলীও পাবে না। নাও, আর দাঁড়িয়ে থেক না, কুইক—

কালিদাস বারান্দায় চলে গেল। তাপস অনুসন্ধানের কাজে নামলেন। তিন সেলের একটা টর্চ ঝলসে উঠতে লাগল এখানে ওখানে। নিজের অপূর্ব চাবির সাহায্যে শোবার ঘরের স্টিলের আলমারির পাল্লা খুলে ফেললেন। আলমারিতে অনেক কিছু থাকলেও প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

দশ টাকার নোটের একটা তাড়া একপাশে রাখা ছিল। তাড়াটা তুলে নিলেন তাপস লাহা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আন্দাজ করলেন, হাজার দুয়েক টাকা আছে। বলা বাহুল্য টাকা পকেটস্থ করলেন। আলমারি বন্ধ করে তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে অনুসন্ধান চালালেন। তাঁকে কিন্তু নিরাশ হতে হল। সন্দেহ ক্রমেই ঘনিভূত হচ্ছে, মাল এখানে নয়, ডার্লিং ডেনের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ডায়নিং রুমে এসে থমকে দাঁড়ালেন তাপস লাহা। ব্যালকনির দিকের খোলা দরজা আর ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো দেখে ভ্রু-কুঁচকালেন। ব্যাপার কি? তাঁদের আসবার আগেই এখানে অন্য কেউ হানা দিয়েছিল নাকি? লোকটা গেল কোথায়? ব্যাপার ক্রমেই জমে উঠছে দেখা যাচ্ছে। তাপস

আরো একটু সতর্ক হলেন।

আড়াইটে বেজে গেল।

ফ্ল্যাট বাড়ির নিচেকার গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে মলয় গাঙ্গুলী বেরিয়ে এলেন। তাঁকে কিছুটা শ্রান্ত দেখাচ্ছে। মুখে বিরক্তির ছাপ। নিজের আস্তানায় ফিরতে এত বিলম্ব তাঁর বড় একটা হয় না। একজনের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে থেকে নিরাশ হয়ে ফিরছেন। প্যাকেট থেকে ডিউক অব ডারহাম বার করে নিজের দু'ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলেন। ফোলিও ব্যাগটা সামলে তৎপরতার সঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

শিবশঙ্কর সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন।

এগিয়ে এসে মলয় বললেন, ভোরেই বেরুতে হবে। অথচ বিশ্রাম করার বেশি সময় পেলাম না। তোমার কি মনে হয়, কেউ রসিকতা করে আমাকে ফল্‌স টেলিফোন করেছিল?

শিবশঙ্কর বললেন, জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না স্যার। হয়তো অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়ায় পার্টি আসতে পারেনি।

—হতে পারে। যা হোক, তোমার আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই। এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে আমরা দুজন টালিগঞ্জে গিয়ে কাজটা সেরে আসব।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

চারধাপ ওঠার পর শিবশঙ্কর বললেন, একটা কথা বলছিলাম স্যার। মানে···তাপস লাহাকে বোধহয় এতটা—

—কি হল?

—লোকটা সুবিধার নয়। ওকে না ঘাঁটালেই বোধহয় ভাল ছিল স্যার।

—কথাটা পরে আমারও মনে এসেছে। যাবার সময় বড় বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে গেছে আমার দিকে। তখন থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছে। ওই ধরনের লোকেদের সঙ্গে এবার থেকে মোলায়েম ব্যবহার করতে হবে। লাহা কোথায় থাকে জানো?

—কে যেন বলছিল পার্কসার্কাসের দিকে থাকে। সঠিক ঠিকানা জানি না। তবে শুনলাম, প্রায়ই বাইরে টাইরে যায়।

দোতলার কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন দুজনে।

বিস্মিত গলায় মলয় বললেন, ব্যাপার কি চক্রবর্তী?

—কি হল স্যার?

—বারান্দা অন্ধকার। বাল্ব ফিউজ হয়ে গেল নাকি?

শিবশঙ্কর তাড়াতাড়ি অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

—বাল্ব তো ঠিক আছে। কোন কারণে কেউ নিভিয়ে দিয়েছিল বোধহয়।

—হয়ত।

তেতলায় পেঁছে দুজনে আবার অবাক হলেন। এ তলার বারান্দাও অন্ধকার। তাঁদের উপস্থিতি কালিদাস আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে ঝটিতে ভেতরে ঢুকে গেছে। শিবশংকর আবার সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

বিরক্তির সুরে মলয় বললেন, দারোয়ানটাকে কালকেই ভাল ভাবে কড়কে দিতে হবে। বসে বসে ব্যাটা মাইনে খাচ্ছে। কোন দিকে তার নজর নেই। একেবারে ভূতের বাড়ি করে রেখেছে।

তিনি জানেন না আরো বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলেন। খোলা অবস্থায় তালা কড়ায় ঝুলছে। বিদেশ থেকে চোরাপথ দিয়ে আনানো বিশেষ ধরনের তালা খুলে ফেলা সহজ কথা নয়। কর্তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শিবশংকরও চমকে উঠলেন।

চাপা গলায় মলয় বললেন, চোর ঢুকেছে।

—আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে।

—সাবধানে এস।

দরজার পাল্লায় চাপ দিতেই খুলে গেল। এবার দুজনে বিস্ময়ের চূড়ান্তে পেঁছে গেলেন। ড্রইংরুম আলোয় ঝলমল করছে। সোফায় স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে বসে তাপস লাহা সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনা করে চলেছেন। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন মলয়। আবার তাঁর রাগ হতে লাগল।

—আসুন—আসুন মিঃ গাঙ্গুলী। আসতে আজ্ঞা হোক—

তীক্ষ্ন গলায় মলয় বললেন, এ সমস্তর মানে কি?

নির্লিপ্ত গলায় তাপস বললেন, এধরনের অনধিকার চর্চা আমি মাঝে মাঝে করে থাকি। দুঃসাহস আবার অনেককে তাজা রাখে জানেন তো?

—প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে। আমি এসে পড়তে পারি এবং তারপরই পুলিশে খবর পাঠাতে পারি একথা বোধহয় আপনার জানা ছিল না?

—কেন থাকবে না। সমস্ত সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখার পরই এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এগিয়ে গিয়ে দয়া করে পুলিশকে রিং করুন।

শিবশঙ্কর টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মলয় বাধা দিলেন।

—দাঁড়াও, চক্রবর্তী—

তাপস জোরে হেসে উঠলেন।

—মিঃ ম্যানেজার, আপনার কর্তার মাথায় এখনও কিছু বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে দেখে খুশী হলাম। পুলিশ এখানে এসে উপস্থিত হলে বিপদ কার বেশি উনি ভালই জানেন। আমি তো আর তখন চুপ করে থাকব না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। চোরাই সোনার কারবার—কি বলেন, মিঃ

গাঙ্গুলী ?

গলা নামিয়ে মলয় বললেন, এইভাবে কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছেন বলবেন কি ?

—নিশ্চয়। কিছু বিস্কুটের সন্ধানে এসেছিলাম।

—পেলেন ?

—না।

রাত অনেক হয়েছে। এবার অনুগ্রহ করে নিষ্কৃতি দিন। বাকী রাতটুকু বিশ্রাম পেলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়।

—আপনাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত-ঘটাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

তাপস ডান হাত ট্রাউজারের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন আবার, যাবার আগে শুধু একটা অনুরোধ, আপনার ফোলিও ব্যাগটা আমায় দিন।

—তার মানে ?

—মানে অতি সরল। আপনার ব্যাগটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মলয় গাঙ্গুলীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

তিনি তীক্ষ্ন গলায় বললেন, বেয়াদপির একটা সীমা আছে। অনেক সহ্য করেছি আর নয়। চক্রবর্তী, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? লোকটাকে ঘর থেকে বার করে দাও।

এগুতে গিয়েও শিবশঙ্করকে থামতে হল।

তাপস লাহার ডান হাতে রিভলবার শোভা পাচ্ছে।

—দুজনের মধ্যে কেউ এক-পা নড়বেন না। আমার হাতে কি দেখছেন তো, পয়েণ্ট থ্রি ম্যাগনাস। দারুণ জিনিস। চোরাপথ দিয়ে যা দু'চারটে এসেছে এদেশে। কালিদাস—

এতক্ষণ ওধারে, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল কালিদাস। আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সে। আরেক দফা অবাক হলেন মলয় এবং শিবশঙ্কর। তাপস যে একা আসেননি। একজন আছে, এ-সম্ভাবনার কথা একেবারে তাঁদের মনে স্থান পায়নি।

—ইয়েস বস্।

—মিঃ গাঙ্গুলীর হাত থেকে ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে নাও।

কালিদাস এক ঝটকায় ব্যাগটা নিজের হাতে এনে ফেলল।

টাল সামলে নিয়ে মলয় বললেন, আপনি কি মনে করছেন, ফোলিওর মধ্যে রাশি রাশি বিস্কুট আছে ?

—না, তা মনে করছি না। বিচিত্র হাসিতে মুখ ভাসিয়ে তাপস বললেন, চোরাই মাল নিয়ে যে আপনি পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি জানি, এই ফোলিওর মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ,

আপনার ডায়রিও—। আর এও জানি, এই সমস্ত পুলিশের হাতে পড়লে আপনি ভয়ংকর বিপদে পড়বেন।

—এরপর আপনি কি করতে চান ?

—সমস্তই নির্ভর করছে আপনার সুমতির উপর।

—তার মানে ?

—আগামী সন্ধ্যায় আমরা 'ডার্লিং ডেন'-এ আসছি। ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনাকে চল্লিশ হাজার টাকার মাল দিতে হবে। বেশ কমের উপর দিয়েই ব্যাপারটা মিটে যাচ্ছে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় ? মাল দেন ভাল, নইলে রাত সাড়ে নটার পর এই ফোলিও ব্যাগ লালবাজারে পেঁৗছে যাবে।

—আমাকে জেলে পাঠিয়ে আপনার তো কোন লাভ হবে না ?

—আপনার সমস্ত প্রতিষ্ঠা ধুলায় গড়াগড়ি খাবে এওতো কম কথা নয়। অবশ্য জানি, আপনি বোকামির পরিচয় দেবেন না। যাহোক, কাল সন্ধ্যায় ঠিক আসছি। গুড নাইট জেণ্টলম্যান। এস. কালিদাস।

তাপস কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে নাটকীয়ভাবেই অদৃশ্য হলেন।

শিবশঙ্কর বললেন, বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। ফোলিওতে অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ আছে। শেষ পর্যন্ত যদি—

তাঁকে বাধা দিয়ে মলয় দ্রুত গলায় বললেন, সময় নষ্ট কর না চক্রবর্তী। তাড়াতাড়ি ধাওয়া কর। ওদের আস্তানার সন্ধান আমার চাই।

শিবশঙ্কর আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্লান্তভাবে সোফায় বসে পড়লেন মলয়। বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিকে হেলায় নিজের কূলে এনেছেন। অথচ আজ—জীবনে এত বড় পরাজয় তাঁর আর কখনও ঘটেনি। পকেট থেকে প্যাকেট বার করে বিমর্ষভাবে তিনি ডিউক অব ডারহাম ধরালেন।

সঞ্জীবের ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে সাতটার সময়। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, বিছানায় নেই। গত সন্ধ্যায় 'ডার্লিং ডেন' থেকে ফিরে আসার পর সঞ্জীব সুনীলকে ছাড়েনি। বহুদিন পরে দেখা। সপ্তাহখানেক দুজনে একসঙ্গে না থাকলেই নয়। একদিন রোজগার না করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বন্ধুর আন্তরিকতা হাসিমুখে অনুভব করছে সুনীল। কাছাকাছি এক গ্যারেজে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করে থেকে গেছে।

সঞ্জীব খাট থেকে নেমে গায়ে ড্রেসিং গাউন গলিয়ে নিল। তার এই ফ্ল্যাটটা বেশ ছিমছাম। সে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও এমন আস্তানা কলকাতায় সংগ্রহ করতে পারত না। অফিসের সহযোগিতায় পাওয়া গেছে। সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, বারান্দায়, বেতের চেয়ারে বসে সুনীল এক মনে খবর কাগজ পড়ছে।

—তুমি কখন উঠলে ?

কাগজ মুড়ে রেখে সুনীল বলল, ঘণ্টা-দুয়েক হল। খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অনেক দিনের অভ্যাস। আমাদের এখন প্রোগ্রাম কি ?

—জলখাবার খাব। অবশ্য কোন রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে।

—তারপর ?

—তোমার গাড়িতে চেপে ভবানীপুর রওনা হয়ে যাব পাতার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর তিনজন মিলে গল্পের ফোয়ারা ছোটাব।

আধঘণ্টার মধ্যেই দুজনে বেরিয়ে পড়ল। গ্যারেজ খুব বেশি দূর নয়। বিরাট এক টিনের চালার তলায় ভাড়া দিয়ে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। বারোয়ারি গ্যারেজ থেকে গাড়ি উদ্ধার করতে আরো পনের মিনিট সময় লেগে গেল। চক্রবেড়িয়া রোডের মুখে পেঁছাল ঠিক নটা কুড়ি মিনিটে।

সঞ্জীব বলল, তুমি এখানে থাক। আমি আসছি।

সুনীল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার ইয়ে'-এর বাপ যদি তাড়া করে আসে ?

—তেমন কিছু ঘটবে না। লোক খারাপ নয়। তাছাড়া আমার সঙ্গে আলাপ আছে।

সঞ্জীবও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এগুলো। নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে খুব বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। সেকেলে প্যাটার্নের হলদে রং-এর একতলা বাড়ি। একটা ছোকরা দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে। চাকর হতে পারে।

—ওহে, নির্মলবাবু বাড়ি আছেন ?

সচকিত হয়ে ছোকরা বলল, আজ্ঞে না। বাজার করতে গেছেন।

—তাঁর মেয়ে ? মানে···

—তিনিও বাড়ি নেই। গানের স্কুলে গেছেন। মা বাড়িতে আছেন। তাঁকে খবর দেব।

—দরকার নেই। গানের স্কুলটা কোথায় বলতে পার ?

—ওই তো ট্রাম রাস্তার উপর।

সঞ্জীব আর কথা না বাড়িয়ে যে পথে এসেছিল, সেই পথ ধরেই ফিরে চলল। তার গমনপথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছোকরা—। ট্রাম রাস্তার উপর যখন গানের স্কুল তখন ওরা যেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে তার আশ-পাশ দিয়েই পাতাকে চক্রবেড়িয়ায় ঢুকতে হবে। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করাই ভাল।

সঞ্জীবের কিন্তু ভাগ্য ভাল বলতে হবে। অল্পদূর এগুবার পরই লক্ষ্য করল, পাতা আসছে। হাতে একটা খাতা। সেই মদালসা ভঙ্গী। আরো যেন দেখতে ভাল হয়ে গেছে। সঞ্জীব দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মন রসাপ্লুত হয়ে উঠেছে। পাতাও এবার দেখতে পেয়েছে ওকে। প্রথমে বিস্ময় তারপর প্রশান্তির ছায়া পড়ল মুখে।

সে দ্রুত এগিয়ে এল।

কাছে এসে হাল্কা-গলায় বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? কখনও মেয়ে দেখনি বুঝি?

—কেন দেখব না। মৃদু হেসে সঞ্জীব বলল, অনেক দেখেছি। তবে তোমার মত মেয়েতো হাজারে হাজারে পাওয়া যায় না। তাই নতুন করে ভালভাবে দেখছিলাম, সেই তুমি কিনা!

—কি দেখলে।

—দেখছি, আদি ও অকৃত্রিম সেই তুমি। আচ্ছা, তোমার শরীরে মায়া দয়া বলে কিছু নেই? হঠাৎ তো মুঙ্গের থেকে গা ঢাকা দিলে। একটা চিঠিও কি দিতে নেই?

—তুমি তো উল্টো চাপ দিচ্ছ। খানকয়েক চিঠি তোমায় দিয়েছিলাম। তুমিই বরং উত্তর দাওনি।

—মিটে গেল ব্যাপারটা। দেখা যাচ্ছে ডাক-বিভাগ আমাদের সঙ্গে প্রচণ্ড রসিকতা করেছে।

—রাস্তায় এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললে লোকে ভাববে কি? এটা আমাদের পাড়া। বাড়িতে এস।

—বাড়িতে নয়, গাড়িতে। মোড়ের মাথায় আমার এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু—

—কিন্তু নয় মাই লেডি। অনেক কথা আছে, যা বাড়িতে বসে হয় না।

পাতা হেসে ফেলল।

—তোমার সব তাতেই ব্যস্ততা।

—আসছ তো? আমি এগুচ্ছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সঞ্জীব এগুলো।

কয়েক মিনিট পরেই পাতা মোড়ে এসে উপস্থিত হল। গাড়ির মধ্যে থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল সঞ্জীব। ইতস্ততঃ করল পাতা। এধার-ওধার তাকিয়ে নিল কয়েকবার। তারপর গাড়িতে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সুনীল স্টার্ট নিল।

ভারি খারাপ লাগছে। আমাকে কেউ যদি দেখে ফেলে থাকে, কি হবে বলতো?

—কিছুই হবে না। সঞ্জীব বলল, আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যতের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলছি। ও-কথা থাক। আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি—সুনীল হুই – পাতা মুখার্জী। ঝরা পাতা নয় কিন্তু, সবুজ আর কচি। পাতা মুখে হাসি টেনে দু'হাত জোড় করল। সুনীল মাথা নোয়াল। তার হাত স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে যুক্ত। সময়োচিত কথাবার্তা হল। অ্যামবাসাডর এগুতে লাগল চৌরঙ্গীর দিকে।

—সুনীল, কি রকম বুঝছ ?

—চমৎকার !

—ফাল্গুন মাসটা পার হতে দেওয়া ঠিক হবে না, কি বল ?

—কখনই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝুলে পড়।

পাতা বলল, বাবা যে তোমার কথা মেনে নেবেন তার কি মানে আছে। তিনি হয়ত অন্যত্র আমার বিয়ে ঠিক করছেন।

ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঞ্জীব বলল, আমার মত পাত্রকে যে হাতছাড়া করতে নেই তা তিনি জানেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ায় সামান্য যে কজন বিবেচক আছেন, তোমার বাবা তাঁদের মধ্যে একজন কিনা।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি থামাল সুনীল।

ঘণ্টাখানেক চিনেবাদাম সহযোগে তিনজনের মধ্যে নানা গল্প হল। সঞ্জীব বলল, সুনীলের সঙ্গে হঠাৎ তার কোথায় দেখা হয়েছে। তারপর দুজনে কিভাবে পাতার ঠিকানা সংগ্রহ করল। আজ সন্ধ্যায় ওরা ডার্লিং ডেন-এ যাবে আরেক দফা মণিকাকে ধন্যবাদ দিতে।

সুনীল পাতার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিও সন্ধ্যার সময় চলুন না ?

সভয়ে পাতা বলল, না, না, আমি যাব না। ওখানে লোকে মদটদ খায়—

সঞ্জীব বলল, খেলেই বা। নেশা করে সকলে মারামারি করে ভেবেছ নাকি ? অ্যারিস্টক্রেটিক ব্যাপার। নতুন জগৎ। অনেক অভিজ্ঞতা হবে।

—অভিজ্ঞতায় কাজ নেই। আমি যাব না।

—ছেলেমানুষী কর না। সিনেমা যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়বে বাড়ি থেকে। ওখানে দারুণ খাওয়া-দাওয়া হবে। তারপর—

পাতা হেসে ফেলল।

—তোমার সব তাতেই জেদ। আমার মতামত বলে বুঝি কিছু নেই ?

সুনীল বলল, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। মেয়েরা যখন হেসে ফেলে তখন বুঝতে হবে তারা রাজি আছে।

এবার তিনজনেই হেসে উঠল।

সবে সন্ধ্যা সাতটা হলেও ডার্লিং ডেন জমজমাট। আজ অবশ্য বিশেষ প্রোগ্রাম আছে। দৈনিক-পত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। বম্বের ললি আহুজার ক্যাবারে এই প্রথমবার আজ কলকাতায় হবে। অন্যান্য আয়োজনও পরিপাটি ভাবে করে রাখা হয়েছে।

এই সু-ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোন দিন হলে শিবশংকরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন মলয় গাঙ্গুলী। আজ মন মেজাজ ভাল নয়। ও-সমস্ত দিকে নজরই দিলেন না। ভ্রু-কুঁচকে ডিউক অব ডারহাম টানতে টানতে শুধু খদ্দেরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছেন। তাপস লাহা বা তার সঙ্গীর এখনও দেখা নেই। গত রাত্রে শিবশংকর ওদের পিছু নিতে পারেন নি। পথে

নেমেই দুজনে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

সিগারেটের টুকরোটা নিকটস্থ টেবিলের উপরকার অ্যাসট্রেতে গ‍ুঁজে দিয়ে মলয় ইশারায় শিবশঙ্করকে কাছে ডাকলেন। ফোলিও ব্যাগটার জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ওর মধ্যেকার কাগজপত্র যদি পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে, তবে আর দেখতে হবে না। শিবশঙ্কর খদ্দেরদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে ব্যস্ত ছিলেন। কর্তার আহ্বানে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর কাছে চলে এলেন।

—তাপস লাহার এখনও দেখা নেই।

—তাইতো দেখছি স্যার। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সে আসবে নিশ্চয়।

—তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন?

—আমাদের পুলিশে দিয়ে তার তো কোন লাভ নেই। তার মাল চাই। ওই ফোলিওর বিনিময়ে সে কিছু রোজগার করে নিতে চায়। তাই বলছিলাম সে আসবেই।

—হুঁ। লোক ঠিক আছে তো? এসে পড়লেই ফোলিওটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করবে। তারপর গলা ধাক্কা দিয়ে বার থেকে বের করে দেবে।

শিবশঙ্কর মৃদুগলায় বললেন, সেই রকম ব্যবস্থাই করেছি স্যার।

মলয় এই সময় লক্ষ্য করলেন, কাচের ভারি পাল্লা সরিয়ে অনুপ ভট্চায ভেতরে প্রবেশ করলেন। হাসিমুখে দাঁড়ালেন মণিকার সামনে। কি সমস্ত বলতে লাগলেন। এতদূর থেকে সে সমস্ত কথা তাঁরা শুনতে পেলেন না।

—এই লোকটাই কাল মণিকাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল না?

—হ্যাঁ, স্যার। দারোয়ান তো সে কথাই বলেছে।

—ওঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বল। বুঝিয়ে দাও, এধরনের কার্যকলাপকে আমরা ব্যাড প্রাকটিশ বলে মনে করি।

—গুড ইভনিং স্যার। আসুন, আপনাকে একটা ভাল টেবিলে নিয়ে যাই।

ডার্লিং ডেন-এর ম্যানেজারকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অনুপ ভট্চায বললেন, ব্যাপার কি বলুন তো মশাই। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফেউ-এর মত আমার পেছনে লেগে যান?

—বিনয়ের হাসি হেসে শিবশঙ্কর বললেন, এ আপনি কি বলছেন স্যার। আপনাদের সুখ-সুবিধা দেখার জন্যই আমাকে রাখা হয়েছে। দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভাল একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে আপনাকে বসিয়ে দেওয়া তো আমার কর্তব্য।

—শুনে খুশী হলাম। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।

তেইশ নম্বর টেবিলটা একেবারে খালি ছিল।

অনুপকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসালেন শিবশঙ্কর।

থেমে থেমে বললেন, একটা কথা ছিল স্যার। কিছু মনে করবেন না।

আপনি বিজ্ঞ-ব্যক্তি। আমাদের অবস্থা বুঝে নিশ্চয়—

—আপনি বিনয়ের একেবারে অবতার হয়ে পড়ছেন। যা বলতে চান, পরিষ্কার করে বলে ফেললেই তো মিটে যায়।

—কথাটা আমাদের রিসেপসনিস্ট মণিকা চৌধুরীকে নিয়ে। শুনলাম তাকে আপনি কাল মোটরে তুলে নিয়েছিলেন। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো অবশ্য ঠিক হচ্ছে না। তবে কি জানেন স্যার, মণিকা আমাদের একজন ভাল কর্মী। আপনার মত মানুষের প্রশ্রয় সে যদি পায় তবে তো আমাদের প্রতিষ্ঠানে আর থাকবে না। তাই বলছিলাম—

বিস্মিত অনুপ বাধা দিয়ে বললেন, আপনি তো বিচিত্র কথা বলছেন মঃ ম্যানেজার। ভাল সুযোগ পেলে অন্যত্র চলে যাবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। তবে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। মহিলাটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা আমি করছি না। আর মশাই মাথা খারাপ করে দেবেন না। ওয়েটারকে পাঠিয়ে দিন।

শিবশঙ্কর আর কিছু না বলে পা চালালেন।

ওদিকে অফিস-ঘরে বসে মলয় গাঙ্গুলী তখন নোট গুনে গুনে থাক লাগাচ্ছিলেন। টেবিলের অপর পারে, তাঁর ঠিক মুখোমুখি বসে আছেন একজন। বিশেষত্ব বর্জিত, ডিগডিগে চেহারার ওই লোকটি গাঙ্গুলীর একজন প্রথম শ্রেণীর মক্কেল। বিহারের কোথা থেকে বছরে বার পাঁচেক আসেন। মোটা টাকার মাল কেনেন। আজ যে এখানে আসবেন, আগেই ফোন করে জানিয়ে রেখেছিলেন।

এক সময় নোট-গোনা শেষ হল।

আগন্তুক বললেন, ঠিক আছে ?

—আটচল্লিশ হাজার। আবার কবে আসছেন ?

—মার্চের এদিকে নয়। মাসখানেক আগে সঠিক তারিখ জানিয়ে দেব। এবার আমায় উঠতে হবে মিঃ গাঙ্গুলী।

—সাবধানে যাবেন। দিনকাল খুব খারাপ।

—সঙ্গে লোকজন আছে। ভয়ের কোন কারণ নেই।

অফিস ঘরে তিনটে দরজা। বার-এর দিকে যে দরজা সে দিকে না গিয়ে, অন্য-ধারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মলয় গাঙ্গুলী। ছিটকিনি সরিয়ে পাল্লা খুলে ফেললেন। ওধারে অন্ধকার প্যাসেজ। সুইচ টিপতেই আলোকিত হল প্যাসেজ। মেঝের উপর রাখা ছিল একটা টিনের চ্যাপ্টা বাক্স। এর মধ্যে থরে থরে সোনার বিস্কুট সাজানো আছে। বলা বাহুল্য এরই বিনিময়ে পাওয়া আটচল্লিশ হাজার টাকা এতক্ষণ মলয় গুনছিলেন।

আগন্তুক চ্যাপটা বাক্সটা তুলে নিলেন। মলয় গাঙ্গুলীর পিছু পিছু এগিয়ে চললেন এবার। প্যাসেজ শেষ হয়েছে বাথরুমের সামনে। বাথরুমের

ওধারের দেওয়ালে একটা দরজা। ওই দরজার পাল্লা খুলতেই কার পার্কের পিছন দিকের অংশ চোখে পড়ল। দুজন লোক আবার সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আগন্তুক বলল, সব ঠিক আছে।

একজন বলল, হ্যাঁ। আমাদের যেতে অসুবিধা হবে না।

—চলি মিঃ গাঙ্গুলী। আবার দেখা হবে।

মলয় কিছু না বলে শুধু হাসলেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে, প্যাসেজ মাড়িয়ে আবার ফিরে এলেন অফিস-ঘরে নোটের বাণ্ডিলগুলো তখনও টেবিলের উপর ছিল। দেরাজের মধ্যে সমস্ত সাজিয়ে রেখে চাবি লাগালেন। পরে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা হবে। ব্যাটারি চালিত ওয়াল ক্লকের দিকে তাকালেন, আটটা পাঁচ। প্রোগ্রাম আরম্ভ হবার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তাপস লাহার ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত তো মনে শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা কি এখনও আসেননি?

ডিউক অব ডারহাম ধরিয়ে নিয়ে, দরজার লক খুলে বার-এ এসে দাঁড়ালেন। বিশাল হল গমগম করছে। চাপা গুঞ্জন ছাপিয়ে কাচের পাত্রর ঠুনঠান শব্দ কানে আসছে। অ্যালকহলের গন্ধ যেন চাপ বেঁধে রয়েছে। চারিধারে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েও তিনি তাপসের সন্ধান পেলেন না। শিবশঙ্করকে ডাকলেন কাছে।

—ললি, রেডি আছে তো?

—দেখছি স্যার!

—নাচ আরম্ভ হতে আর মাত্র দশ মিনিট আছে। ওকে তাড়া দাও গিয়ে।

ওদিকে—

স্বর্ণকমল তখন মণিকার মুখোমুখি হয়েছে।

—হ্যালো ম্যাডাম—

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মণিকা বলল, ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে। সারাদিনের মধ্যে একটা খবরও তো পাঠাতে পারতে।

—বিপদে যে পড়িনি দেখতেই পাচ্ছ। অবশ্য কাজ গুছিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কাল সকাল নটার সময় ইডেন-গার্ডেনের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কাছে আসতে পারবে?

—পারব।

—এস জরুরী কথা আছে।

একজন বয় এসে জানাল মণিকাকে মলয় গাঙ্গুলী ডাকছেন।

ব্যাজার মুখে স্বর্ণকমল ওখান থেকে সরে এল। মণিকা তাড়াতাড়ি কাউণ্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। মলয় আগের জায়গাটিতেই দাঁড়িয়েছিলেন।

—আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ। তুমি কিছুক্ষণ আমার অফিসে বস। একটা ট্রাঙ্ককল আসবার কথা আছে। আমি তো অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকব। ফোনটা রিসিভ করেই আমাকে খবর দেবে।

—আচ্ছা, স্যার।

মণিকা অফিস-ঘরের ভেতরে গেল।

মলয় ডাইসের দিকে চলে গেলেন।

পাতা, সঞ্জীব আর সুনীল এই সময় প্রবেশ করল বার-এ। তাদের আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। পাতাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনা হয়েছে এখানে। কালকের চেয়ে সুনীল আজ অনেক ফিটফাট। দূরপাল্লার যাত্রীদের নিয়ে তাকে যাতায়াত করতে হয়। কাজেই গাড়ির কেরিয়ারে জামাকাপড় ভরা একটা সুটকেশ বয়ে বেড়ায়।

নির্দিষ্ট জায়গায় মণিকাকে না দেখে সঞ্জীব বলল, মহিলা কি আজ অ্যাবসেণ্ট নাকি? সুনীল বলল, হতে পারে। আবার এধার ওধারও গিয়ে থাকতে পারেন। এস, ওধারে গিয়ে বসা যাক।

—কিগো ভাবী গিন্নী, কেমন লাগছে?

সঞ্জীবের কথার উত্তরে পাতা বলল, ভয় করছে আমার। বেশীক্ষণ কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারব না।

—ভয় করছে কেন! কেউ কি তোমায় গিলে ফেলবে নাকি?

—এত বুঝিয়ে বলতে পারব না। ভয় করছে মানে নার্ভাস বোধ করছি।

—তাই বল।

ওরা একটা টেবিল অধিকার করল গিয়ে।

অরকেষ্ট্রার ঐকতান মৃদু লয়ে এতক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছিল। মলয় গাঙ্গুলী ডাইসের উপর গিয়ে দাঁড়াতেই বাজনা থেমে গেল। ছায়া ছায়া আলোয় ভরা হলের প্রত্যেকে সেদিকে তাকালেন। উজ্জ্বল স্পট লাইট তাঁর উপর এসে পড়তেই, তিনি দু'হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বললেন। চতুর্দিকে নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা।

মলয় বললেন, মাননীয়া মহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের গভীর সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করে চলেছে, আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। পৃষ্ঠপোষকরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আপনাদের আনন্দ-বর্ধনের জন্য আমাদেরও চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। নিত্য-নতুন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে আমরা সদাই তৎপর। আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন, আজ এমন এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে যার তুলনা মেলা ভার। কলকাতার ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রখ্যাতা ললি আহুজা আপনাদের সামনে আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাবারের পসরা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। সেই ললি—যার খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত। সকলে

এবার গভীর আনন্দে অবগাহন করুন এই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

মলয় থামতেই প্রবল করতালিধ্বনি উঠল। উনি মাথা ঝাঁকিয়ে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে নেমে এলেন ডাইস থেকে। অরকেস্ট্রার ঐকতান আবার আরম্ভ হল। ডাইস ভরে উঠল রামধনু রং-এ। আর ঠিক তখনই কামনার তরঙ্গ তুলে দেখা দিল ললি আহুজা। তাও ছন্দবন্ধ ভঙ্গী ক্ষণে ক্ষণে দর্শকদের মনে হিল্লোল তুলতে লাগল।

এই সময় কাচের দরজা ঠেলে ব্যস্তভাবে তাপস লাহা ভেতরে প্রবেশ করলেন। বিশেষ এক কাজে জড়িয়ে পড়ায় এখানে আসতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি অবশ্য একা নেই, সঙ্গে তাঁর ছায়া কালিদাসও রয়েছে। তাপস এধার ওধার তাকালেন, মলয় গাঙ্গুলীকে দেখতে পেলেন না। কালিদাসকে রিসেপসান কাউণ্টারের কাছে দাঁড়াতে বলে তিনি এগুলেন।

সোজা চলে গেলেন অফিস-ঘরের সামনে।

একটু ইতস্ততঃ করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন অল্প পরেই। তারপর দ্রুত ফিরে চললেন রিসেপসান কাউণ্টারের দিকে।

কালিদাস প্রশ্ন করল, গাঙ্গুলীর দেখা পেলেন?

—না।

শিবশংকর এসে পড়লেন।

—অনেক দেরি করে ফেলেছেন মিঃ লাহা।

—দেরি হয়ে গেল একটু। আপনার কর্তা কোথায়?

—আছেন এখানেই। আপনি ফোলিওটা এনেছেন?

কালিদাস এবার উত্তর দিল, ইডিয়াট ঠাউরেছেন নাকি? ফোলিওটা এখানে আনা হোক আর আপনারা দলবল মিলে কেড়ে নিন—চমৎকার ব্যবস্থা। না মশাই, এত কাঁচা কাজ আমরা করি না।

—ওটা পাওয়া যাবে কিভাবে?

তাপস বললেন, মাল নিয়ে এখান থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পরেই ফোলিও পেয়ে যাবেন। আপনার সংগে বক বক করতে ভাল লাগছে না। যদি পারেন মিঃ গাংগুলীকে ডেকে দিন।

শিবশংকর ক্রুদ্ধ ভংগীতে দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ডাইসের দিকে চলে গেলেন। সংগে সংগে তাপস কালিদাসের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কি সমস্ত বললেন। শোনার পরই কালিদাস এক পা পিছিয়ে এসে উত্তেজিত ভংগীতে তাপসের দিকে তাকাল।

—আমি এখনই যাচ্ছি বস। কিন্তু—

—কথা বাড়িও না। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এস। আমি ততক্ষণ গাংগুলীকে ভালভাবে বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা দেখি।

তাপস লাহা অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনুপ ভট্চায ভ্রু-কুঁচকে

কি চিন্তা করলেন। তারপর তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে অফিস-ঘরে ঢুকে পড়লেন। সঞ্জীবরা কাছাকাছিই বসেছিল। খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে ললি আহুজার নাচ দেখছিল।

সুনীল পাতার দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন দেখছেন?

পাতা ভারি গলায় বলল, এ আবার নাচ নাকি? এ সমস্ত অসভ্যতা আমার ভাল লাগে না। এইজন্যে আসতে চাইছিলাম না।

—অসভ্যতা বলছেন! শুনলেন তো, খুব নাম ডাক মেয়েটির।

—হোক নাম ডাক।

অনুপ ভট্টাচাযকে অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লক্ষ্য করে সঞ্জীব বললে, তোমার বন্ধুর চাহিদা আছে বলতে হবে। লোকে ঘন ঘন গিয়ে দেখা করছে।

ওরা ইতিমধ্যে একজন ওয়েটারের মুখ থেকে জানতে পেরেছিল মণিকা কোথায় আছে।

পাতা বলল, তোমার হিংসা হচ্ছে?

—তুমি যতক্ষণ পাশে আছ ততক্ষণ কোন চিন্তা নেই। তারপরের কথা অবশ্য বলতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, মহিলাকে ডেকে আনি।

—মণিকা হয়ত কোন দরকারি কাজে ব্যস্ত আছে।

—পাঁচ মিনিটের জন্য এলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি এসেছ অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এটা ঠিক নয়। আসছি—

সঞ্জীব উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল।

মন্থর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে গেল অফিস-ঘরের মধ্যে। ক্যাবারে তখন পুর্ণোদ্দমে চলছে। সঞ্জীব ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। নিজের চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

সুনীল প্রশ্ন করল, আসছে?

—না······মানে······

লাইটার জেবলে সঞ্জীব সিগারেট ধরাল।

লাইটারের আলো কোটের হাতার উপর পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে সুনীল দ্রুত গলায় বলল, একি! ওখানে লাল রং লাগল কিভাবে?

পাতা বলল, রং নয়। রক্ত বলে মনে হচ্ছে।

—রক্ত!!!

ঠিক এই সময় জমজমাট অনুষ্ঠানকে সচকিত করে ঝনঝন শব্দে কাচের কিছু ভেংগে পড়ল। তারপরই পুরুষ কণ্ঠের দীর্ঘ লয়ে তীক্ষ্ন চিৎকার। নাচ থেমে গেল। সকলে উদ্‌বিগ্ন ভাবে তাকাতে লাগলেন এধার ওধার। মলয় গাঙ্গুলী ছুটতে ছুটতে এলেন। তাঁর পেছনে শিবশংকর। অনেকের মত তাঁরাও বুঝতে পেরেছিলেন চিৎকারের উৎস অফিস-ঘর। আরো

কয়েকজন খদ্দের রয়েছেন সংগে। উদ্বিগ্ন স্বর্ণকমল প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। কি মনে হতে সুনীলও গেল সকলের পিছু পিছু।

হাতের ধাক্কায় মলয় দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন। সংগে সংগে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে আটকানো ডিউক অব ডারহাম খসে পড়ল। একজন ওয়েটার ভাংগা পেয়ালা-পিরিচের সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম কাঁপছে। চা বা কফি ভিজিয়ে তুলেছে কার্পেটের এখানে ওখানে। এরপরই লক্ষ্যে আসে সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে মণিকা। তার ঘাড়ের উপর আমূল বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা। ছোরার স্টেনলেস স্টিলের বাঁট আলোয় চকচক করছে। টেবিলের উপরে পাতা পুরু কাচের অর্ধাংশ প্রায় রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটের উপরও। মণিকা যে আর বেঁচে নেই—এমন অবস্থায় পড়ে যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না এ সম্পর্কে আতঙ্কিত দর্শকরা সুনিশ্চিত হয়েছেন।

ওয়েটার ততক্ষণে মলয় গাঙ্গুলীর পায়ের উপর আছড়ে পড়েছে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইনিয়ে-বিনিয়ে কি বলছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সমস্ত বার'এ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল খুনের সংবাদ। এরপর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারিধারে। সকলেই ধাক্কাধাক্কি করতে করতে বার থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পুলিশ এলেই হাঙ্গামা বাড়বে। খুন বলে কথা। কেউ আর এ তল্লাটে থাকতে চান না।

সুনীল দ্রুত নিজেদের টেবিলের কাছে ফিরে এসে পাতাকে ইঙ্গিত করে বলল, পুলিশ আসবার আগেই এঁর বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। নইলে মাঝরাতের আগে ছাড়া-পাওয়া দুষ্কর হবে।

সঞ্জীব বলল, আমরাও তো চলে যেতে পারি। দেখছ তো সকলে কেমন পড়ি কি মরি করে ছুটছে।

—তুমি অফিস-ঘরে গিয়েছিলে কেউ দেখে থাকলে ঝামেলা হয়ে যাবে। পুলিশ ভাববে তুমি কাজ-গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়েছ।

—তাইতো।

সঞ্জীব ঝটিতে নিজের কোট খুলে—পাতার হাতে দিয়ে বলল, একলা বাড়ি ফিরতে পারবে? পাতা দুর্ভাবনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল।

কোনরকমে বলল, পারব।

—আর দেরি কর না। সকলের সঙ্গে গা-মিশিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। কোটটা রইল তোমার কাছে। কাল দেখা হবে।

পাতা আর কিছু না বলে দরজার দিকে পা বাড়াল।

হল ততক্ষণে প্রায় খালি। সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ঘটে গেল মিনিট তিনেকের মধ্যেই। মলয় গাঙ্গুলী বহুদর্শী ব্যক্তি। অচিরেই নিজেকে সামলে

নিলেন। পায়ের এক ঝটকায় ওয়েটারকে সরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এলেন কিছুটা।

—চক্রবর্তী, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? থানায় রিং কর।

টেবিলের উপরই টেলিফোন রয়েছে। পুলিশ আসার আগে টেলিফোন স্পর্শ করা ঠিক হবে না বিবেচনা করেই শিবশঙ্কর রিসেপসান কাউণ্টারের দিকে ছুটে গেলেন। ফোন অবশ্য তাঁকে করতে হল না, কারণ তার আগেই স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জ বিজিত মুখার্জীকে দলবল নিয়ে বার'এ প্রবেশ করতে দেখা গেল।

তাপস লাহাকে সামনে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, এখানে কোন গোলমাল হয়েছে কি?

গম্ভীরমুখে তাপস বললেন, হ্যাঁ। একজন মহিলা খুন হয়েছেন।

—ইনফরমেসন কারেক্ট দেখা যাচ্ছে। বার'এর ওনার কে?

মলয় গাঙ্গুলী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, আমি। আমরা খবর দেবার আগেই আপনি খবর পেলেন কিভাবে?

—থানায় ফোন করে কেউ একজন জানিয়েছিল। খদ্দেরদের অধিকাংশই তো সরে পড়েছেন দেখছি। সকলকে ধরে রাখতে পারলে তদন্তের সুবিধা হতো। ডেডবডি কোথায়?

—আমার অফিস-ঘরে। আসুন।

বিজিত মুখার্জী খুঁটিয়ে মণিকাকে দেখলেন। দেখলেন চারপাশের সমস্ত কিছু। সংগে আসা ডাক্তারকে ইংগিত করতেই তিনি দেহ পরীক্ষার কাজে লেগে গেলেন। পরীক্ষার শেষে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। ফটোগ্রাফার এবং অন্যান্য কাজে যাদের প্রয়োজন, তাদের এখানে চলে আসতে খবর পাঠানো হল।

অফিস-ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিজিত মুখার্জী মলয়ের দিকে তাকালেন।

—আপনি কি জানেন এবার বলুন?

—সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছুই জানি না।

—মেয়েটির মুভমেণ্ট সম্পর্কে তো কিছু বলতে পারেন?

—মেয়েটি এখানকার রিসেপসানিস্ট ছিল। আমি ওকে অফিস-ঘরে বসতে বলেছিলাম।

—মেয়েটিকে আপনি তার নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে অফিস-ঘরে বসতে বলেছিলেন কেন?

—ট্রাঙ্ককল আসবার কথা ছিল। ক্যাবারের ব্যাপারে আমাকে ওধারে যেতে হচ্ছিল। তাই ওকে—

—বুঝলাম। মেয়েটি ট্রাঙ্ককলের অপেক্ষায় থাকার পর আর আপনি ও ঘরে যাননি।

—না। আমি ডাইসের একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

—ঠিক কটার সময় ওকে আপনি ডেকেছিলেন?

একটু ভেবে নিয়ে মলয় গাঙ্গুলী বললেন, যতদূর মনে হচ্ছে আটটা বেজে দশ মিনিটে। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার চমশা পরলেন বিজিত মুখার্জী।

—কি উদ্দেশে এই খুন হল আপনি অনুমান করতে পাচ্ছেন?

—জোর দিয়ে কিছু বলা শক্ত। তবে—

—বলুন?

—মণিকা দেখতে ভাল ছিল। তার পিছনে অনেকেই ঘুরঘুর করছে লক্ষ্য করতাম। মনে হয় এই খুনের পিছনে প্রবল রেষারেষি আছে।

—হুঁ। মেয়েটির পরিচয় বলুন এবার। থাকত কোথায়?

—থাকত আমারই একটা ফ্ল্যাটে। পারিবারিক পরিচয় বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না।

বিজিত মুখার্জীর সঙ্গে মলয় গাঙ্গুলীর যখন কথা হচ্ছে, সঞ্জীব এবং সুনীল তখন একই জায়গায় বসে আছে আগেকার মত। দুজনের মুখের অবস্থা ভাল নয়। এখানে না এলে যে কি ভাল হত হাড়ে হাড়ে বুঝছে। পুলিশি-ঝামেলা আরম্ভ হয়েছে, কখন ছাড়া পাব কে জানে। হয়ত রাত কাবার হয়ে যাবে।

সুনীল বলল, পাতাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ভালই হয়েছে। সময়মত ফিরতে না দেখলে ওর বাড়ির সকলে চিন্তা-ভাবনায় সারা হত।

—হুঁ। কি ঘটে গেল বলতো? কোন খুনের ব্যাপারের এত কাছাকাছি এই প্রথম হচ্ছি?

—আমারও ওই এক অবস্থা। তবে কি জান, এই ধরনের বড় বার-এ খুনটুন প্রায়ই হয়। আচ্ছা, তোমার কোটের হাতায় রক্ত লাগল কিভাবে?

—অফিসের ভেতরে ঢুকেই, কোনদিকে না তাকিয়ে আমি টেবিলের কাছে চলে গিয়েছিলাম। তারপরই চোখে পড়ল মণিকার ডেডবডি। টেবিলে রক্ত চপচপ করছে। পড়ি কি মরি ভাবে পালিয়ে আসবার সময় নিশ্চয় কোটের হাতার সঙ্গে রক্তের ঠেকাঠেকি হয়ে গিয়েছিল।

—তার মানে তুমি ঘরে ঢোকার আগেই মণিকা মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। তুমিই বল, কোটটা পাতার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল করিনি?

—এছাড়া আর তো কোন উপায় ছিল না। কোটের হাতায় রক্তের দাগ দেখতে পেলে পুলিশ হয়ত তোমাকে লক আপ' এ পুরে ফেলত।

থমথমে ডার্লিং ডেন'এ তখন জনা পনেরোর বেশি লোক ছিল না। বিমর্ষভাবে একটা চেয়ারে বসেছিল স্বর্ণকমল। হিসাব কোনমতেই মেলাতে পাচ্ছিল না সে। ওধারে অনুপ ভট্চায ঘন ঘন সিগারেট টানতে টানতে

সচকিতভাবে তাকাচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ একধারে দাঁড়িয়ে জটলা করছেন। হাবেভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন ওঁরা।

তাপস সাহা দাঁড়িয়ে আছেন রিসেপসান কাউণ্টারে ঠেসান দিয়ে।

তাপস বললেন, কিরকম বুঝছ কালিদাস ?

কালিদাস কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়েছিল।

বলল, খেলা জমে উঠেছে বস্।

—আমাকে লেজে খেলানোর মজা গাঙ্গুলী এবার টের পাবে।

—যা বলেছেন। ডার্লিং ডেন'এর বারটা বেজে গেল। সুন্দরী রিসেপসানিষ্ট খুন, আতংকে আর খদ্দের মাড়াবে না এই 'বার'।

—আমি তো তাই চাই।

ওদিকে মলয় গাঙ্গুলীকে ছেড়ে বিজিত মুখার্জী সেই ওয়েটারকে জেরা করছেন, যার চিৎকার শুনে সকলে হত্যার কথা জানতে পেরেছিলেন। বেচারা ভয়ে ভাবনায় ভারি মুসড়ে পড়েছে।

—তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? আমার কথার ঠিকঠিক উত্তর দাও। মুখার্জী বললেন, তুমি অফিস-ঘরে মণিকা চৌধুরীকে চা দিতে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—কে তোমায় চা দিতে বলেছিল ?

প্রত্যেক দিনই ওই সময় উনি চা খেতেন। আজ দেখলাম জায়গা খালি। একজন বললে উনি অফিস-ঘরে রয়েছেন। তাই আমি—

তাকে বাধা দিয়ে মুখার্জী বললেন, তার আগে তুমি কোথায় ছিলে ?

—এখানেই ছিলাম।

—ভাল কথা, তোমার নামটা কি ?

—আজ্ঞে বিশ্বনাথ পাত্র।

—আটটার পর তুমি একবারও কি বার'এর বাইরে গিয়েছিলে, না সমস্তক্ষণ ভেতরেই আছ ?

—একবার বাইরে গিয়েছিলাম।

—কেন ?

—একজন এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক সিগারেট কিনে আনতে বলেছিলেন।

—ফিরে আসার পর তুমি অফিস-ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখেছিলে ? খুব ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও বিশ্বনাথ।

—আজ্ঞে, তিনজনকে ঢুকতে দেখেছিলাম।

—তাঁদের নাম জানো ?

—না।

—দেখ তো, এখানে যাঁরা এখন উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে সেই তিনজন

আছেন কিনা ? খুব ভাল করে দেখে বল।

বিজিত মুখার্জী বিশ্বনাথকে একপাশে সরিয়ে এনে জেরা করছিলেন। যে পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন-উত্তর লিখে নিচ্ছিল সে ছাড়া চতুর্থ-ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিশ্বনাথ এধার-ওধার তাকিয়ে নিল একবার।

—তিনজনই আছেন স্যার।

—দেখিয়ে দাও।

ইশারায় তিনজনকে দেখিয়ে দিল বিশ্বনাথ।

—এবার যেতে পার। তোমাদের ম্যানেজারবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

অবিলম্বে শিবশঙ্কর এসে উপস্থিত হলেন।

—আপনি কি—

—এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। নাম, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী।

—আপনাকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান লোক বলে মনে হচ্ছে। খুনের ব্যাপারে কিছু আঁচ করতে পেরেছেন নাকি ?

—এমন গোলমেলে ব্যাপারের মুখোমুখি আমি জীবনে হইনি। মণিকার মত মেয়ে যে এইভাবে মারা পড়তে পারে এ একেবারে চিন্তা ভাবনার বাইরে।

—মণিকা চৌধুরীর সঙ্গে কারুর ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা বলতে পারেন ? আই মিন লাভ জাতীয় কিছু—

—আমার জানা নেই।

—আপনার কর্তার সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

—খুবই ভাল।

—দুজনে একই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতেন। আমি জানতে চাইছি তেমন কোন সম্পর্ক—বিজিত মুখার্জী নিজের কথা শেষ করলেন না।

হাসবার চেষ্টা করে শিবশঙ্কর বললেন, আমি যতদূর জানি সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। আসল কথা হল, মিঃ গাঙ্গুলীর নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করবার মত কিছু নেই।

—এবার সন্ধ্যার কথায় আসা যাক। ঠিক ক'টার সময় বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে উঠেছিল বলতে পারেন ?

—সঠিক বলা সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় সাড়ে আটটার কিছু পরে।

—আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আপনার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে বলুন ?

—আমি ঘুরে ঘুরে খদ্দেরদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রা

সময় মিঃ গাঙ্গুলী ডেকে পাঠালেন। বললেন, প্রোগ্রাম শুরু

নেই। লিলিকে গিয়ে তাড়া দাও।

—লিলি কে ?

—ক্যাবারে ডান্সার।

—তারপর কি হল ?

—আমি গ্রীনর্‌মে চলে গেলাম। এই সমস্ত নাচিয়েদের বায়নাক্কার ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। যাদের বেশি নাম ডাক, তারা তো আরো এককাঠি উপরে। ললি নিজের অসুবিধার ফিরিস্তি আওড়াতে আরম্ভ করল। ঘড়িতে তখন আটটা দশ। আমি ব্‌ঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে ডাইসের দিকে পাঠালাম।

—তারপর ?

—গ্রীনর্‌ম থেকে হলে আসবার পরই তাপস লাহার সঙ্গে দেখা হল।

—তিনি কে ?

—আমাদের একজন খদ্দের।

—তিনি এখন এখানে আছেন ?

রিসেপসান কাউণ্টারের দিকে আঙ্গ্‌ল নির্দেশ করে শিবশঙ্কর বললেন, ওখানে বিশাল চেহারার যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর কথাই বলছি।

—ওঁর সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলেছিলেন ?

—মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়। তারপর আমি ডাইসের একপাশে গিয়ে দাঁড়ায় মিঃ গাঙ্গ্‌লী তখন ওখানেই ছিলেন।

—ওখানে গিয়ে দাঁড়াবার কতক্ষণ পরে বিশ্বনাথের চিৎকার শ্‌নতে পেলেন ?

—মিনিট দশেক পরে বোধহয়।

এতক্ষণ পরে বিজিত ম্‌খার্জী সিগারেট ধরালেন।

—আপাততঃ এই পর্যন্ত। এবার আসি অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলব।

শিবশঙ্কর ওখান থেকে সরে এলেন।

বিজিত এবার অন্‌প ভট্‌চাযকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। ব্যাঙ্কের এতবড় একজন কর্মচারীর এখানে উপস্থিতিতে বিস্মিত হলেন। তাঁর বাসস্থানের ঠিকানাও লিখে নেওয়া হল।

—আপনি এখানে কটার সময় এসেছেন ?

—সাড়ে সাতটার কিছ্‌ পরে।

—খ্‌নের কথা জানাজানি হবার পর অধিকাংশ লোকই তো সরে পড়েছে দেখছি। আপনি রয়ে গেলেন কেন ?

অন্‌প ম্‌দ্‌ হেসে বললেন, নৈতিক-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

—আপনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আপনার মতামতের অনেক দাম। এই খ্‌ন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

—সুচিন্তিত অভিমত দেবার মত প্রস্ত্‌তি আমার নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমি হতবাক হয়ে গেছি। এমন ঘটনা যে ঘটবে, কল্পনার বাইরে ছিল।

—আপনি মেয়েটিকে চিনতেন ?

—চিনতাম বলতে—এখানে প্রায়ই আসি, মাঝে-মধ্যে আমাদের কথাবার্তা

হত

—সন্ধ্যার সময় কোন কথা হয়েছিল ?

—সামান্য। তখন তাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখেছিলাম।

—ওয়েল মিঃ ভট্টাচারিয়া, এবার যে প্রশ্ন করছি তার গুরুত্ব অনেক। আপনি কি সাড়ে আটটা বা তার কয়েক মিনিট এধার ওধার অফিস-ঘরে গিয়েছিলেন ?

অনুপ একটু থেমে বললেন, গিয়েছিলাম। তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

—কেন গিয়েছিলেন ?

—মণিকা নিজের জায়গায় ছিল না। কিছুক্ষণ আগে অফিস-ঘরের মধ্যে ঢুকেছে লক্ষ্য করেছিলাম। একটা কথা বলতে গিয়েছিলাম।

—কথাটা কি দয়া করে বলুন ?

—ব্যক্তিগত কথা।

—মনে রাখতে অনুরোধ করছি, এটা খুনের কেস। ভিক্টিম সম্পর্কিত সমস্ত কথাই আমাদের জানা দরকার।

—ড্রাই-ডেতে মণিকা যাতে আমার সঙ্গে দেখা করে, আমি সে-কথাই বলতে গিয়েছিলাম।

—আপনি বললেন, মেয়েটির সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল। তাহলে তার সঙ্গে—

—সে ভাল একটা চাকরি খুঁজছিল। সেই সম্পর্কেই—

—বুঝলাম। অফিস-ঘরে আপনাদের মধ্যে কথা হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—তার মানে মণিকা তখন বেঁচেছিল।

দ্রুত গলায় অনুপ বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেঁচেছিল।

ভ্রূ-কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন বিজিত মুখার্জী।

বললেন তারপর, ধন্যবাদ। বর্তমানে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে এখন বাড়ি যেতে পারেন।

এবার তাপস লাহাকে ডাকা হল। কালিদাসও এল পিছু পিছু।

প্রশ্ন করার আগেই লাহা বললেন, আমার সহকারী মিত্র। আমি যেখানে যাব, ও সেখানে যাবে। বুঝলেন ইন্সপেক্টার ; আমি যা শুনব, ও ঠিক তাই শুনবে।

বিজিত দুজনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, ভাল কথা। আপনি কি করেন ?

—ব্যবসা। মাল এধার-ওধার করি আর কি। মানে···সস্তায় এক জায়গায় মাল কিনে, চড়া দরে আরেক জায়গায় বিক্রি করি।

—কোন্ মাল ?

—কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যে কোন জিনিস।

—থাকেন কোথায় ?

শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা ঠিকানা দিলেন তাপস লাহা।

—এই বার'এ নিয়মিত আসেন ?

—না। কালেভদ্রে আসি।

—মেয়েটির সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল ?

—একেবারেই না। সুন্দরী মেয়েদের কাছ থেকে আমি দূরে থাকতেই ভালবাসি।

—কটার সময় আপনি এখানে এসেছেন ?

—আন্দাজ সাড়ে-আটটার সময়।

—এখানে আসার পর কি করলেন ?

তাপস লাহা সহজভাবেই বললেন, বার-ওনার মলয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে একটা কাজ ছিল। তাঁকে দেখতে না পেয়ে অফিস-ঘরে চলে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানেও ছিলেন না। ওখান থেকে বেরিয়ে হলের মাঝামাঝি গেছি, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে দু-চার কথা বলার পর রিসেপসান কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় খুনের কথা জানাজানি হল। তারপর থেকে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আর অনেকের মত আপনারাও তো চলে যেতে পারতেন। গেলেন না কেন ?

—পালিয়ে যাব কেন ? এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেছে—পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই তো কর্তব্য।

বিজিত মুখার্জী নিজের চশমা ঠিক করে নিলেন।

আপনার কর্তব্যবোধ দেখে খুশী হলাম। এবার বলুন তো, অফিস-ঘরের ভেতরে যাবার পর আপনি কি দেখলেন ?

—কি দেখলাম মানে ?

—মণিকা চৌধুরী কি তখন বেঁচেছিলেন ?

—ছিলেন বই-কি। আমি অবশ্য তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। গাঙ্গুলীকে দেখতে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। এবার কি যেতে পারি ?

একটু ভেবে নিয়ে বিজিত বললেন, পারেন। তবে আমাদের অনুমতি ছাড়া এখন কলকাতার বাইরে যাবেন না।

—বেশ।

কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গী করে তাপস লাহা বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। আপনার কাজে লাগতে পারে হয়ত।

—কি বলুন তো ?

সঞ্জীবের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে তাপস বললেন, ওই ভদ্রলোকও

অফিস-ঘরের মধ্যে গিয়েছিলেন। তখন ওঁর গায়ে কোট ছিল। লক্ষ্য করলাম, খুনের কথা জানাজানি হবার পর কোটটা খুলে উনি এক মহিলার হাত দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

—আপনি ঠিক দেখেছেন?

—বে-ঠিক বড় একটা কিছু আমি দেখি না। কালিদাস, তুমি কি ব্যাপারটা দেখনি?

কালিদাস বলল সঙ্গে সঙ্গে, দেখেছি বস্। ইংরাজী সিনেমার কায়দায় চক্ষের পলকে সমস্ত কিছু ঘটে গেল।

বিজিত বললেন, কথাটা বলে আমায় ভালই করলেন।

—আমরা এরকম ভালই সকলের করে থাকি স্যার। কালিদাস বলল, আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন কি?

—না। আপনারা এবার আসতে পারেন।

সঙ্গীসহ তাপস লাহা বিদায় নেবার পর সঞ্জীবকে ডেকে পাঠানো হল। তাকে কিঞ্চিৎ ত্রস্ত দেখাচ্ছে। সুনীলও চলে এল তার সঙ্গে। বিজিত দুজনকে এক সঙ্গে আসতে দেখে বিস্মিত হলেও আপত্তি করলেন না।

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম?

—সঞ্জীব ভট্টাচার্য।

—কি করেন?

কি করে সঞ্জীব জানাল। ঠিকানাও দিল।

—আপনার নাম?

—সুনীল হুই।

প্রশ্ন করার আগেই সুনীল নিজের পেশার কথা বলল। বর্তমানে সঞ্জীবের ফ্ল্যাটে রয়েছে একথা বলতেও ভুলল না।

—আপনারা নিয়মিত এই বার'এ আসেন?

—না। সঞ্জীব উত্তর দিল, জীবনে এই দ্বিতীয়বার আমরা এখানে এসেছি।

—কটার সময় এখানে এসেছেন?

—ঘাড় দেখিনি। আটটার কিছু পরে হবে।

—আপনাদের সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন?

দুজনেই নীরব রইল।

বিজিত আবার বললেন, চুপ করে থেকে প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না। সঙ্গে যে একজন মহিলা ছিলেন তা প্রমাণ করা আমার পক্ষে শক্ত হবে না। তবু আপনাদের মুখ থেকেই জানতে চাইছি।

—ছিলেন।

—আপনারা তিনজনে একসঙ্গে না গিয়ে তাঁকেই বা এখান থেকে সরিয়ে দিলেন কেন? এবার সুনীল বলল, এরকম বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে তাঁকে রাখা

আমরা যুক্তিসংগত মনে করিনি।

—কথাটা কিন্তু পরিষ্কার হল না।

নিজের শরীর ঝাঁকিয়ে নিয়ে সঞ্জীব বলল, আসল ব্যাপারটা আপনাকে বলছি। ওই মেয়েটির সংগে আমার বিয়ে হবার কথা আছে। সিনেমা দেখার নাম করে আজ সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এই সমস্ত ঝামেলার মধ্যে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যেত। ওর মা-বাবা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়তেন। তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—উনি কোথায় থাকেন ?

—ক্ষমা করবেন। ঠিকানা দিতে পারব না।

—এর অর্থ হল খুনের তদন্তে সহযোগিতা করতে চাইছেন না।

—যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পারেন।

সুনীল বলল, আসল কথাটা কি জানেন, ঠিকানা পেলেই আপনারা ওখানে যাবেন। সকলে জানতে পারবে মেয়েটি বার'এ গিয়েছিল। কেলেংকারির একশেষ হবে। এই সমস্ত ভেবেই ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ও-প্রসংগ দীর্ঘতর না করে বিজিত মুখার্জী সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো কোট পরে এসেছিলেন। কোটটা গেল কোথায় ?

—আমি কোট পরে আসিনি।

—আমি কিন্তু জেনেছি আপনার কোট ওই মহিলা সংগে করে নিয়ে গেছেন।

—আপনি ভুল জেনেছেন ইন্সপেক্টার। আমি এখন যা পরে রয়েছি, এই পরেই এখানে এসেছি।

—একজন প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু আছেন।

—কারুর মিথ্যা কাহিনীর দায়িত্ব আমি নিতে পারি না।

—আপনি অফিস-ঘরের মধ্যে গিয়েছিলেন, একথাও বোধহয় অস্বীকার করছেন ?

—না।

—গিয়েছিলেন ?

—বলছি তো গিয়েছিলাম।

—ওখানে কেন গেলেন ? মেয়েটির সঙ্গে কি আপনার আলাপ ছিল ?

—সামান্য আলাপ হয়েছিল। মণিকা চৌধুরী আমার ভাবি-স্ত্রীর বান্ধবী ছিলেন। ওঁর সংগে দেখা করার জন্যেই আমাদের আসা। একজন ওয়েটারের মুখে জেনেছিলাম, উনি অফিস-ঘরে রয়েছেন। ওঁকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

—ওখানে গিয়ে কি দেখলেন ?

—দেখলাম, উনি মরে পড়ে রয়েছেন। ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

—তখন কটা হবে।

সঞ্জীব কিছু বলতে পারল না।

সুনীল বলল, আমার দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল ঘড়ির উপর একবার। তখন পোনে নটা।

বিজিত বললেন, সঞ্জীববাবু, আপনার কি মনে হয়েছিল খুন তখনই হয়েছে? মানে দু-এক মিনিটের মধ্যে?

—সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। তবে আমি মেডিক্যাল লাইনের লোক—আমার মনে হয়েছে, মণিকা চৌধুরী কিছুক্ষণ আগেই মারা গিয়েছিলেন।

—এরকম একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার পরও চেপে গেলেন কেন? আপনার কি উচিত ছিল না বার-ওনার কে জানানো।

—জানাতাম। কিন্তু অফিস-ঘর থেকে বেরুবার পর আমার মনের অবস্থা ধাতস্ত করতে সময় নিচ্ছিলাম। অবশ্য তার আগেই ওয়েটারটা চেঁচিয়ে উঠেছিল।

—ঠিক আছে। আর ধরে রাখব না তবে আপনারা পুলিশের অনুমতি ছাড়া কলকাতার বাইরে এখন পা বাড়াবেন না।

এবার বিজিত মুখার্জী বাকি যারা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের এক এক করে ডাকিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগলেন। ভীত-ত্রস্ত এই সমস্ত নারী পুরুষের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানতে পারলেন না। সব শেষে ডাক পড়ল স্বর্ণকমলের। বিমর্ষ ভংগীতে সে এসে উপস্থিত হল।

তার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেবার পর প্রশ্ন করা হল, আপনি এই খুন সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

—না। তবে—

—বলুন?

—আমি ওই-ঘরে তিনজন লোককে ঢুকতে দেখেছি। তবে এক সংগে নয়। একে একে—।

—সে কথা আমি আগেই জেনেছি। আপনি মেয়েটিকে চিনতেন?

—হ্যাঁ

—কিভাবে পরিচয় হয়েছিল?

অসহিষ্ণু গলায় স্বর্ণকমল বলল, অবান্তর আগ্রহ ইন্সপেক্টার। আপনি শুধু জেনে রাখুন, তাঁর সংগে আমার গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল।

সহানুভূতির সুরে বিজিত বললেন, ভারি দুঃখের কথা। সময় সময় এই রকম অঘটন মানুষের মন তচনচ করে দেয়। এখন আপনি নিশ্চয়

চাইবেন, হত্যাকারি ধরা পড়ে যাক ? তার কঠোর শাস্তি হোক ?

—আমি তাই চাই।

—আমাকে সাহায্য করুন। যা জানেন বলুন ?

—আপনাকে তো আগেই বললাম, আমি কিছুই জানি না। আটটা আন্দাজ এখানে এসেছি। মণিকা তখন রিসেপসান কাউণ্টারে।

—আপনার সংগে কথা হয়েছিল ?

—হয়েছিল। সামান্য।

—তারপর।

—একজন এসে ডেকে নিয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম, বার-ওনার তাকে কি সমস্ত বললেন। তারপর সে অফিস-ঘরের ভেতরে চলে গেল। তারপর আর তাকে বাইরে আসতে দেখিনি।

আরো দু-চার কথার পর স্বর্ণকমলকে বিদায় দিলেন ইন্সপেক্টার। তখন রাত পৌনে একটা। ডার্লিং ডেনের বিশাল হল খালি হয়ে গেল। কর্মচারীরা অবশ্য আছে। ওধারের একটা ঘরে বসে আছে তারা। ললি আহুজা নিজের সংগীদের নিয়ে অপেক্ষা করছে গ্রীনরুমে। তাকেও যেতে বলা হল। করণীয় যা ছিল ইতিমধ্যেই তা শেষ হয়েছে। কাজেই বডি পোস্টমর্টমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

বিজিত মুখার্জী এবার ঢুকলেন অফিস-ঘরে।

তাঁর উদ্দেশ্য হল, এবার পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখবেন কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। বার বা হোটেলে খুন জখম হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এই কেস যে অত্যন্ত জটিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকার পর এই গুরু-দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চেপেছে।

অফিস-ঘরের আয়তন বার ফিট বাই বার ফিট হবে। অত্যন্ত কেতাদুরস্ত কায়দায় সাজানো। দক্ষিণ দেওয়ালে বিশাল জানলা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ওধারে নিশ্চয় গ্রিল আছে। উত্তর দিকের দরজাটা এধার দিয়েই বন্ধ করা রয়েছে। পুব দিকের দরজা হল সংলগ্ন। ওই পথ দিয়েই বিজিত মুখার্জী ভেতরে ঢুকেছেন। পশ্চিম দিকে আরেকটা দরজা আছে। তার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা।

পায়ে পায়ে বিজিত ওদিকেই এগিয়ে গেলেন। দরজার ওধারে প্যাসেজ। প্যাসেজ মাড়িয়ে তিনি গিয়ে পৌঁছালেন বাথরুমের সামনে। এবার তিনি সচকিত হলেন। বাথরুমের আলো জ্বলছে। ওধারের ছোট দরজার পাল্লাটাও খোলা। হত্যাকারি কি এই পথ দিয়েই সরে পড়েছে ? দরজার ওধারে তো কার-পার্কের পিছন দিকের অংশ। কাজ সেরে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাবার চমৎকার ব্যবস্থা করা রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

ফিরে আসবার সময় তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল প্যাসেজ আর অফিস

ঘরের মধ্যেকার চৌকাঠের সামনে। চৌকাঠের একাংশে কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে রয়েছে। বিজিত এবার বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন। খুন কি এখানেই হয়েছে ? কাজ হয়ে যাবার পর মৃতদেহ টেবিলের কাছে বয়ে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে কি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

পরক্ষণেই এই-যুক্তি খুব জোরাল বলে মনে হল না। খুন এখানে হলে কয়েক ফোঁটা নয়, প্রচুর রক্তের চিহ্ন পাওয়া যেত। তবে এখানে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে রয়েছে কেন, এটাও একটা বড় প্রশ্ন। বিজিত ভাল ভাবেই বুঝলেন, এ-কেস-খুব সহজে মিটিয়ে ফেলা যাবে না। হয়ত শেষ পর্যন্ত হোমিসাইড স্কোয়াডের শরণাপন্ন হতে হবে।

অফিস-ঘরে ঢুকে তিনি সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের দিকে তাকালেন। মণিকা চৌধুরীর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত এখন শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। দিনেরবেলা হলে মাছি ছেয়ে যেত। নানাভাবে তিনি ঘরের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান চালালেন। ফল কিছুই পাওয়া গেল না। ধূর্ত-হত্যাকারি সমস্ত যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে বিজিত মুখার্জী সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিন্তা করলেন কি সমস্ত। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে, হল-মুখো দরজা ফাঁক করে, একজন সহকারীকে ডেকে বললেন, মলয় গাঙ্গুলীকে এখানে পাঠিয়ে দিতে।

মহা বিমর্ষ মলয় মিনিট দুয়েকর মধ্যেই এসে পড়লেন।

—মিঃ গাঙ্গুলী, আবার আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন ?

প্যাসেজের মুখের দরজাটার দিকে আঙ্গুল তুলে বিজিত বললেন, শেষবার যখন ঘর থেকে আপনি বেরিয়ে যান তখন কি ওই দরজাটা খোলা ছিল ?

—না বরং বলা চলে আমি নিজের হাতে বন্ধ করে গিয়েছিলাম।

—আচ্ছা, এই বন্ধ-দরজাটার ওধারে কি আছে ?

—গ্রীনরুম। ব্যবহার হয় না। এমার্জেন্সির জন্য রাখা হয়েছে। ইন্সপেক্টার, রক্ত লাগা অবস্থায় টেবিলটা এইভাবে পড়ে থাকবে— ?

না। ফোরেন্সিকের প্রয়োজনে যদি টেবিলটাকে সরিয়ে না নেওয়া হয়, তবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হবে। দেখুন তো, এই ঘর থেকে কিছু খোয়া গেছে কিনা।

মলয় গাঙ্গুলী ঘরের চারপাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। দু-ধার মিলিয়ে টেবিলের সঙ্গে চারটে দেরাজ যুক্ত। পকেট থেকে চাবি বার করে তিনি ডান-দিকের প্রথম দেরাজ খুললেন। নেড়ে চেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। দ্বিতীয় দেরাজও

ঠিক আছে।

এবার বাঁদিকের প্রথম দেরাজে চাবি লাগিয়ে ঘোরাতে গিয়েই তাঁকে থামতে হল। ঘুরছে না। অর্থাৎ লক করা নেই। কিন্তু এরকম তো হবার কথা নয়। তিনি ঝটিতে দেরাজে টান দিলেন। তাঁর আশংকা মিথ্যা নয়। আটচল্লিশ হাজার টাকার যে তাড়া ভেতরে রাখা হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। মলয় বিচলিত হলেন।

—কি হল ?

—এখানে কিছু টাকা ছিল। দেখতে পাচ্ছি না।

—কত ছিল ?

মলয় এবার ইতস্ততঃ করলেন। আটচল্লিশ হাজার টাকা ছিল বলা চলতে পারে না। একে তো এই বিশাল অংকের অর্থ অদৃশ্য হয়েছে—চোখে অন্ধকার দেখতে আরম্ভ করেছেন তিনি, তারপর এত টাকা কোথা থেকে পাওয়া গেল তার হিসাব যদি পুলিশ চেয়ে বসে—

এই সূত্রে সংবাদ পেয়ে ইনকাম ট্যাক্স থেকে লোক এসে যদি উপস্থিত হয়, তাহলে ঝামেলার শেষ থাকবে না।

—কি হল ? কত টাকা ছিল ?

—পাঁচ হাজার।

—দেরাজে চাবি লাগিয়েছিলেন, একথা আপনার পরিষ্কার মনে আছে ?

—হ্যাঁ। আমি দেরাজে চাবি লাগাবার পরই ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম কয়েক মিনিট, তারপর মণিকাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

—হত্যাকারি যাবার সময় টাকাটা নিয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এই টাকাটা কি বার-কালেকশান ?

—না। গত সন্ধ্যার বার-কালেকশান তো এখনও ক্যাশিয়ারের কাছে আছে। গোলমাল বেধে যাওয়ায় আর তার কাছ থেকে নেওয়া হয়নি।

—এতগুলো টাকা তবে কোথা থেকে এল ?

—আরো কয়েকদিন ললি আহুজাকে বুক করার ইচ্ছা ছিল। ওকে দেব বলেই টাকাটা সংগে করে এনেছিলাম।

—হুঁ। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই-ঘর আমরা সীল করে রাখব। আপনার অসুবিধা হবে বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করা যাবে বলুন ?

—তদন্ত শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে ?

—এখনই বলা যাচ্ছে না।

এতক্ষণ পরে বিজিত মুখার্জী সিগারেট ধরালেন।

দুশো একচল্লিশের কে হাংগারফোর্ড-স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন ক্রমবর্ধমান

দ্রব্যমূল্য নিয়ে আলোচনা চলেছে। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। অফ ডিউটি থাকায় শৈবাল আজ একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। চিনি পাওয়া যাচ্ছে না, এই নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত।

শৈবাল তখন বলছিল, জিনিসের দাম যতই বাড়ুক না কেন, তাতে তোমার কি? দায় নেই, দায়িত্ব নেই। আকাশ-ছোঁয়া দাম হলেও তোমার ঠিক চলে যাবে।

বাসব মৃদুগলায় বলল, কেন, আমি কি পীর?

—বিনয় করতে হবে না। কথাটা কি জানো, তোমার মত দুধের ছেলের সঙ্গে এপ্রসঙ্গে আর আলোচনা চালাতে চাই না।

—বলকি—আমি দুধের ছেলে?

—যার এখনও বিয়ে হয়নি তাকে আমি সাবালক ভাবতে পারি না।

বাসব হেসে ফেলল।

পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, ও আলোচনা নাস্তি। আচ্ছা ডাক্তার, আজকাল খুন-জখমের মধ্যে কোন রহস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন বলতো? যে যাকে পাচ্ছে খুন করছে। ব্যাপারটা যেন বড় সস্তা হয়ে গেছে।

—শৈবাল বলল, যুগধর্ম ভাই। এখন অধিকাংশ মানুষ মাথা খাটিয়ে কিছু আর করতে চায় না। তবে আজকের কাগজে মনের মত একটা সংবাদ আছে। দেখেছ?

—কোন এক 'বারে' একটি মেয়ে খুন হয়েছে—পড়েছি। আচ্ছা ডাক্তার, ওই অঞ্চলের এখন থানাদার, কে বলতো?

—মাস তিনেক আগেই তো তুমি লাউডান স্ট্রীটে একটা কেস করলে। তখন তো আমাদের বন্ধু বিজিত মুখার্জী ছিলেন। বদলী না হয়ে গিয়ে থাকলে এখনও আছেন। কেন, খোঁজ-খবর নেবার ইচ্ছে আছে নাকি?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মাথা খারাপ। আমি তো সেকেণ্ড শখের গোয়েন্দা নই। মক্কেল আসবে। টাকা দেবে। কেস হাতে নেব। নইলে নৈব-নৈব চ।

—মাঝে মাঝে কিন্তু টাকা না নিয়েও তুমি কেস কর।

—করি। মক্কেলের অবস্থা বুঝে মাঝে-মধ্যে চ্যারিটি করতে হয়। সেণ্ট পারসেণ্ট অমানুষ যে নই, একথা আমার মহাশত্রুও বলবে।

বাহাদুরের গোল হলদে মুখ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল।

—একজন দেখা করতে চাইছেন।

—পাঠিয়ে দাও।

মিনিটখানেক পরেই স্বর্ণকমল ঘরে প্রবেশ করল। তার পোশাকের পারিপাট্য আগেকার মত নয়। হাবে ভাবে বেশ অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে। সে দ্রুত দুজনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ও কিন্তু কিছু বলার আগেই

বাসব কথা বলল।

—আপনি বিলক্ষণ উত্তেজিত রয়েছেন। শান্ত হয়ে বসুন। তারপর বলুন কি বলতে এসেছেন। আমি বাসব।

স্বর্ণকমল বসল সোফায়।

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, ফোন-গাইড থেকে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এলাম। একটা উপকার আমার করতেই হবে।

—বলুন ?

—আজকের দৈনিক-পত্রে বোধহয় দেখেছেন, ডার্লিং ডেন নামে একটা বার-এ একজন মহিলা খুন হয়েছেন। মানে……

বাসব শৈবালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, পড়েছি। বিশেষ সংবাদ-দাতা তো লিখেছেন, পুলিশ জোর তদন্ত করছে।

—পুলিশের কাজের উপর আমার আস্থা নেই—মিঃ ব্যানার্জী। তাদের হাতে অনেক কেস। পার্টিকুলার কোন কেস-এর উপর বেশি দৃষ্টি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আপনার কাছে তাই ছুটে এলাম। হত্যাকারিকে যে কোন উপায়ে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে নইলে আমি শান্তি পাব না। আপনার ফি কত আমি জানি না। হাজার টাকা এনেছি। অ্যাডভান্স হিসাবে রাখুন।

স্বর্ণকমল একতাড়া নোট পকেট থেকে বার করে সেন্টার টপের উপর রাখল।

বাসব বলল, কথা শুনে বুঝতে পাচ্ছি নিহত মহিলা আপনার বিশেষ আপনজন ছিলেন। কিন্তু আমি তো ব্যাপারটার কিছুই জানি না। এমনকি আপনার নাম পর্যন্ত অজানা। আপনি প্রথমে নিজের পরিচয় দিন। তারপর খুলে বলুন সমস্ত ঘটনা। ডাল-পালা থাকলে তাও বাদ দেবেন না। যত বিশদ হবেন ততই তদন্ত করার পক্ষে আমার সুবিধা হবে।—নাউ স্টার্ট—

নিজের পরিচয় দেবার পর স্বর্ণকমল একে একে সমস্ত কিছু খুলে বলল। এমনকি কি উদ্দেশ্য নিয়ে মলয় গাঙ্গুলীর পিছনে লেগে রয়েছে তাও বলতে ভুলল না। তার ঘরে ঢুকে যে তল্লাশি চালিয়েছিল তাও জানাল। বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমস্ত শুনে গেল একমনে।

—আপনি তাহলে ওই তিনজন লোককে ছাড়া আর কাউকে অফিস-রুমে ঢুকতে দেখেননি ?

—না।

—প্রত্যেক খুনের পিছনে একটা মোটিভ থাকে। মণিকা চৌধুরীকে খুন করে কে বেশি লাভবান হল, অনুমান করতে পাচ্ছেন ?

—আমি অনেক ভেবেও কোন কুল পাইনি। মণিকা কোন সাতে-পাঁচে থাকত না। তাকে যে কেন খুন করা হল ঈশ্বর জানেন।

বাসব এবার শৈবালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ডাক্তার, তুমি তো সব

শুনলে। কোন মন্তব্য-টন্তব্য করবে ?

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, কেস বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে। তবে আমরা একতরফা শুনলাম। পুলিশের কাছ থেকেও শোনা দরকার। বিশেষে প্রত্যেকের এজাহারের দৃষ্টি বুলিয়ে না নিয়ে কোন ধারণা খাড়া করে নেওয়া ঠিক হবে না।

—তদন্ত আরম্ভ করার আদি কথাই শোনালে। ভারি খুশী হলাম। ওয়েল, মিঃ মুখার্জী, আপনি তাহলে এখন আসুন। আমি তদন্তে নেমে পড়ছি।

—অনেক আশা নিয়ে আমি যাচ্ছি। মণিকা আর ফিরে আসবে না এটা ঠিক। তবে—

—আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপ্রাণ ভাবে চেষ্টা করব হত্যাকারিকে ধরবার। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাবেন।

স্বর্ণকমল বিদায় নিল।

শৈবাল বলল, এবার ডার্লিং ডেন'এ ধাওয়া করবে নাকি ?

—আগে একবার মিঃ সামন্তর সঙ্গে কথা বলেনি। লালবাজারকে জানিয়ে রাখা দরকার আমি আসরে নামছি।

বাসব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ফোন ষ্ট্যান্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। লালবাজারের সঙ্গে সংযোগ হতেই, হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্তকে চাইল। ভাগ্যক্রমে সামন্ত নিজের অফিসেই ছিলেন। সাড়া দিলেন।

—হ্যালো······বাসব বলছি······অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে·কিছু মনে করবেন না······

—আপনার এই দখনে ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ······অকারণে ফোন করার পাত্র আপনি নন······এবার ঝেড়ে কাশুন তো······

—ডার্লিং ডেন বার'এ একজন মহিলা খুন হয়েছেন······কেসটা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন নাকি······

—কেসটা একটু ঘোরাল······থানাকে সাহায্য করার জন্য আমরা এগিয়েছি ······আপনিও তাল ঠুকে নেমে পড়ছেন মনে হচ্ছে······কে অ্যাপয়েন্ট করল ······বার-ওনার নিশ্চয়······

—না······ভিক্টিমের প্রেমিক······মিঃ সামন্ত······সংশ্লিষ্ট সকলবে কাইন্ডলি আমার কথা জানিয়ে রাখবেন······কাজ করতে সুবিধা হবে······

—আজই জানাবার ব্যবস্থা করছি······আমার সঙ্গে দেখা করছেন কবে······

—অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস স্যার······

—ঠাট্টা নয়······কাল সকালে আসুন···

—বেশ······এখন ছাড়ছি······

রিসিভার নামিয়ে রেখে বাসব আবার ফিরে এল আগের জায়গায়।

—গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড় ডাক্তার। এসময় এক গেলাস করে বিয়ার মন্দ লাগবে না।

—ডার্লিং ডেন'এ যাবে?

—এই কেসের ওটাই হল ব্লাডি পয়েণ্ট। যেতে যখন ওখানে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি?

বাসবের ওল্ড মোবাইল সওয়া আটটার সময় ডার্লিং ডেন'এর সামনে পেঁছাল। অন্যান্য দিনের মত আজ গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে নেই। স্বাভাবিক। যে বার'এ গত সন্ধ্যায় লোমহর্ষক খুন হয়ে গেছে, সুরা-বিলাসীরা সেই জায়গা কয়েকদিন এখন এড়িয়ে চলবেন। মানুষ এই ধরনের মনস্তত্ত্বের শিকার না হয়ে পারে না।

দুজনে কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

বিশাল হলে জনাদশেকের বেশি লোক নেই। তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছেন। ওরা একটা টেবিল অধিকার করল। ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই অর্ডার দিল এক বোতল বিয়ার আর কিছু শুকনো খাবারের। বাসব এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল, ডাইসের পাশ দিয়ে দুজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বিজিত মুখার্জী আসছেন। বিজিতের সঙ্গে বাসবের পরিচয় বছর দুয়েকের। দুটো তদন্তে একই সঙ্গে ছিল ওরা।

খাদ্য পানীয় এসে পড়ল।

শৈবাল বলল, মেঘ না চাইতেই জল। বিজিতবাবু এখানে রয়েছেন।

—তাই তো দেখছি। হাত আর মুখ দ্রুত চালাও ডাক্তার।

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করল। বিল মিটিয়ে দেবার পর দুজনে এগিয়ে গেল সেইদিকে, যেখানে বিজিত মুখার্জী ভদ্রলোক দুজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাসবকে দেখে ইন্সপেক্টারের মুখে বিস্ময়ের ঢল নামল।

—একি! আপনি এখানে?

—আপনাকে যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারি তাই আর কি।

—তার মানে কেসটা আপনি টেক-আপ করেছেন। মক্কেলটি কে?

—স্বর্ণকমল মুখার্জী। কিছুক্ষণ আগে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মিঃ সামন্ত, আপনাকে আমার কথা জানাবেন।

—না জানালেও ক্ষতি ছিল না। আপনি এসে পড়ায় কিছুটা স্বস্তিবোধ করছি। কেসটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন, এই বার'এর স্বত্বাধিকারী মলয় গাঙ্গুলী। আর ইনি ওঁর রাইট হ্যাণ্ড শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। মিঃ গাঙ্গুলী, এই ভদ্রলোককে আগে না

দেখলেও নাম শুনেছেন নিশ্চয়। ইনি বিখ্যাত—

বাধা দিয়ে বাসব বলল, বেশি অলঙ্কারের বোঝা আবার আমি সইতে পারি না। খুনোখুনির তদন্ত-টদন্ত করি এই হল আদত কথা। আমার নাম বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈবাল রায়। এখানকার কেসটা ঘটনাচক্রে আমার হাতে এসে পড়েছে। আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাব আশা করি।

নমস্কার বিনিময় হল।

মলয় বা শিবশংকরের মুখ দেখে সহজেই অনুমান করা গেল, দুজনের মধ্যে কেউই বাসবের নাম আগে শোনেননি। তবে সেভাব কেউ ভাষায় প্রকাশ করলেন না। পুলিশের সঙ্গে যে রকম দহরম মহরম লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে ভদ্রলোকের ওজন কোনমতেই উপেক্ষা করার মত নয়।

মলয় বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম। যে কোন ধরনের সহযোগিতা আপনি অবশ্যই পাবেন। গ্রহের ফেরে আমার ব্যবসা মাটি হতে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি খুনের কিনারা হয় ততই ভাল।

—আজ আর নয়। আরেকদিন আসছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। মিঃ মুখার্জী, আমি একবার অফিস-ঘরের ভেতরটা দেখতাম।

—বেশ তো। আসুন না।

বিজিত মুখার্জী সীল ভেঙ্গে অফিস-ঘরের দরজা খুললেন। মলয় এবং শিবশংকর ছাড়া, বাকি তিনজন ভেতরে চলে গেল। এয়ার-কুলার বন্ধ থাকার ভ্যাপসা ভাব ঘরের উপর চেপে বসল। সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। টেবিলের উপর অবশ্য রক্ত লেগে নেই। ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে।

বাসব ঘরের চতুর্দিকে কয়েক পাক দেবার পর, প্যাসেজের সামনেকার দরজা খুলে বাথরুমের দিকে চলে গেল। বাথরুমটা দেখল খুঁটিয়ে। তারপর ওধারের দরজা খুলে কার-পার্কের পিছন দিকে পৌঁছাল। লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা চৌকো জায়গা। ওধারে গলি। স্ট্রীট-লাইট এসে পড়ার দরুণই চারিধার দেখে নেবার সুবিধা হচ্ছে। কার-পার্কের দিকে যাবার জন্য বেড়ার একধারে ফুট তিনেকের ফাঁক রয়েছে।

বাসব ওখানকার ভূগোল মনের মধ্যে ভাল করে গেঁথে নিয়ে আবার ফিরে এল অফিস-ঘরে। পর্দা সরিয়ে এবার গ্রীন-রুমের দিকের দরজাটা খুলল। ওধারের ঘরখানা বিশেষ বড় নয়।

ড্রেসিং টেবিল ছাড়াও, দেওয়ালে বিশাল আয়না লাগানো। সেদিন ললি আহুজা এখানেই নিজের মেক-আপ সেরেছিল।

—মেয়েটা কোথায় উঠেছে ?

বাসবের প্রশ্নে বিজিত সচকিত হলেন।

—কার কথা বলছেন ?

—ক্যাবারে নর্তকী কোথায় উঠেছে জানতে চাইছিলাম।

—স্যাভয় হোটেলে। কেন বলুন তো ?

—এমনি জানতে চাইছিলাম।

অফিস-ঘরে ফিরে আসার পর বাসব আবার বলল, প্যাসেজের সামনেকার দরজার সামনে সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে, সামনে নেই—বেখাপ্পা ঠেকছে নাকি ?

—তাইতো! আমার খেয়ালই হয়নি। দাঁড়ান, আমি মিঃ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে জেনে আসছি ওখানে পর্দা ছিল কিনা।

বিজিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কি রকম বুঝছ ?

—বোঝার মত অবস্থায় এখনও এসে পড়িনি। অনেক কিছু জানার আছে, তারপর মতামত খাড়া করা যাবে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের দেরাজগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। অধিকাংশই খোলা। টুকিটাকি সমস্ত জিনিস রাখা আছে। একটা দেরাজ আবার সম্পূর্ণ খালি। তার গা-তালা যথাস্থানে লাগানো নেই। খোলা-অবস্থায় ভেতরে রাখা রয়েছে। এই সময় ইন্সপেক্টার ফিরে এলেন।

—গাঙ্গুলী কি বললেন ?

—উনি তো বললেন, তিনটে দরজাতেই পর্দা ছিল।

—তার মানে একটা পর্দা খোয়া গেছে। ভাবনার কথা হল। এঘরে আমার আর কিছু দেখার নেই। আপনি স্বচ্ছন্দ করে আসুন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনার সঙ্গে থানায় যাব। সকলের এজাহারের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

—বেশ তো। আমি আসছি।

ওরা দু'জন অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মলয় বিমর্ষ-মুখে দাঁড়িয়ে ডিউক অব ডারহাম টানছিলেন।

বাসব তাঁর সামনে গিয়ে বলল, কার-পার্কের জায়গা রয়েছে দেখলাম। কার অ্যাটেণ্ডেণ্ট রেখেছেন নাকি ?

—রাখতে হয়েছে। কি রকম দিনকাল দেখছেন তো। নজর রাখার একজন লোক না থাকলে, কার গাড়ি থেকে কে কি খুলে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি ?

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সেই অ্যাটেণ্ডেটকে এখন পাওয়া যাবে ?

—কেন পাওয়া যাবে না। তার থাকা-খাওয়া সমস্ত এখানেই। ছোকরা বেশ চটপটে।

ডেকে পাঠাব ?

—আজ থাক। কি নাম তার ?

—হরিপদ।

—আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না মিঃ গাঙ্গুলী। কাল কোন সময় আসছি।

—সন্ধ্যার সময় এলে এখানে, নয়তো অন্য সময় আমাকে আমার বসন্ত রায় রোডের ফ্ল্যাটে পাবেন।

থানায় পেঁছাবার পর বিজিত মুখার্জী বাসব ও শৈবালকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চা আনতে আদেশ দিলেন দারওয়াজাকে। এই সময় তাঁর সহযোগি এসে তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু বললেন।

বিজিত আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ সামন্ত ফোন করেছিলেন। আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন।

—এবার তাহলে কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। বাসব বলল, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট বোধহয় এখনও পাওয়া যায়নি।

—কালকে আশা করছি।

—আচ্ছা, আপনি খুন হওয়ার কতক্ষণ পরে ওখানে গিয়ে পেঁছালেন ?

—মিনিট পনের পরে। পরিচয় না দিয়ে একজন ফোন করেছিল। পরে খোঁজ-খবর নিয়েছি। কিন্তু কে যে ফোন করেছিল জানা যায়নি।

—বিচিত্র ব্যাপার।

—আরেকটা কথা। বিজিত বললেন, মৃতদেহ মুখ গুঁজে পড়েছিল টেবিলের উপর। টেবিল রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। এছাড়া, প্যাসেজের মুখের দরজার সামনে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল।

—তাই নাকি ! খুন করা হয়েছে কি দিয়ে ?

—একটা বড় আকারের ছুরি দিয়ে।

—একবার দেখাবেন—

বিজিত চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ওধারে রাখা লোহার আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। পকেট থেকে চাবি বার করে আলমারি খুলে ছুরিটা নিয়ে আবার ফিরে এলেন আগের জায়গায়। বাসব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছুরিখানা দেখল। লম্বায় ছ' ইঞ্চির কম হবে না। মুড়ে বন্ধ করা যায়। পেতলের বেশ ভারি মুঠো। এ হল সেই জাতীয় ছুরি, যার নির্দিষ্ট জায়গায় চাপ দিলেই ব্লেড বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে আসে।

ছুরিটা টেবিলের উপর রেখে বাসব বলল, একজন মহিলার পক্ষে এই অস্ত্র একটু বেশি মাত্রায় মারাত্মক। এবার এজাহারের কপিগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। দেখি কে কি বলছেন ?

এজাহারের কপি হাতে নিয়ে বাসব পাইপ ধরাল।

শৈবাল আর বিজিত মুখার্জী নিম্ন-গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

বাসব এজাহার পড়া শেষ করল পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

আড়মোড়া ভেঙ্গে নিয়ে বলল, আজ এই পর্যন্ত। এবার আমরা উঠব।

—কিছু আঁচ করতে পারলেন ?

—চিন্তা ভাবনা একটু করি। তারপর বলব।

শৈবাল ঘড়ির দিকে তাকাল, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি আছে। ওরা থানা থেকে বেরিয়ে এল। বাসবকে বেশি মাত্রায় চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওর মন সূত্রের সন্ধানে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোধহয়। ওরা গাড়িতে গিয়ে বসল।

—আমি ড্রাইভ করছি। তোমার যা অবস্থা, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে দিতে পার।

মৃদু হেসে বাসব জায়গা বদল করল।

—আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ডাক্তার। বিশেষে সময়ের হিসাবটা যেন বড় বেশি গরমিল ঠেকছে।

—কি রকম ?

গাড়ি তখন সচল হয়েছে।

—আটটা দশ মিনিটে মলয় গাঙ্গুলী মণিকা চৌধুরীকে নিজের অফিস-ঘরে বসিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ওই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তাপস লাহা। তিনি বলেছেন, মহিলা তখনও জীবিত ছিলেন। এর মিনিট কয়েক পরে অনুপ ভট্চায অফিস-ঘরে যান। তখনও নাকি মহিলা জীবিত। আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সঞ্জীব ভট্চায ওখানে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হল, তিনি গিয়ে দেখেন মণিকা মারা গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মণিকা ঠিক কটার সময় মারা গেছে।

—কেন ? আটটা বেয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

—তাহলে সমস্ত দায়িত্ব সঞ্জীব ভট্চাযের ঘাড়ে চেপে বসে। ধরে নিতে হয় খুন তিনিই করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় না এত সরল পথ বেয়ে ব্যাপারটা ঘটেছে। এমন হতে পারে তাপস লাহা খুন করেছেন। অনুপ পরে গিয়ে মৃতদেহ দেখে ভড়কে যান এবং মিথ্যার আশ্রয় নেন। কিম্বা তিনিই হত্যাকারি। আবার এমন হতে পারে, তাপস এবং অনুপ ঘরে ঢোকার আগেই খুন হয়ে গেছে। জড়িয়ে পড়ার ভয়ে দুজনেই ব্যাপারটা চেপে গেছেন। তাই বলছিলাম, প্রচুর চিন্তার খোরাক রয়েছে।

—মোটিভ সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করতে পারলে ?

—ড্রয়ার থেকে নাকি পাঁচ হাজার টাকা খোয়া গেছে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্য ওই-রকম জায়গায় খুন করার রিস্ক কেউ নেবে না। যে কোন কারণেই হোক মণিকাকে সরানোই বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল। আরেকটা কথা,

অফিস-ঘরের কাছাকাছিই অনেকে বসে ছিলেন। অথচ কেউ নারী-কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পাননি। মণিকা নিশ্চয় মুখ বুজে ঘাড় পেতে দেয়নি খুন হওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই ভেবে নিতে পারি, হত্যাকারি মণিকার বিশেষ পরিচিত ছিল। সে কোন রকম সন্দেহ করেনি। দু-চার কথা দুজনের মধ্যে হয়েছিল নিশ্চয়। তারপর মৃত্যু আসে অতর্কিতে।

—আমার কিন্তু একটা খটকা লাগছে। টেবিলের পাশে বসেই যদি মণিকা খুন হবে, তবে প্যাসেজের দরজার সামনে রক্ত পড়েছিল কেন?

—তুমি বলছ, খুন দরজার সামনে হয়েছে, তারপর দেহ বয়ে এনে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা কথা তুমি মনে রাখনি ডাক্তার, দরজার সামনে মাত্র কয়েক-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল। ওখানে খুন হলে রক্তে জায়গাটা ভেসে যেত। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে থাকার কারণ অন্য কিছু হতে পারে।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট একবার দেখোনি।

বাসব একটু থেমে আবার বলল, অফিস-ঘরের একটা পর্দা অদৃশ্য হয়েছে। ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়। এই ধরনের কিছু জট রয়ে যাচ্ছে। দেখি কতদূর কি করা যায়।

গাড়িতে আর কোন কথা হল না।

পরের দিন সকালে বাসব সঞ্জীবের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। যাদের এজাহার নেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেকের ঠিকানা সে থানা থেকে সংগ্রহ করেছে। ওখানে তখন আরেক ব্যাপার ঘটেছে। গত বিকালে ওরা পাতাদের বাড়ি গিয়েছিল। তার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছে সঞ্জীব। তিনি গররাজি হননি। বরং খুশীই হয়েছেন।

ঘণ্টা-দেড়েক ওখানে থাকার পর দুজনে ফিরে এসেছিল। পাতাকে একা পাবার লোভ অনেক কষ্টে সংবরণ করেছে। গাড়ি গ্যারেজে জমা রেখে সেই যে বাসায় ঢুকেছে আর বেরোয়নি। আজ সকালে সঞ্জীব বলল, চল, চৌরঙ্গীর কোন রেস্টুরেন্টে ব্রেক-ফাস্ট সেরে আসি।

—মন্দ নয়।

সুনীল গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে এল।

এরপরই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপারের মুখোমুখি হল তারা।

গতকাল জামা-কাপড় পাল্টানো হয়নি। সুনীল স্থির করল সুটকেশ থেকে একসেট পোশাক বার করে নেবে। কেরিয়ার খুলে সে হতভম্ব হয়ে গেল। সুটকেশের চিহ্নমাত্র নেই। জামা-কাপড়গুলো এধার-ওধার ছড়ানো রয়েছে। সঞ্জীবও সমস্ত দেখে শুনে অবাক। অগত্যা সমস্ত কিছু কুড়িয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হল।

সুনীল বলল, এমন অদ্ভুত চোর তো দেখা যায় না। দামী জামা-

কাপড় ফেলে রেখে, পুরানো একটা সুটকেশ নিয়ে সরে পড়েছে।

—গ্যারেজের দারোয়ান করছিল কি ? চল, খোঁজ-খবর নেওয়া যাক।

—চেপে যাও। খোঁজ-খবর নিতে গেলেই পুলিশ আসবে। একটা পুলিশি-ঝামেলায় জড়িয়ে রয়েছি। পুরানো সুটকেশের জন্য দ্বিতীয়বার ওই ঝামেলায় পড়া ঠিক হবে না।

এই সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

সঞ্জীব গিয়ে দরজা খুলল।

সুবেশ এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—কাকে চাই ?

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে কেন এখানে এসেছে জানাল। সুনীলও এগিয়ে এসেছিল। দুজনের মধ্যে কেউই আজ পর্যন্ত প্রাইভেট ডিটেক্টিভ দেখেনি। সকালে এই দ্বিতীয়বার ওদের অবাক হবার পালা। বাসবকে ভেতরে নিয়ে এসে বসাল।

সঞ্জীব বলল, কি কুক্ষণে যে আমরা সেদিন ডার্লিং ডেন'এ গিয়েছিলাম তাই ভাবছি। বিশ্বাস করুন, খুন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

—ঠিকই বলছেন হয়ত। বাসব বলল, তবু দু-চারটে প্রশ্ন না করে থাকতে পাচ্ছি না। আগে অনুগ্রহ করে আপনাদের নাম বলুন। আমার পক্ষে চিনে নিতে তাহলে সুবিধা হবে।

দুজনেই নিজের নিজের নাম বলল।

—প্রথমে আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি, খুনের তদন্তে এলেও, আমি পুলিশের লোক নই বুঝতে পাচ্ছেন। প্রাণ খুলে কথা বলুন। গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। মনে রাখবেন, হত্যাকারিকে ধরার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে আপনাদের উপরও রয়েছে।

—আমরা যা জানি পুলিশকে বলেছি। সঞ্জীব বলল, যদি শুনতে চান, আবার সেই সমস্ত কথা বলতে পারি।

—পুলিশকে বলেননি, এমন একটা কথা অন্ততঃ আমার মনে পড়ছে। আপনি অবশ্য অস্বীকার করে গেছেন, তবু আমার বিশ্বাস সেদিন আপনি কোট পরে গিয়েছিলেন। কোটটা বান্ধবীর হাত দিয়ে পাচার করিয়ে দিয়েছিলেন কেন বলুন তো ?

—দেখুন—

—আমি সত্যি কথা শুনতে চাইছি মিঃ ভট্চায।

একটু থেমে সঞ্জীব বলল, ব্যাপারটা কি জানেন, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম বলে পুলিশকে বলিনি। অফিস-ঘরে ঢোকার পর মণিকা চৌধুরীকে মরে পড়ে থাকতে দেখলাম। সেই সময় কোন ভাবে কোটের হাতায় রক্ত লেগে গিয়েছিল। রক্ত দেখে পাছে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করে তাই

কোটটা সরিয়ে দিয়েছিলাম পাতার হাত দিয়ে।

এই হল ব্যাপার।

বাসব পাইপ ধরাল।

—আপনি ছাড়া অফিস-ঘরে আর দুজন ঢুকেছিল ?

—হ্যাঁ।

খুব ভাল করে মনে করুন, আর কেউ গিয়েছিল কি ?

—না।

সুনীলবাবু, আপনি কি বলেন ?

—সুনীল বলল, সঞ্জীব এবং আর দুজন লোক ছাড়া চতুর্থ কাউকে ওই ঘরে ঢুকতে দেখিনি।

—আপনারা সেদিন ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন ?

—অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কোথায় আর যাব ? বাসায় ফিরে এলাম। গাড়ি ছিল বলে কোন অসুবিধা হয়নি।

আচ্ছা, গাড়িটা রেখেছিলেন কোথায় ?

—ডার্লিং ডেন'এর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই।

সঞ্জীব বলে উঠল এই সময়, গাড়িতে আরেক ঝামেলা হয়েছে। কেরিয়ারে সুনীলের সুটকেশ ছিল। সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বাসব সোজা হয়ে বসল।

—কি রকম ?

ওরা পর্যায়ক্রমে ব্যাপারটা বলল।

দেখাল জামা-কাপড়গুলো।

—কেরিয়ার লক করা ছিল না ?

সুনীল বলল, ছিল। তবে আজকালকার যা ব্যাপার-স্যাপার তাতে অন্য গাড়ির চাবি দিয়েও অন্য গাড়ির কেরিয়ার খোলা যায়। শুনলে অবাক হবেন, একবার আমি গোদরেজের চাবি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করেছিলাম।

—বিচিত্র ব্যাপার! যাহোক, এ-সম্পর্কে আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। আমি দেখি আপনার সুটকেশ উদ্ধার করে দিতে পারি কিনা। পুলিশে খবর দিয়েছেন।

—পুলিশের কাছে যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ঝামেলা বাড়বে ?

—গ্যারেজের ঠিকানাটা আমায় দিন।

সুনীল ঠিকানা দিল।

—আপনার গাড়ির নম্বরটা কি ?

নম্বর দেওয়া হল।

আরো দু-চার কথার পর বাসব ওখান থেকে উঠল।

বাসবকে সন্ধ্যায় দেখা গেল ডার্লিং ডেন'এ। আজও তেমন ভিড় নেই ছাড়াছাড়া ভাবে সুরাপায়ীরা বসে আছেন। ঢুকেই দেখা হল শিবশঙ্করের সঙ্গে। নতুন একটি মেয়ে রিসেপসন কাউণ্টারে বসেছে, তাকে কিছু বুঝিয়ে বলছিলেন তিনি। বাসবকে দেখে এগিয়ে এলেন।

হাসি ফুটে উঠল মুখে।

বাসব বলল, কর্তা কোথায় ?

—অফিস-ঘরে আছেন। কথা বলছেন একজনের সঙ্গে।

—পুলিশ অফিস-ঘর খুলে দিয়ে গেছে নাকি ?

—না। অন্য একটা ঘরে আপাততঃ অফিস করা হয়েছে। ওঁকে খবর দেব নাকি ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল এখনই দরকার নেই। ততক্ষণ বরং আপনার সঙ্গে কথা বলি। মণিকা চৌধুরীর সঙ্গে মিঃ গাঙ্গুলীর কেমন সম্পর্ক ছিল বলতে পারেন।

—ভাল। কর্মচারীদের সঙ্গে উনি ভাল ব্যবহারই করে থাকেন।

—সম্পর্ক বলতে আমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলছি। অর্থাৎ কোন দুর্বলতা ছিল কিনা জানতে চাইছি। আপনার কাছে তো কিছুই অজানা থাকার কথা নয়।

জিব কাটলেন শিবশঙ্কর।

—এ-সমস্ত কি বলছেন! আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার কি দরকার। এক-ফ্ল্যাট বাড়িতে অবশ্য দুজনে থাকতেন। তার ভেতরে ভেতরে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

—আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন ?

—বছর দুয়েক হবে।

—আগে কি করতেন ?

—কিছুই না। বেকার ছিলাম। চাকরির সন্ধানে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কেন জানি না মিঃ গাঙ্গুলী আমাকে পছন্দ করে ফেললেন। তারপর থেকে এখানে আছি।

বাসব আর শিবশঙ্করের মধ্যে যখন বাইরে কথা হচ্ছে তখন নতুন অফিস ঘরের ভিতরের দৃশ্য অন্যরকম। ছোট একটা টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে মলয় বসে আছেন। এধারে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্ণকমল।

—আপনাকে আমি নিজের পরিচয় দিলাম। আপনি আমার বাবাকে কিভাবে ঠকিয়েছেন সে কথা যে আমি জানি তাও আপনি শুনলেন। এবার বলুন কি স্থির করলেন ?

নির্বিকার মুখে মলয় বললেন, স্থির করবার তো কিছু নেই। আপনার পাগলামি এতক্ষণ যে শুনেছি এই যথেষ্ট। এবার আপনি যেতে পারেন।

—এত সহজে সমস্ত কিছু মিটিয়ে ফেলা যাবে না মিঃ গাঙ্গুলী। ব্যাপারটা নিষ্পত্তি না করে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।

—আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছেন বোধহয় এই বার'এর মালিক আমি। আমার লোকজন এখনই আপনাকে এখান থেকে বার করে দিতে পারে।

—ডাকুন তাদের। চেষ্টা করে দেখুক।

আপনি কি চান, আমি পুলিশে খবর দেব।

স্বর্ণকমল হেসে উঠল।

—সত্যি কথা বলতে কি আমি তাই চাই। জানেন নিশ্চয়, কালো টাকার সন্ধানে পুলিশ হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচেছ।

মলয় নড়ে-চড়ে বসলেন।

—কি বলতে চাইছেন।

চিবিয়ে চিবিয়ে স্বর্ণকমল বলল, শুনুন মিঃ গাঙ্গুলী, পরিষ্কার ভাবেই আমি আপনাকে বলতে চাই, বাবাকে ঠকিয়ে যে টাকাটা নিয়েছেন তা আমার চাই। দেন ভালই, নইলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে টাকার যে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, তার সন্ধান আমি পুলিশকে দেব।

—আপনার যা মনে আসে তাই করুন।

—এই বোধহয় আপনার শেষ কথা।

—হ্যাঁ। আসুন তাহলে—

দরজা পর্যন্ত গিয়ে স্বর্ণকমল ঘুরে দাঁড়াল।

—যাবার আগে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে যাই। আপনার ফ্ল্যাটের ডায়নিং টেবিলটা কি সরিয়ে ফেলেছেন ?

ঝটিতে চেয়ার ছেড়ে মলয় উঠে দাঁড়ালেন।

—তার মানে ?

—বুঝতে পাচ্ছেন না, আমি আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলাম। বিশাল ডায়নিং টেবিলের উপকার আবরণের তলটা যে বাক্সর আকারে তৈরি তা আমি দেখেছি। লাখ লাখ টাকা লুকোবার পক্ষে চমৎকার জায়গা সন্দেহ নেই।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে স্বর্ণকমলের পথরোধ করলেন মলয়।

বললেন গলা নামিয়ে, আমার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। কি রকম গোলমালে জড়িয়ে আছি আপনি জানেন। অর্থ-ক্ষতিও হয়ে গেছে। মাথার ঠিক নেই। সময় সময় এমন সমস্ত কথা বলে ফেলেছি যার কোন মানে হয় না। বলুন কত টাকা হলে চলবে আপনার ?

—আপনি যে শেষ পর্যন্ত ভিজে বেড়াল হয়ে পড়বেন তা আমি জানতাম। কি বলছিলেন, কত টাকা চাই আমার ? যা নিয়েছেন তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি নয়।

—ফিগারটা জানতে চাইছি।

স্বর্ণকমল কিছু বলতে যাবার আগেই ঘরে প্রবেশ করলেন কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে তাপস লাহা। মলয় গাঙ্গুলী প্রথমে সচকিত, তারপর বিরক্ত হলেন।

তাপস প্রাণখোলা হাসি হেসে নিয়ে বললেন, স্বীকার করতেই হবে, আপনি একজন মহাপুরুষ ব্যক্তি। ভদ্রলোককে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন না। টাকাটা দিয়ে দিন।

তীক্ষ্মগলায় মলয় বললেন, আপনি আড়িপেতে সমস্ত কথা শুনেছেন ?

অনিচ্ছার সঙ্গেই। আমার হাতে সময় বেশি নেই। এ'কে ছেড়ে না দিলে, ফোলিও ব্যাগ সম্পর্কে কথাবার্তাটা বলা যাবে না।

—ব্যাগটা এনেছেন ?

—অন্যের সামনে আলোচনা করতে আপনার আপত্তি নেই দেখা যাচ্ছে। ভাল। ব্যাগ কাছাকাছিই আছে। মাল ছাড়লে আনিয়ে দেব। কালিদাস, ব্যাগটা আনতে তোমার কত সময় লাগবে ?

কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, মিনিট দশেক বস্।

ওদিকে—

শিবশঙ্কর একজন ওয়েটারের মুখে জানতে পারলেন, দুজন লোক নতুন অফিস-ঘরের দরজার সামনে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেতরে ঢুকে গেছে। ভেতর থেকে উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ আসছে।

শিবশংকরের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, কি হল ? গুরুতর কিছু আশংকা করছেন কি ?

আমাদের ব্যবসা তো খুব রিস্কের। কোন মাতাল মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে ঝামেলা বাধিয়েছে কিনা কে জানে।

—আসুন, দেখা যাক।

বাসবকে সঙ্গে নিয়ে শিবশংকর দ্রুত পায়ে এগুলেন। অফিস-রুমে ঢোকার পর স্বর্ণকমলকে দেখে বাসব কম অবাক হল না। স্বর্ণকমলেরও ওই এক অবস্থা। মলয় নিজের বেকায়দা অবস্থা থেকে সামলে ওঠার সুযোগ পেয়ে খুশী হলেন।

বললেন, আসুন মিঃ ব্যানার্জী। এ'দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি তাপস লাহা। মণিকা ইন্সিডেন্টের দিন এখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি লাহার বন্ধু, আর—

বাসব মৃদু হেসে বলল, মিঃ মুখার্জীর পরিচয় আর দিতে হবে না। এই কেসে উনিই আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন।

—তাই নাকি। জানা ছিল না।

এবার বাসবের পরিচয় দিলেন তিনি।

ভ্রু-কুঁচকে তাপস বললেন, কালিদাস, কালে কালে হল কি ? আমাদের

মত মিইয়ে পড়া দেশেও প্রাইভেট ডিটেকটিভ ?

কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তাইতো দেখছি বস্। দিনকাল বেশ পালটে গেছে।

—মিঃ ডিটেকটিভ ; আপনি এখানে কেন ? নেশা-টেশা করেন নাকি ?

বাসব হাসিমুখে বলল, আপনার বোঝা উচিৎ ছিল, মণিকা মার্ডার কেসের তদন্ত আমি বেসরকারী ভাবে হাতে নিয়েছি। শুনুন মিঃ লাহা, সব সময় অতিমাত্রায় স্মার্ট হতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এখন আমি গুটিকয়েক প্রশ্ন আপনাকে করব। তার উত্তর যদি দেন ভাল কথা, আর এড়িয়ে যদি যেতে চান, তবে জেনে রাখুন, বড় বেশি দায়িত্ব আপনি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন।

তাপস থতমত খেলেন।

—কে বলল, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না। বলুন, কি বলতে চান ?

—ধন্যবাদ। আগে আমি মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলব। আপনারা সকলে বাইরে অপেক্ষা করুন। পরে ডাকছি।

শিবশঙ্কর, তাপস লাহা এবং কালিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও স্বর্ণকমল দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে যাবার তার কোনরকম ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। সে দরজার কাছ থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল।

তারপর বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনার কথা রাখতে না পারার দরুণ দুঃখিত। নিজের স্বার্থের ব্যাপারটা এখনই সেরে নিতে চাই। মিঃ গাঙ্গুলীকে সব কথা বলেছি। এখন তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন না, পুলিশে যাবেন সেটা তাঁর বিবেচনা।

—মক্কেলের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আমিও আপনাকে ওই কথাই বলব। মিঃ মুখার্জীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। মনে হচ্ছে, উনি এমন কিছু জানেন যাতে আপনি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছেন না।

—তাছাড়া, মিঃ লাহা আড়িপেতে সমস্ত কথা শুনেছেন। আপনার পর্বত প্রমাণ টাকা কোথায় লুকানো আছে তা তাঁর জানা হয়ে গেছে। সেদিক থেকেও আপনার বিপদ কম নয়। আমার হিসাব আজ মিটিয়ে দিলে, বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলার সুযোগ আপনাকে দেব। ভরসা করি মিঃ ব্যানার্জী, এ-ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

বাসব বলল, যদিও ব্যাপারটা বেআইনী, তবু বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমি মুখ খুলব না। আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর পাওনা মিটিয়ে দিন। আমি না হয় সে সময় উপস্থিত থাকব।

মলয় গাঙ্গুলীর তখন দিশেহারা অবস্থা। ঘামে সমস্ত মুখ চটচট করছে। দু-আঙুলের ফাঁকে ডিউক অব ডারহাম জ্বলছে, ঠোঁটের আগায় তুলে নেবার কথা মনে পড়ছে না। এবার তিনি সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে

দিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তারপর।

বললেন, এত খারাপ সময়ের মুখোমুখি আমি জীবনে কখনও হয়নি। বিপাকের পর বিপাক। দোটানার মধ্যে আর না-থাকাই ভাল। আপনারা যখন কথা দিচ্ছেন মুখ খুলবেন না, তখন আমার হিসাব মিটিয়ে দিতে আপত্তি নেই। এখানকার কাজ শেষ হলে চলুন আমার ফ্ল্যাটে।

—ওই কথাই রইল তাহলে। মিঃ মুখার্জী এবার আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

স্বর্ণকমল বেরিয়ে যাবার পর বাসব আবার বলল, ভারি খারাপ লাগছে। আপনি বাঁকা-পথ দিয়ে প্রচুর রোজগার করেছেন, অথচ আপনাকে ধরিয়ে দিতে পাচ্ছি না। যাহোক, এবার আসল কথায় আসুন। যদি চান, আপনার এই প্রতিষ্ঠানের আগেকার সুনাম ফিরে আসুক, তবে মণিকার হত্যাকারিকে জন-সমক্ষে উপস্থিত করতে হবে। নিজের স্বার্থেই আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলুন।

—তাই হবে। বলুন?

—মণিকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম ছিল?

—কর্মচারীর সংগে যেমন মালিকের হওয়া উচিত?

—কোন রকম বিশেষ দুর্বলতা আপনার ছিল না বলছেন?

—না মশাই। টাকা সংগ্রহ করার দুর্বলতা ছাড়া আমার আর কোন বিষয়ের উপর দুর্বলতা নেই।

—পাঁচ হাজার টাকা খোয়া গেছে শুনলাম। অংকটা ওই—না আরো বেশি?

রুমাল দিয়ে আরেকবার মুখ মুছে নিয়ে মলয় বললেন, পুলিশকে যদি না জানান তবে সাতা কথাটা বলতে পারি।

—তাই হবে।

—আটচল্লিশ হাজার টাকা ছিল। মণিকা অফিস-রুমে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ আগে টাকাটা আমি একজন মক্কেলের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

—টাকা দেরাজে রাখার পর চাবি বন্ধ করেছিলেন, পরিষ্কার মনে আছে?

—চাবি লাগিয়েছিলাম পরিষ্কার মনে আছে।

—আচ্ছা, নোটগুলো কি সব একশ টাকার ছিল।

এই ধরনের প্রশ্ন শুনে মলয় গাংগুলী অবাক হলেন।

—বললেন, না। সবই দশ টাকার। আটচল্লিশটা বাণ্ড ছিল।

—আপনার সেই মক্কেলের নাম জানতে পারি কি?

—ক্ষমা করবেন। নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, খুনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কাজ চুকে

যাবার পর তাকে আমি বাথরুমের দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছিলাম। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসি।

বাসব পাইপ ধরাল।

—আপনি পুলিশকে বলেছিলেন, ট্রাঙ্ককল অ্যাটেণ্ড করতেই আপনি মণিকাকে অফিস-রুমে বসিয়ে রেখেছিলেন। পরেও তো ট্রাঙ্ককল আসেনি।

—না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, কোন ট্রাঙ্ককল আসার কথা ছিল না। আসলে এতগুলো টাকা দেরাজে ছিল। খালি অফিস-রুম ছেড়ে অন্যত্র যেতে মন চাইছিল না। তাই মণিকাকে ট্রাঙ্ককলের অজুহাতে ওখানে বসিয়ে রেখেছিলাম।

—এত কাণ্ড করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। যা হোক, একটা চাবি দিয়েই অফিস-ঘরের টেবিলের সব দেরাজগুলো খোলা যায়?

—হ্যাঁ।

—একটা দেরাজের গা-তালা খুলে রাখা রয়েছে দেখলাম। কেন বলুন তো?

—খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে পাঠিয়েছিলাম। তারপর লাগানো হয়নি।

—কোথায় ঠিক করতে পাঠিয়েছিলেন?

—স্টিল সেণ্টার-এ। ওখান থেকেই টেবিলটা কেনা হয়েছিল। ছোটখাট নতুন কোম্পানি। তবে স্টিলের আসবাব-পত্র বানায় ভাল।

বাসব স্টিল সেণ্টার-এর ঠিকানা নিল।

আর কোন প্রশ্ন ছিল না। তাপস লাহাকে পাঠিয়ে দিতে বলল বাসব। মলয় গাঙ্গুলী বেরিয়ে যাবার পর, তাপস ঘরে প্রবেশ করলেন। অবশ্য একা নয়। তাঁর সব সময়ের সঙ্গী কালিদাসও রয়েছে সঙ্গে।

—শুধু আপনাকে ডেকেছিলাম।

বিচিত্র সুরে হেসে নিয়ে তাপস বললেন, আপনি আবার ওকে পরে ডাকবেন। সঙ্গে করে তাই নিয়ে এলাম। কথাটা কি জানেন, আমি যা দেখেছি, ও তাই দেখেছে। আমি যা শুনেছি, ও তাই শুনেছে।

—পুলিশকেও আপনি এই কথা বলেছিলেন।

—একমুখে দু' রকম কথা তো বলতে পারি না?

—তা বটে। তবে আমার কি মনে হয় জানেন, একটা ক্ষেত্রে অন্তত আপনি যা দেখেছেন, আপনার সঙ্গী তা দেখার সুযোগ পাননি। সেদিন অফিস ঘরে ঢোকার পর আপনি মণিকা চৌধুরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। অথচ—

—কি বলছেন! তখন সে বেঁচে ছিল।

—থাকলেই ভাল। না হলে কিন্তু আপনি ভীষণ বিপদে জড়িয়ে পড়বেন। শুনলাম, পুলিশ কি সূত্রে যেন জানতে পেরেছে, মণিকা আটটা পঁচিশ

মিনিটের আগেই মারা গেছে। আপনি ঘরে ঢুকেছেন সাড়ে আটটার পর। বলছেন, সে বেঁচে ছিল। ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে না কি? পুলিশ কিন্তু আপনাকে চেপে ধরবে।

টোপটা ভাল ভাবেই গিললেন তাপস লাহা। তাঁকে এবার কিঞ্চিৎ বিচলিত দেখা গেল।

পকেট থেকে প্যাকেট বার করে দ্রুত হাতে সিগারেট ধরালেন। ঘন ঘন টান দিলেন কয়েকবার। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন তারপর।

—আসল কথাটা এবার বলে ফেলা যাক। ঘাবড়ে গিয়ে তখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। অফিস-ঘরে গিয়ে দেখি মণিকা চৌধুরী মরে পড়ে আছে। আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখুন। মানে—

—ভরসা করি—এবার আপনি আসল কথাটা চেপে যাচ্ছেন না।

বিশ্বাস করুন এইটাই হল আসল কথা। নার্ভাস হলে যা হয় আর কি। পুলিশের জেরায় পড়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমি মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি।

—সেদিন আপনারা গাড়িতে এসেছিলেন?

—না।

—ঠিকানা তো দেখলাম উত্তর কলকাতার। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন গভীর রাতে। ওই অসময়ে এতটা পথ গেলেন কি ভাবে?

—বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির সন্ধান করলাম। পেলাম না। তখন—

কালিদাস বলে উঠল, তখন আমরা-স্থির করলাম, মলয় গাংগুলীকে বলি, তাঁর গাড়ি আমাদের পেঁছে দিয়ে আসুক। কিন্তু তাঁর গাড়িও ছিল না। অগত্যা আমাদের হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত যেতে হল।

—তারপর ট্যাক্সি পেলাম। তাপস বললেন, গাংগুলীর গাড়ি থাকলে পেতামই। অনিচ্ছা থাকলেও দিতে হত। একটু বেকায়দায় আছে কিনা।

—কি রকম?

—না, মিঃ ডিটেকটিভ, আপনার সব আগ্রহ মেনে নিতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, খুনের সংগে সে ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আপনাদের আর আটকাব না। পরে হয়ত আবার কথা হবে।

তাপস বললেন, মিথ্যা কথা শুধরে নিয়েছি। পুলিশ যাতে আমাকে নিয়ে টানাটানি না করে সেদিকটা একটু দেখবেন।

—দেখব।

সকলে ঘরের বাইরে এল।

স্বর্ণকমল ব্যগ্রভাবে দাঁড়িয়েছিল।

বলল, এবার আমরা মিঃ গাংগুলীর ফ্ল্যাটে যেতে পারি।

—যাওয়া যেতে পারে। আপনি কি বলেন ?

ম্রিয়মান গলায় মলয় বললেন, চলুন।

কার-পার্কের কাছে গিয়ে বাসব বলল, আপনারা গাড়িতে গিয়ে বসুন। আমি কার-অ্যাটেণ্ডেণ্টের সংগে কথা বলে আসছি।

কার-অ্যাটেণ্ডেণ্টকে সহজেই পাওয়া গেল। বয়স কুড়ির উপর হবে কিনা সন্দেহ। বেশ ধারাল চেহারা। গাঢ় নীল রং-এর পোশাকে মানিয়েছেও ভাল। সপ্রতিভ মুখে এসে দাঁড়াল। সে বুঝতে পেরেছিল, কর্তা যাঁকে খাতির করছেন তিনি কেউকেটা না হয়ে যান না।

—তোমার নাম হরিপদ ?

—আজ্ঞে, হরিপদ শীল।

—তোমাদের এখানে যে খুন হয়ে গেছে, তার তদন্ত করতে এসেছি। কয়েকটা প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর দেওয়া চাই।

—আমি তো কিছু জানি না স্যার।

—যা জানো, সেই রকম প্রশ্নই করব।

—বলুন ?

—সেদিন—খুনের সংবাদ যখন জানতে পারলে তখন কোথায় ছিলে ?

—এখানেই ছিলাম।

—তারপর কি হল।

প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে হরিপদর কিছু সময় লাগল।

তারপর বলল, হুড়মুড় করে লোকেরা বেরিয়ে আসছিল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। যে যার গাড়ি নিয়ে পড়ি কি মরি করে চলে যেতে লাগল।

—একটাও গাড়ি আর রইল না ?

—আজ্ঞে, তিনটে গাড়ি ছিল।

—গাঙ্গুলী সাহেবের গাড়ি ছিল এখানে ?

—ছিল।

—ভেতরে একবারও যাওনি ?

—ভিড় কমে যাবার পর ভেতরে গিয়ে দেখছিলাম পুলিশ কি করছে। কিছুক্ষণ ছিলাম স্যার। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসি।

—তখন গাড়ি তিনটে ছিল ?

—সাহেবের গাড়ি আর আরেকটা গাড়ি ছিল না। তৃতীয় গাড়িটাও এই সময় চলে গেল। আমি আর কি করব স্যার শুতে চলে গেলাম।

—তোমার কথা শুনে খুশী হলাম। আমি কি প্রশ্ন করছিলাম কাউকে বলবে না। এই নাও, দশটা টাকা—

টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়েই বাসব এগিয়ে গেল। হরিপদ কিছু বলার

সুযোগ পেল না। মলয় কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।
স্বর্ণকমল বসেছিল নির্বিকার মুখে। বাসব তার পাশে এসে বসল।

—মিঃ গাঙ্গুলী, সেদিন কটায় নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছিলেন?

—ভোর হয়ে গিয়েছিল।

—ফিরেছিলেন কিসে—ট্যাক্সিতে?

—নিজের গাড়ি থাকতে ট্যাক্সিতে ফিরব কেন?

তাও তো বটে। চলুন।

মলয় গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

পরেরদিন লালবাজারে হোমিসাইড স্কোয়াডের পুরন্দর সামন্তর সঙ্গে দেখা করে বাসব যখন বাড়ি ফিরে এল, বেলা তখন একটু গড়িয়েছে। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট দেখে এসেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্পাইনাল কর্ড ছিন্ন-ভিন্ন করে আঘাত গভীরে চলে গেছে। মৃত্যু এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। এছাড়া মাথার মাঝখানে সামান্য আঘাত ছিল। অল্প রক্তপাতও হয়েছিল মাথার চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে।

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল, শৈবাল বসে আছে।

—কোথায় ছিলে? আমি প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে আছি।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বাসব বলল, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার চেষ্টা করছি। এগিয়েছিও বেশ খানিকটা।

—কি রকম?

—কাল সন্ধ্যায় 'ডার্লিং ডেন'-এ গিয়েছিলাম। ওখানে কি কথাবার্তা হয়েছিল সে কথাই তোমাকে আগে বলি।

বাসব সমস্ত কথা বলল।

শৈবাল বলল, স্বর্ণকমলবাবু নিজের টাকাটা ফেরত পেলেন খুবই সুখের কথা। কিন্তু এইসঙ্গে মলয় গাঙ্গুলীর দুর্নীতি চেপে যেতে হচ্ছে এও কম পরিতাপের বিষয় নয়।

—আমি কথা যখন দিয়েছি তখন পুলিশকে কিছু বলব না। তবে উনি গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবেন না। পরিস্থিতি ওঁকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে। শোন ডাক্তার, ছোটখাট যে সমস্ত জট ছিল, আমি ছাড়িয়ে ফেলেছি। তবে সে-কথা আরম্ভ করার আগে আমাদের এক কাপ কফি খাওয়া বোধহয় দরকার।

বাহাদুরকে ডেকে কফির অর্ডার দেওয়া হল।

—কফি আসতে কিছু সময় লাগবে। তুমি আরম্ভ কর।

—হত্যাকারি কে এখনও জানতে না পারলেও, ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছে, কেন ঘটেছে তা মোটামুটি আঁচ করে নিয়েছি। চুরিই ছিল মূল উদ্দেশ্য,

বেকায়দায় পড়ে বেচারি মণিকা প্রাণ হারিয়েছে। যে কোন উপায়ে হোক হত্যাকারি জানত অফিস-ঘরের দেরাজে আটচল্লিশ হাজার টাকা থাকবে। টাকাটা হাতাবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে ওঘরে ঢোকে। মণিকাকে তার আগেই ট্রাঙ্ককলের অজুহাতে ওখানে পাঠানো হয়েছে। বলা বাহুল্য হত্যাকারি একথা জানত না। জানলে কখনই ওই সময় যেত না ওখানে। আমার দৃঢ় ধারণা সে কিন্তু ঘরে ঢুকেই মণিকাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে, প্যাসেজের মুখের দরজার সামনে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে থাকত না।

—কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।

—গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা না করলে হেঁয়ালির মত শোনাবেই। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাথার চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটেছিল। অবশ্য আঘাত গুরুতর নয়। আমার মনে হয়, হত্যাকারি যখন ঘরে ঢোকে সে সময় মণিকা বাথরুমে গিয়েছিল। দ্রুত দেরাজ থেকে নোটের বাণ্ডগুলো বার করে; নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য সে দরজার একটা পর্দা খুলে নিয়ে মুড়ে ফেলে বাণ্ডগুলো। ঠিক এই সময় মণিকা বাথরুম থেকে ফিরে এসে, প্যাসেজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে। হত্যাকারি প্রমাদ গুনল। এবার নিশ্চিত ভাবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন তার সামনে একটা পথই খোলা ছিল, মণিকাকে চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দেওয়া। এখানে মনে রাখতে হবে দুজনেই দুজনের পরিচিত। গুটিকয়েক তীক্ষ্ন প্রশ্ন নিশ্চয় মণিকা করেছিল। হত্যাকারি আর সময় নষ্ট করেনি। অতর্কিতে মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর বডি তুলে এনে চেয়ারে বসায়। বাকি কাজটা শেষ করে এবার।

—তারপর ?

বাহাদুর দু-কাপ কফি দিয়ে গেল।

কাপ তুলে নিয়ে বাসব বলল, এটা প্রিপ্ল্যান্ড মার্ডার নয়। হত্যাকারির মনের প্রস্তুতি ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই সে অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। পর্দায় মোড়া টাকাটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল বাথরুমের দরজা দিয়ে। নার্ভাসনেস-এর দরুণই এই সময় একটা ভুল করে বসল সে। যে গাড়ির কেরিয়ারে টাকাটা লুকিয়ে রাখার কথা ছিল, সেখানে না রেখে অন্য একটা গাড়ির কেরিয়ারে টাকাটা রাখল। ভুলটা অবশ্য ধরা পড়ত যদি, তার কাছে থাকা চাবি দিয়ে ওই গাড়ির কেরিয়ার না খুলত। কিন্তু আমরা শুনেছি, একই গাড়ির চাবি সময় সময় অন্য গাড়িতে চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারে।

—তুমি বলতে চাইছ, পুলিশ এসে যাবার পর যখন জেরা-টেরা চলছে তখন একবার বাইরে বেরিয়ে গাড়িটাকে ভালভাবে দেখে নেবার পরই নিজের মারাত্মক ভুল করার কথা বুঝতে পেরেছিল ?

—ঠিক তাই। তুমি প্রশ্ন তুলবে, তাহলে টাকাটা গাড়ি বদল করে রাখেনি কেন? না রাখার কারণ বোধহয় হরিপদ। আমি কার-অ্যাটেণ্ডেণ্টের কথা বলছি। সে তখন ওখানে ছিল। তার চোখে পড়ার ভয় থাকায় হত্যাকারি তখন আর কিছু করেনি। তক্কে তক্কে রইল। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, ওই বিশেষ গাড়িটা সুনীলবাবুর। ওঁরা পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যখন যাত্রা করলেন, তখন হত্যাকারিও অন্য গাড়ি চেপে অনুসরণ করল। ভাগ্যক্রমে হরিপদ তখন ওখানে ছিল না। সুনীলবাবুরা বারোয়ারি গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাসায় ফিরে গেলেন। এরপর হত্যাকারি কেরিয়ার থেকে পর্দায় মোড়া টাকা বার করে সুনীলবাবুর সুটকেশ ভরে ফেলে। ক্যারি করার পক্ষে আরো সুবিধা হল। তারপর সে ওখান থেকে চম্পট দেয়।

—সমস্ত ঠিক ঠাক আছে। শুধু শেষের দিকটা বড় বেশি জলবৎতরলং হয়ে গেল। দেরাজের চাবি হত্যাকারি কোথা থেকে পেয়েছিল তা তুমি বলতে পারনি। কোন ভাড়া করা গ্যারেজে রাত-দুপুরে ঢুকে পড়ে, কোন কিছু নিয়ে সরে পড়া সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিছু জট ছাড়িয়ে ফেলতে পারলেও এখনও কিছু রয়ে গেছে। আরো মাথা ঘামাতে হবে। যেতে হবে কয়েক জায়গা।

—কোথায়?

—যেমন ধর, ললি আহুজার হোটেলে।

—সে নাচিয়ে! সে তোমায় কি সাহায্য করবে?

—এখনই জোর দিয়ে কিছু বলতে পাচ্ছি না। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। তারই জের টেনে ওর কাছে যাওয়া।

—তোমার কথাটা কিন্তু বুঝলাম না।

—লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, সকলেরই টাইট অ্যালিবাই। সকলে সময়ের নিক্তিতে যেন পা ফেলেছে। একজনের মাপা সময়ের মধ্যে কিছুটা ফাঁক পাওয়া যায় কিনা আমি দেখতে চাই।

—অর্থাৎ তুমি একজনকে টার্গেট করেছ?

বাসব মৃদু হাসল।

শৈবাল আবার বলল, সেই ব্যক্তিটি কে শুনি?

বাহাদুরের নিরেট চেহারা দেখা দিল। তার পিছনে একজন সুবেশ ভদ্রলোক। বাসব নাড়-চড়ে বসল। ভদ্রলোক সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বাহাদুরকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মাঝামাঝি চলে এলেন।

বললেন আমি অনুপ ভট্টাচার্য।

আসুন—আসুন—

—দুর্ঘটনার দিন আমি 'ডার্লিং ডেন'এ উপস্থিত ছিলাম। পুলিশের মুখে শুনলাম, আপনি বেসরকারী ভাবে তদন্ত ভার গ্রহণ করেছেন। আমাকে আপনার প্রয়োজন হতে পারে ভেবেই চলে এলাম।

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। এসে পড়ে ভালই করেছেন। আপনার মত বিবেচনা বোধ সকলের হয় না। একি, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

অনুপ বসলেন।

—আপনি পুলিশকে যে জবানবন্দী দিয়েছেন, তা আমি পড়েছি মিঃ ভট্টাচারিয়া। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সেদিনকার ব্যবহার আমাকে কিছুটা বিস্মিত করেছে।

কি রকম?

—আপনি পুলিশকে বলেছেন, অফিস-ঘরে গিয়েছিলেন, মণিকাকে আগামীকাল ড্রাইভের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

—ঠিক তাই।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মচারি। আপনার স্ট্যাটাস এবং অন্যান্য সব কিছু উঁচু সুরে বাঁধা। এক্ষেত্রে আপনার মত একজনের পক্ষে বার'এর একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা বা তাকে নিজের গাড়িতে চড়িয়ে ফ্ল্যাটে পেঁছে দেওয়া, কেমন একটু বেখাপ্পা লাগছে না?

অনুপ হাসলেন।

—গাড়িতে চড়ার কথাও আপনি জানেন দেখছি! আপনাকে সব কিছুই বলব। সেজন্যই এলাম। মেয়েটির প্রতি যে আমার দুর্বলতা ছিল, তা কিন্তু নয়। আসল ব্যাপারটা হল অন্য ধরনের। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেশের অনেক বিষয়ের খোঁজ খবর রাখতে হয় নিশ্চয় জানেন। বিশেষে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে।

—মুদ্রামান নির্ধারণের দায়িত্ব তো আপনারই হাতে।

—শুধু তাই নয়, অন্যায়ভাবে দেশের অর্থনীতিকে বানচাল করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। দেশের অর্থনীতি নানা কারণে ঘা খায়। যার মধ্যে একটি হল, চোরাই সোনা আমদানী-রপ্তানী। মাস খানেক আগে আমরা কাস্টমসের সূত্রে জানতে পেরেছিলাম, কলকাতায় প্রচুর সোনার বিস্কুট বিদেশ থেকে চোরাপথে আসছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, নতুন নতুন যে সমস্ত বার বা রেস্টুরেন্ট গজিয়ে উঠছে, হোতারদের আড্ডা ওখানেই।

—আপনি তো অপরাধ জগৎ' এর কাহিনী শোনাচ্ছেন। তারপর বলুন?

—যদিও আমার কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। চাঁইদের খুঁজে বার-করবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বা স্থানীয় পুলিশের। কি খেয়াল হল, স্থির করলাম, আমি বেসরকারী ভাবে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখব। ডার্লিং ডেন'কে

বেছে নিলাম। কারণ ওই বার'এর আয়ু বেশিদিন না হলেও, ভীষণ ঢু-বাড়ন্ত। ওখানে যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। মলয় গাঙ্গুলীকে দেখেই মনে হল লোকটা স্মাগলার না হয়ে যায় না। ব্যাংকে তেমন ভারি এ্যাকাউন্ট নেই, অথচ দারুণ স্বচ্ছল অবস্থা। তখন আমার কাজ হল মণিকা চৌধুরীকে হাত করা। মণিকা চৌধুরী একই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। তার সুযোগ-সুবিধা অনেক। আমি তাকে চাকরির লোভ দেখিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, তার সাহায্যে মলয় গাঙ্গুলীর ভেতরের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। অর্থাৎ, তিনি কাদের সঙ্গে লেনদেন করেন, কোথায় মাল লুকিয়ে রাখেন ইত্যাদি। এই হল আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার নেই।

আপনার উদ্দেশ্য অবশ্য ভালই ছিল। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, আপনি যখন অফিস-ঘরে ঢোকেন তখন মণিকা বেঁচে ছিল।

—এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি পুলিশকে দিয়েছি।

মৃদু হেসে বাসব বলল, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি সত্যি কথা বলেননি। আপনার আগে যিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন, মণিকা তখন মারা গিয়েছে। এক্ষেত্রে আপনি তাকে কোনক্রমেই জীবিত অবস্থায় দেখতে পারেন না।

বলুন মিঃ ভট্টাচারিয়া, কি অবস্থায় দেখেছিলেন তাকে?

অনুপ একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন।

বললেন তারপর দ্রুত গলায়, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সত্যি কথা বললে পুলিশ আমাকেই হত্যাকারি মনে করবে। বিশ্বাস করুন, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই—

—তার মানে মণিকাকে আপনি মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

এমন কিছু চোখে পড়েছিল কি, যা আপনার কাছে বেখাপ্পা মনে হয়েছে?

—বেখাপ্পা?

—হ্যাঁ। সন্দেহের পর্যায়ে পড়ে এমন কিছু?

অনুপ চিন্তা করতে লাগলেন।

বললেন শেষে, আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না। তবে—। অফিস-ঘরে আমি তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর যখন বেরুচ্ছি—

—বলুন?

—ডার্লিং ডেন'এ কার-অ্যাটেন্ডেন্ট একটা ছোকরা আছে জানেন কিনা জানি না।

—জানি। কথা বলেছি তার সঙ্গে।

—দেখি, আমার গাড়ির ওপাশে দাঁড়িয়ে সেই ছোকরা উত্তেজিত ভাবে কার

সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখেই চুপ করে গেল।

—ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হল কেন আপনার ?

—দ্বিতীয় লোকটার মুখ আমি দেখতে পাইনি। একটু এগুতেই লক্ষ্য করলাম, দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের শরীরকে ঝুঁকিয়ে বাড়ির আড়ালে চলে গেল। ছোকরাকে প্রশ্ন করলাম, কে ছিল ? সে অম্লান বদনে উত্তর দিল, কেউতো না। এবার আপনিই বলুন সন্দেহজনক মনে হয় না কি ?

—হুঁ। ওই সময় কটা গাড়ি ওখানে ছিল।

—একটা। আমার গাড়িটা শুধু ছিল সেখানে।

—রাত তখন কটা হবে ?

—আন্দাজ সাড়ে বারটা। পুলিশের সঙ্গে কথা শেষ করার পরও আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। ফিরতে তাই এত দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আরও দু-চার কথার পর অনুপ বিদায় নিলেন।

বাসব হাই তুলল।

মুখে হাসি টেনে বলল, কি বুঝছ ডাক্তার ?

—এটা তো উল্টো প্রশ্ন ভাই। তুমি কি বুঝলে সে কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

—অর্থাৎ স্থির করে রেখেছ, এক ফোঁটা বুদ্ধি খরচ করবে না। অবশ্য বোঝাবুঝির এখন অনেক বাকি। ভাবছি হরিপদ ছোকরার সঙ্গে আরেকবার দেখা করব। ওখানে নয়, ওকে ডাকিয়ে অন্যত্র নিয়ে আসতে হবে।

—অনেকদিন এমন ঘোরাল কেস তোমার হাতে আসেনি, কি বল ?

—অবশ্য। তবে ঘোরাল শব্দের পরিভাষার দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এ কেসটার কথা ছেড়ে দাও। অনেক ডালপালা আছে, ঘোরাল তো বটেই। এক এক সময় এমন হয় ; ব্যাপারটা সহজ—সন্দেহভাজনরা হাতের মুঠোর মধ্যে, তবু হত্যাকারিকে ধরা যাচ্ছে না। প্রকৃত ঘোরাল কেস আমি একেই বলব।

—একটা উদাহরণ দাও, শুনি।

—মনে কর পাঁচজন লোক পিকনিক করতে চলেছে। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে কয়েকবার টান দেবার পর আরম্ভ করল, স্থির হয়েছে, শহর থেকে মাইল দশেক দূরে যে জঙ্গল আছে ওখানে ওরা যাবে। জঙ্গলে প্রচুর বন-মোরগ পাওয়া যায়। তাই ওরা আর সঙ্গে মাংস নেয়নি। বুনো-মোরগ মেরে পিকনিকের উৎকর্ষতা বাড়াতে খুব ভোরে তাই ওরা যাত্রা করেছে। সঙ্গে পাঁচটা ডাবল ব্যারেল সট-গান আছে। আছে রান্নার সামগ্রী, তৈজস পত্র, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি। কেমন লাগছে ?

—আরম্ভ ভালই করেছ। চালিয়ে যাও।

—জঙ্গলে পৌঁছাবার পর ওরা একটা পরিষ্কার জায়গায় জিপ থামাল সতরঞ্চি পাতা হল, জিনিস-পত্র নামানো হল। সবে তখন রোদ্দুর উঠেছে সকলেই বেশ খুশী খুশী। টোটা ভরে নিল যে যার বন্দুকে। সমস্যা দেখ দিল কিন্তু এরপর। সকলেই যদি শিকার করার জন্য জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তবে জিনিস-পত্র পাহারা দেবে কে? এ-কথাটা কারুর আগে মনে পড়েনি অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। নানা যুক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। শেষে স্থির হল অমুক এখানে থাকবে। জিনিস-পত্র পাহারা দেবে, উনুন-টুনু তৈরি করবে, তারপর বসে বসে ট্রানজিস্টার শুনবে।

চারজন বন্দুক ঘাড়ে করে চারদিকে চলে গেল। মন-মরা অবস্থায় পঞ্চমজন রয়ে গেল সেখানে। কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলের চারিধার থেকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। এইভাবে কাটল ঘণ্টা দেড়েক। তারপর চারজন প্রায় একই সঙ্গে ফিরে এল সেই খোলা জায়গায়। তাদের প্রত্যেকের হাতেই গোটা দু'তিনেক করে বন-মোরগ। মাংস এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু চারজনকেই প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা খেতে হল ওখানে পৌঁছাবার পর পঞ্চমজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মাটিতে। চারদিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে মাথা বলতে আর কিছু নেই। গুলির ঘায়ে একেবারে থেঁতলে গেছে। ট্রানজিস্টার কিন্তু বেজে চলেছে যথারীতি। কে একজন তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে পল্লীগীতি গাইছিলেন।

পরিস্থিতি এবার অনুধাবন করবার চেষ্টা কর ডাক্তার। ওই চারজনের মধ্যে একজন যে হত্যাকারি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। শিকারীদের মধ্যে কেউ একজন কোন সময় ফিরে এসে গুলি করেছে পঞ্চমজনকে তারপর আবার মিশে গেছে জঙ্গলে। গুলির আওয়াজে কেউ সচকিত হয়নি। কারণ মোরগের উদ্দেশে ঘনঘন তখন বন্দুক ছোঁড়া হচ্ছে এখান-ওখান থেকে গোলমেলে কেস হল এটা। রহস্যের ডালপালা নেই, ছিমছাম অথচ জটিল সূত্রের চিহ্ন মাত্র পাচ্ছ না, তবু তোমাকে হত্যাকারিকে ধরতে হবে—পাইপ নিভে গিয়েছিল, ধরিয়ে নিয়ে বাসব আবার বলল, ও আলোচনাটা এখন থাক। এবার বেরুতে হবে। তোমার হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, আজ ডিউটি নেই। চল, আমার সঙ্গে।

—কোথায় যাবে?

—লালি আহুজার সংগে দেখা করতে হবে আগেই বলেছি। এনায়েতের কাছেও যাব একবার।

—এর মধ্যে আবার এনায়েত আসছে কেন?

—তাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে হবে। দক্ষিণ হাতের কাজটা এবেলা এখানেই সেরে নাও ডাক্তার। বাহাদুরকে ব্যবস্থা করতে বল। তারপর

বেরুনো যাবে। আমি ততক্ষণে একটা ফোন সেরেনি।

বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল।

রিসিভার তুলে নিয়ে, ডায়েল করার পর সংযোগ হতেই বলল, হ্যালো ...বিজিত মুখার্জী আছেন...কথা বলছেন...একটা প্রয়োজনে বিরক্ত করলাম ...আরে না না—রেশের ঘোড়া হতে পারলে তো ভালই হত, এগুচ্ছি গুটি গুটি...শুনুন, যে-জন্য ফোন করছি...অফিস-ঘরের টেবিলের একটা দেরাজে গা তালা লাগানো নেই—গা তালাটা কিন্তু দেরাজের মধ্যেই আছে—ওটা আমার চাই...বলব আপনাকে পরে...সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন—ঠিক আছে— ছাড়লাম—

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের বাড়ি থেকে বেরুতে দেড়টা বেজে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওল্ডস মোবাইল ওরিয়েণ্টের সামনে এসে থামল। এনায়েতের পানের দোকান সিনেমা হলের প্রায় পাশেই। বাসবের কার্যকলাপের সংগে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই এনায়েতকে চেনেন। প্রাক্তন এই গুন্ডা এখন পান-সিগারেটের দোকান করেছে। নানা প্রয়োজনে বাসব ওকে কাজে লাগায়। বিনিময়ে গুঁজে দেয় হাতে কিছু।

এনায়েত ওদের দেখতে পেয়েই দোকান থেকে নেমে এল।

—সেলাম সাব।

—সেলাম। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত আছ?

—কি করতে হবে বলুন?

বাসব ডার্লিং ডেন'এর ঠিকানা দিয়ে বলল, ওখানকার কার অ্যাটেণ্ডেণ্টের নাম হরিপদ—বুঝলে তো, দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িগুলো যে দেখাশুনা করে। তাকে—

—সাফ করে দিতে হবে?

—আরে না না, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে।

—এই এক চুটকি কাজের জন্য সাব ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ঠিক শালাকে ওখান থেকে বার করে আনব। কটায় পেঁছাতে হবে?

—সাড়ে চারটের সময় এস।

বাসব পাঁচটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিল।

—নাও, ধর।

সবিনয়ে এনায়েত বলল, এই সামান্য কাজের জন্য টাকার দরকার ছিল না সাব। আমি ঠিক সাড়ে চারটের সময় পেঁছাব।

—কাজ আরো আছে। টাকাটা রাখ।

দেখতে দেখতে আরো তিনটে দিন পার হয়ে গেছে।

বাসব কতদূর এগুলো কিম্বা এখনও গোলক ধাঁধায় ঘুরছে কিনা, সে সম্পর্কে কিছু জানার আগে, খোঁজ-খবর বোধহয় নেওয়া দরকার, এই কেস-এর

সংগে সংশ্লিষ্ট সকলে এখন কে কি করছেন বা তাঁদের চিন্তা-ভাবনাই বা কি রকম।

মলয় গাংগুলীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

সাড়ে নটা বেজে গেছে। এই সময় ডার্লিং ডেন জমজমাট থাকার কথা কিন্তু খাঁ খাঁ করছে। হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমর্ষভাবে এধার-ওধার তাকাচ্ছেন মলয়। খালি টেবিলগুলো তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন বিদ্রুপের হাসি হাসছে। খদ্দেরহীন বার-কে আর কতদিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে। মনের এমন অবস্থা যে অতি সাধের ডিউক অব ডারহামও এখন বিস্বাদ ঠেকে।

শিবশঙ্কর দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ শুকনো। তিনি এখানকার প্রধান কর্মচারি, দুশ্চিন্তাকে পাশ কাটানো তাঁর পক্ষেও তাই সম্ভব নয়। সন্ধ্যার সময় কয়েকজন খদ্দের এসেছিল, তারপর থেকে সমস্ত ফাঁকা। এইরকম চলতে থাকলে তো চাকরি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

মলয় শিবশঙ্করকে কাছে ডাকলেন।

বললেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, লোকে কি মনে করছে এখানে এলেই খুন হয়ে যাবে? আমেরিকায় তো শুনি বার'এ বা হোটেলে ঘন ঘন খুন হয়। অথচ—

—কলকাতার লোক একটু ভীতু প্রকৃতির স্যার। তাদের মনে সাহস আসতে বোধহয় আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

—সেই ভরসায় তো আমি বসে থাকতে পারি না চক্রবর্তী। দিনের পর দিন কি রকম লোকসান হচ্ছে দেখছ তো? এক এক সময় মনে হচ্ছে ব্যবসা বন্ধ করে দিই।

করুণ গলায় শিবশংকর বললেন, আমার কি হবে স্যার? চাকরিটা দিয়েছিলেন বলে খেয়ে পরে বাঁচছি। বার বন্ধ হয়ে গেলে আমি কোথায় যাব?

—কোথাও যাবে না। আমার সংগে থাকবে। যদি বার বন্ধ করে দিতে হয়, তুমি আমার অন্যান্য কাজ করবে।

—ধন্যবাদ স্যার। ভাবনার হাত থেকে আমায় বাঁচালেন। তবে বার বন্ধ করে দিলে অন্য একটা অসুবিধা আছে।

—কি বলতো?

—হাতে একটা প্রতিষ্ঠান না থাকলে সোনার ব্যবসাটা চালিয়ে যাওয়া শক্ত হবে। সচকিত ভাবে মলয় বললেন, তাইতো। নানা ঝামেলার দরুণ আসল কথাটাই আমি ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। কোন একটা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে না থাকলে পুলিশের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সোনার ব্যবসা বন্ধ করতে পারি না, নইলে ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তা পূরণ করা যাবে না।

ওই ছোকরাকে কত দিতে হল?

—পঁয়ত্রিশ হাজার। আটচল্লিশ হাজার চুরি গেছে। তিরাশি হাজার

টাকা লসে আছি। এরপর আবার তাপস লাহা আছে। সে রাসকেল কত চেয়ে বসবে, কে জানে? তবু এই ব্যবসা তো মোটামুটি চলা চাই।

—আমার মনে হয় আবার আগেকার মতই চলবে। এখন শুধু সময়ের দরকার।

মন্দ বলনি।

এতক্ষণ পরে মলয় ডিউক অব ডারহাম ধরালেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ভাল কথা, কাল একজন উঁচুদরের খদ্দের আসবে মনে আছে তো? খাতির-যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

—আমি দৃষ্টি রাখব। পার্টি জেনুইন তো?

অদ্ভুত দৃষ্টিতে শিবশংকরের দিকে মলয় তাকালেন।

—তুমি কি আমাকে কচি খোকা পেয়েছ! লোক চরিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম। এখনও বুঝতে পারব না কে জেনুইন পার্টি?

আমতা আমতা করে শিবশংকর বললেন, আমি স্যার এত ভেবে বলিনি। দিনকাল খারাপ, উটকো লোকের সঙ্গে কারবার করতে গেলে যদি বিপদ হয় তাই—

—একদিক থেকে অবশ্য অন্যায় কিছু বলনি। সত্যি দিনকাল খারাপ পড়েছে। তবে এই পার্টিকে আমি বাজিয়ে দেখেছি—সন্দেহ করবার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি এসময় এরকম একজন লোককেই খুঁজছিলাম। মোটা খদ্দের।

—সম্প্রতি নেপাল থেকে যে মালটা এসেছে—

—হ্যাঁ। পুরো চালানটাই দিয়ে দেব। এই তাড়াহুড়োতে লাভ অবশ্য কিছু কম হচ্ছে, হোক। পুলিশী-ঝামেলা চলতে-থাকা পর্যন্ত আর একটা বিস্কুটও হাতে রাখতে চাই না।

মলয় কথা শেষ করে রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন।

এবার তাপস লাহার খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে।

উত্তর কলকাতার বনমালী কুণ্ডু লেনের এক পুরানো বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে তিনি থাকেন। অবশ্য মাঝে-মাঝেই মহানগরীর বাইরে যেতে হয় তাঁকে। মাথা খাটিয়ে রোজগারের যে সমস্ত পন্থা বার করেন, তার জন্যই এই ছুটোছুটি।

খাটের উপর তাপস আধ-শোওয়া অবস্থায় রয়েছেন। পরণে তাঁর দামী মাদুরাই লুঙ্গি, গায়ে কলিদার পাঞ্জাবী। কোন কড়া সিগারেটে সুখটান দিচ্ছেন তিনি। কালিদাস ফোমে-মোড়া একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। ট্রাউজার আর জেল্লাদার হওয়াই সার্ট তার গায়ে। বলা বাহুল্য সে এখানেই থাকে।

রাত তখন সাড়ে নটা।

গুরু গম্ভীর শব্দে তাপস ঢেকুর তুললেন।

—খাওয়াটা বেশ জবর হয়ে গেছে, কি বল?

—বলতে নেই বসু, খেতে আরম্ভ করলে তো আর আপনি থামতে চান না।

তোমার মত প্লেট ঠ্‌ুকরে তো আর উঠে পড়তে পারব না। এখন আর কি খাওয়া দেখছ। বছর পাঁচেক আগে আধ-বাটি মাংস না হলে আমার চলত না। বাজে কথা থাক। বল এবার, ওধারের খবর কি ?

—খবর সুবিধার নয়।

—মলয় শালা কি বলল তাই বল ?

কালিদাস কাঁধ ঝাঁকাল।

—আমি গিয়ে সাফ কথা বললাম, কি মশাই, মালটাল ছাড়বেন না, আমরা পুলিশের কাছে যাব। টাল-বাহানার একটা সীমা আছে। আমরা বার বার আসব আর ফিরে যাব, আর তা হবে না।

—তারপর ?

—গাঙ্গুলী একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। বলল, কিরকম ঝামেলা যাচ্ছে দেখছেন তো। আপনার বস্‌কে বলবেন, এসমস্ত চুকে গেলেই সমস্ত ব্যবস্থা হবে। ফোলিওটা যেন অন্য কারুর হাতে না পড়ে।

—তাপস লাহা যে কি বস্তু তা বুঝতে সময় লাগে। আমাকে অবজ্ঞা করার ঠেলা এখন সামলাক। তুমি কি বল কালিদাস, কয়েকদিন অপেক্ষা করব, না—

—হপ্তা খানেক অপেক্ষা করা যেতে পারে।

—বেশ।

তাপস বিছানা থেকে নামলেন।

—আজকের কাগজ পড়েছ ?

—না। পড়ার মত কোন খবর থাকে না।

—খবরের কথা বলছি না। সিনেমার পাতাটা দেখেছ কিনা জানতে চাইছিলাম। দেখে নাও একবার।

তাপস টেবিলের উপর থেকে দৈনিক-পত্র তুলে, ছুঁড়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট পাতা খুলে, সিনেমা থিয়েটারের নানা বিজ্ঞাপনের উপর দিয়ে কালিদাসের দৃষ্টি পিছলে যেতে যেতে এক জায়গায় থামল। বাংলা দৈনিকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন বড় একটা থাকে না। তবে আজ রয়েছে।

বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ—

শুভ সংবাদ

সুখ্যাত-ক্যাবারে নর্তকী ললি আহুজা আপনাদের
মুগ্ধ করার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হয়েছেন।
সুযোগ হারালে পরিতাপ করতে হবে।

আসুন

১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় অভিজাত-পানশালা
ডার্লিং ডেন'এ সবান্ধবে আসুন। এমন ছন্দময়
সন্ধ্যা জীবনে বারংবার আসবে না।

—কি বুঝলে ?

কালিদাস দৈনিক-পত্র মুড়ে রেখে বলল, বার চলছে না বস্‌। বম্বের ছুঁড়িটাকে আবার তাই নাচাতে চাইছে।

—খাঁটি কথা। ১৬ই নভেম্বর তো কাল। চল তাহলে, আমরাও নাচ দেখে আসি গিয়ে।

তাপস আবার বিছানায় এসে বসলেন।

এবার সঞ্জীবের ফ্ল্যাটে যেতে হয়।

রাত তখন দশটা। দুজনে মিনিট দশেক আগে রেঁস্তরা থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছে। সুনীল মুষড়ে-পড়া ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে আছে। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব সিগারেট টানছে।

এক সময় সুনীল বলল, কি ঝামেলায় পড়লাম বলতো ? এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে তো আর রোজগার হবে না। পুলিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা কবে পাব ভগবান জানেন।

সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ফেলবার পর সঞ্জীব বলল, ভারি খারাপ লাগছে। বলতে গেলে আমি তোমাকে এ-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়েছি।

—না না, তা নয়। এ হল কপালের ফের। রাণীগঞ্জ বাজারে ওই গুণ্ডা দুটো যদি আমার গাড়িতে এসে না উঠত তাহলে কিছুই হত না। যাক, যা হবার হবে। পাতার কথা বল। কতক্ষণ ছিলে ওর সংগে ?

—ঘণ্টা দুয়েক। গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। বাঁধা মাইনের ব্যবস্থা যাদের নেই তাদের পক্ষে এই ভাবে আটকে থাকা সত্যি খারাপ ব্যাপার। তবে—

—বাসববাবু আছেন এই যা ভরসা।

—আমারও তাই মত। এই কেসের একটা হিল্লে উনি করবেনই।

সুনীল সিগারেট ধরাল।

সঞ্জীব বলল, তোমাকে জিজ্ঞেস করাই হয়নি। গ্যারেজের ওনারের সংগে দেখা করেছিলে ?

—হ্যাঁ। আজ দুপুরেই দেখা হল। চমৎকার লোক। সুটকেশ চুরি সম্পর্কে সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলেন। সংগে সংগে ডেকে পাঠালেন দারোয়ানকে। নানাভাবে জেরা করা হল কিন্তু ব্যাটার পেট থেকে কিছু বার করা গেল না। তার বক্তব্য হল প্রতিদিনকার মত সেদিনও জেগে রাতভোর পাহারা দিয়েছে। কাউকে গ্যারেজের ভেতরে ঢুকতে দেখেনি।

—বুঝলে কিছু ? চোরের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে দারোয়ান। সে কাউকে দরজা ছেড়ে না দিলে সুটকেশ তো আর হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না।

—টাকাতো খেয়েছেই। আমি ভাবছি চোরের কথা। একটা পুরানো স্যুটকেশের জন্য এত কেরামতি সে দেখাল কেন?

—সেদিন বাসববাবুর কথা শুনে তো মনে হল, ব্যাপার খুব সুবিধার নয়। আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্যুটকেশ চুরির সঙ্গে খুনের সম্পর্ক আছে।

—আমি তাহলে গেছি। পুলিশ আবার আমায় কিভাবে জড়িয়ে ফেলে দেখ।

সুনীল ছোট হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটায় কয়েকবার ঘন ঘন টান দিয়ে আবার বলল, আর ভেবে লাভ নেই। কপালে যা আছে হবে। কাল সন্ধ্যায় ডার্লিং ডেন' এ যাবে নাকি?

—কেন?

—নাচ দেখতে।

সঞ্জীবের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

—নাচ!

—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, ললি আহুজার নাচের ব্যবস্থা হয়েছে আবার ওখানে। সেদিন তো ভাল করে দেখা হল না। ইচ্ছে করলে কাল সন্ধ্যায় দেখা যেতে পারে।

—আবার ওখানে যাবে?

—এও একটা কথা।

—যাওয়াই যাক। তুমি চলে যাবার পর তো আবার ক্যাবারে দেখার মুড পাব না।

সঞ্জীব আবার সিগারেট ধরাল।

বেলা তখন সাড়ে এগারটা।

অনুপ নিজের অফিসে রয়েছেন। বিশাল সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের উপর নানা প্রয়োজনীয় জিনিস সাজানো। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি একবার ফিরিয়ে নিলেই, নতুন করে তাঁর পদমর্যাদার কথা মনে পড়ে যায়। ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

সুইংডোর ঠেলে প্রবেশ করলেন অমূল্যবাবু।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। গায়ের রং টকটকে ফরসা। এক মাথা কোঁকড়া চুল। চশমা আছে চোখে। সব মিলিয়ে অবশ্য একটু নেয়াপাতি ভাব চোখে পড়ে। অনুপের দক্ষ সহকারীদের মধ্যে উনি একজন।

—স্যার, একটা খবর শুনেছেন?

অনুপ নিজের চশমা ঠিক করে নিয়ে বললেন, কি বলুন তো?

—পুলিশ এসেছিল আপনার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে। বড়সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে।

—তাই নাকি! ওদের কি ধারণা খুন আমিই করেছি?

—পুলিশ অনেক উদ্ভট-ধারণা নিয়ে থাকে। ওদের কথা বাদ দিন। তবে স্যার—আমার বলা ঠিক হচ্ছে না অবশ্য, তবু না বলে থাকতে পাচ্ছি না, কাজটা মোটেই ভাল হয়নি।

অনুপ মৃদু হেসে বললেন, আপনি অবশ্য তখন আমায় এ ব্যাপারে মাথা না গলাতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি কিন্তু অন্য কথা ভেবেছিলাম। আমার চেষ্টায় যদি সরকারের উপকার হয়, মন্দ কি।

অমূল্যবাবু বললেন, দেখলেন তো, কি রকম সমস্ত গোলমেলে কাণ্ড হয়। সমস্ত দেশেরই গোল্ড-স্মাগলাররা অত্যন্ত ধড়িবাজ। সারা পৃথিবীর পুলিশকে নাস্তানাবুদ করছে।

—আপনি ঠিকই বলছেন। ভাল কথা, আজ সন্ধ্যায় আপনি ফ্রি আছেন?

—কোথাও যেতে হবে স্যার?

—ক্যাবারে ডান্স আপনি কখনও দেখেননি। ফ্রি থাকলে, চলুন আমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসবেন।

—আমি স্যার কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মানে…

—কাগজে দেখলাম, আজ সন্ধ্যায় ডার্লিং ডেন'এ ললি আহুজার নাচের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আবার করা হয়েছে।

অমূল্যবাবু বিস্মিত গলায় বললেন, আবার আপনি ওখানে যাবেন?

—ভাবছি যাব।

—আমার যতদূর মনে পড়ছে, কি যেন নাম বললেন—যেদিন ওখানে খুন হয়, সেদিনও ওই মেয়েটি নেচেছিল।

—ঠিক বলেছেন। তাইতো আজ যাব।

—আমি স্যার ঠিক…

—বুঝতে পাচ্ছেন না?

অনুপ নড়ে-চড়ে বসলেন।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, আজও একটা খুন হবে। মনের মধ্যে দারুণ একটা উত্তেজনা বোধ আসছে। তাই ওখানে উপস্থিত থাকতে চাইছি।

খুন হবে আপনি—

—বললাম তো, আমার মনে হচ্ছে। তবে খুনই যে হবে তার কোন মানে নেই। তবে একটা না একটা গোলমাল বাধবেই। আমার ইনটিউশন খুব প্রবল জানেন তো? ও কি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসুন।

হতভম্ব অমূল্যবাবু বসলেন।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে স্বর্ণকমল থানায় ঢুকল। বাসবের কাছে গিয়েছিল কেসের কতদূর কি হয়েছে জানতে। তাকে বাড়িতে না পেয়ে থানায় চলে

এসেছে। বিজিত মুখার্জী থানায় ছিলেন। হাসি মুখে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। অনুরোধ করলেন বসতে।

—পথ ভুলে নাকি?

স্বর্ণকমল বলল, বাসববাবুর কাছে গিয়েছিলাম। ওঁকে বাড়িতে না পেয়ে আপনার কাছে চলে এলাম। দিন কেটে যাচ্ছে, কতদূর এগুল কাজ?

—দ্রুত এগুচ্ছে। আমরা জিতব।

—জিতলেই ভাল। হত্যাকারি ধরা না পড়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

—আমি কিন্তু একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না। হত্যাকারিকে হাতে পাওয়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি থাকার কথা মিঃ গাঙ্গুলীর। তিনি নির্বিকার। অথচ আপনার ব্যস্ততার সীমা নেই। এমন কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ পর্যন্ত অ্যাপয়েণ্ট করেছেন। এর কারণ কি? ভেতরের কথাটা এখনও খুলে বলবেন কি?

—কারণ একটা নিশ্চয় আছে।

—সেটাই তো জানতে চাইছি।

—না মশাই, মুখ খুলে আমি ফ্যাসাদে পড়তে চাই না। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। সত্যি কথা বললেও তারা নানারকম মানে করে নেয়। আমার যা বলবার বাসববাবুকে বলেছি। আপনাদের সামনে আর মুখ খুলছি না।

বিজিত মুখার্জী হেসে ফেললেন।

—আমাদের একেবারে সমাজের বাইরে রাখতে চাইছেন?

—কি করব বলুন? স্বভাবের দোষে সকলেই আপনাদের এড়িয়ে চলতে চায়।

—আমাদের কপাল খারাপ। ভাল কথা, যাচ্ছেন নাকি আজ?

স্বর্ণকমল অবাক হল।

—কোথায়?

—ডার্লিং ডেন-এ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেননি? মলয় গাঙ্গুলী আজ সন্ধ্যায় আবার ললি আহুজাকে ডাইসে আনছেন।

—তাই নাকি! বিজ্ঞাপন বড় একটা লক্ষ্য করি না। বার আবার জমজমাট করে তোলবার জন্য লোকটা উঠে পড়ে লেগেছে দেখছি।

—এটাই তো স্বাভাবিক। চোখের উপর ব্যবসা ডুবে যাচ্ছে, চুপচাপ হাত গুটিয়ে সে দৃশ্য ক'জন দেখতে পারে বলুন? যাবেন নাকি আজ সন্ধ্যায় ওখানে?

—গেলে আপনি খুশী হন?

দ্রুত গলায় বিজিত বললেন, ভাল ঝামেলায় পড়লাম। আমার খুশী হওয়াতে কি যায় আসে। নির্দোষ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইছিলাম ওখানে যাবেন কিনা।

—কোন ঠিক নেই। যেতেও পারি।

স্বর্ণকমল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

—বসুন—বসুন। চা আনাই।

আবার সে বসে পড়ল।

ব্যাটারি-চালিত ওয়াল-ক্লকের দিকে মলয় গাঙ্গুলী একবার তাকিয়ে নিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। ডার্লিং ডেনের বিশাল হল পরিপাটি ভাবে সাজানো হয়েছে। আজ চাপা আলোর ব্যবস্থা নয়, চাঁদনীর স্নিগ্ধতা বিরাজ করছে। সমাবেশ মন্দ হয়নি। আরো লোক আসছে। বিজ্ঞাপনে কাজ ভালই হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

শিবশংকরের ব্যস্ততার সীমা নেই। নানাদিক সামলাতে হচ্ছে তাঁকে। নতুন রিসেপসানিষ্ট মেয়েটি আবার ন্যাকা খুকী। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ এসে প্রশ্ন-ট্রশ্ন করলেই একেবারে গলে পড়ছে। তাকে সামাল দেওয়াও এখন একটা কাজ। এই সময় সঞ্জীব আর সুনীল ঢুকল ভেতরে। ডাইস ভালভাবে দেখা যায় এমন একটা টেবিল ওরা অধিকার করল।

সুনীল বলে উঠল, ওই দেখ, সেই লোক দুটোও এসেছে।

—কোন লোক দুটো ?

সঞ্জীব মুখ ঘোরাল।

—আমার সেই ঘোড়েল প্যাসেঞ্জার দুজন।

—তাই তো।

অদূরে বসে থাকা তাপস বা কালিদাসের দৃষ্টি অবশ্য ওদের দিকে নেই। দুজনের দৃষ্টি দু-দিকে। কালিদাস নতুন রিসেপসানিষ্ট মেয়েটিকে দেখছে আর রোমাঞ্চ বোধ করছে। তাপস তখন তাকিয়ে আছেন প্রধান দরজার দিকে। তিনি দেখছেন দাঁতে পাইপ চেপে বাসব ভিতরে ঢুকল। তার পিছনে শৈবাল।

—কালিদাস—

—ইয়েস, বস্ ?

—প্রাইভেট ডিটেকটিভও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে দেখছি।

কালিদাস ঘাড় ফিরিয়ে বলল, নাচ দেখার শখ হয়েছে বোধহয়।

—উঁহু। অন্য কোন ধান্দায় এসেছে।

—আসুকগে যাক, আমাদের কি ?

তাপস ভারি গলায় বললেন, মন্দ বলনি। আমাদের কি।

বাসব এবং শৈবাল ভেতরে আসবার মিনিট দুয়েক পরে অনুপ প্রবেশ করলেন। সঙ্গে অমূল্যবাবু। তাঁকে বিশেষ বিচলিত দেখা যাচ্ছে। এরকম পরিবেশে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম। দুজনে গিয়ে হলের এক প্রান্তের একটা টেবিল অধিকার করলেন।

অনুপ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কেমন লাগছে ?

—আমার ভয় করছে স্যার।

—আপনি অবাক করলেন। ভয়ের কি আছে ?

—আগে তো কথনও এরকম জায়গায় আসিনি। আমাকে হুইস্কি খেতে বলবেন না।

—বিয়ার আনতে বলি তাহলে। নেশা হবে না।

তারস্বরে অমূল্যবাবু বললেন, না—না—বিয়ার নয়, বরং কোকাকোলা—

অনুপ আর কিছু না বলে ইশারায় ওয়েটারকে ডাকলেন।

শিবশঙ্কর রিসেপসান কাউন্টারে ঠেসান দিয়ে তীক্ষ্ন চোখে চারিধার দেখছিলেন। আজ তাঁর মুখে প্রশান্তি বিরাজ করছে। অনেকদিন পরে হলের পশ্চাত্তর ভাগ চেয়ারেই খদ্দেররা এসে বসেছেন। ভয়ের ভাবটা সকলের কেটে গেছে মনে হচ্ছে। রিস্টওয়াচের দিকে শিবশঙ্কর তাকালেন, পোনে আটটা। আর আধ-ঘণ্টা পরে—ঠিক আটটা পনের মিনিটে লিলি আহুজা ডাইসে আসবে।

ঘড়ি থেকে মুখ তুলতেই একজনের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। হাত-কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। দীর্ঘকায় এবং বলিষ্ঠদেহী। মাথায় আজকালকার ফ্যাসানে চুল। লম্বা জুলফি। তিনি ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে এধার-ওধার তাকাচ্ছিলেন। শিবশঙ্কর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে।

—আসুন, আপনাকে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দি।

আগন্তুক বললেন, মিঃ গাঙ্গুলী আছেন ? তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে গিয়ে বলুন এনায়েত করিম এসেছেন।

শিবশঙ্কর বুঝলেন, যে দামী খদ্দের আসবার কথা ছিল ইনিই তিনি।

—আসুন।

মলয় পুরানো অফিস-ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশ ব্যবহারের জন্য ঘরখানা আবার খুলে দিয়েছে। শিবশংকর এনায়েতকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। কুশল বিনিময় হল। তারপর দুজনে গিয়ে ঢুকলেন অফিস-ঘরে। শিবশংকর আবার ফিরে এলেন আগেকার জায়গায়।

ঠিক এই সময় স্বর্ণকমল ভেতরে ঢুকল।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল রিসেপসান কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে।

তারপর শিবশংকরের সামনে থেমে বলল, আমাকে একটা ভাল টেবিলের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

—নিশ্চয়। আসুন।

—বেশি ভেতরে আমি কিন্তু যাব না।

—এধারেই দিচ্ছি। সাতাশ নম্বর টেবিল আপনার পছন্দ হবে।

শিবশংকর এগুলেন স্বর্ণকমলকে সঙ্গে নিয়ে।

মলয় গাঙ্গুলী অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে।

সঙ্গে এনায়েত নেই, একাই বেরিয়ে এসেছেন। মনে হয় তাকে বাথরুমের দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছেন। আজ যে ঘরে পাহারা দেবার জন্য কাউকে বসিয়ে রাখবেন, তেমন কোন ইচ্ছা ওঁর দেখা গেল না। কারণ পকেট থেকে তিনি ছোট একটা তালা বার করে কড়ায় লাগিয়ে চাবি মারলেন। তারপর ডিউক অব ডারহাম ধরিয়ে নিয়ে হাতের ইশারায় ডাকলেন শিবশংকরকে।

দ্রুত পায়ে শিবশঙ্কর চলে এলেন।

—আজ এত ভিড় হবে ভাবা যায়নি, কি বল ?

—ললি আহুজার আকর্ষণ আছে স্বীকার করতেই হবে স্যার।

মলয় রিস্টওয়াচের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, সময় হয়ে এসেছে। তুমি ললিকে গিয়ে তাড়া দাও। আমি ডাইসে যাচ্ছি।

শিবশংকর গ্রীন-রুমের দিকে চলে গেলেন।

নিকটবর্তী টেবিলের অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিয়ে মলয় এগুলেন। তিনি ডাইসে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হলের মধ্যেকার ভ্রমর গুন-গুনানি থেমে গেল। আলো কমে এল। ছায়া ছায়া ভাব গ্রাস করল চারিধার। স্পট লাইটের গোলাকার উজ্জ্বল আলো মলয়কে ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে।

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, মাননীয়া মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আজকের দিন আমার কাছে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি যে আবার কোন-দিন ডার্লিং ডেন'এর এমন উচ্ছ্বসিত রূপ দেখতে পাব কল্পনা করিনি। আপনারা জানেন মাত্র কয়েকদিন আগে এখানে এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছে। আমার সুন্দরী রিসেপসানিস্টকে কে খুন করেছে এখনও জানা না গেলেও, জোর তদন্ত চলেছে। হত্যাকারি ধরা পড়বেই। ওই ঘটনার পর আমি নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলাম। ডার্লিং ডেন খাঁ-খাঁ করছিল। আবার আপনারা এসেছেন। আমি আন্তরিক ভাবে খুশী। আপনাদের সমস্ত স্বাচ্ছন্দের দিকে আমাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকবে। আজ প্রখ্যাতা ললি আহুজা আপনাদের মুগ্ধ করার জন্য আসছেন। এবং আগামীকালও তিনি ডাইসে দেখা দেবেন। ধন্যবাদ।

মলয় সরে গেলেন।

হাল্কা পীতাভ আলোয় সমস্ত ডাইস ভরে গেল। হলে নেমে এসেছে সম্পূর্ণ অন্ধকার। চড়া সুরে ঐকতান আরম্ভ হল। বাজনার সঙ্গে পা মিলিয়ে এসে দাঁড়াল ললি। কালো ভেলভেটের এক বিচিত্র পোশাক তার গায়ে। ডাইসের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে সে ভেলভেটের আবরণ খুলে ফেলে দিল। হলের এধার-ওধার থেকে অনেকে আনন্দে শিস দিয়ে উঠল। ললি এখন প্রায় উলঙ্গ হবার সামিল। নিম্নাঙ্গ নাম-মাত্র কাপড় দিয়ে ঢাকা, সুগঠিত স্তনদ্বয় এক ফালি লেসের মধ্যে থির থির করছে। শরীরে আর কোন আবরণ নেই।

ক্যাবারে নর্তকী এবার ছন্দময় হয়ে উঠল।

উপস্থিত পুরুষরা দেখছেন আর উত্তেজনার চূড়ান্তের দিকে এগুচ্ছেন।

ওদিকে—

কার-অ্যাটেণ্ডেণ্ট হরিপদ এতক্ষণ উসখুস করছিল। ভেতরে নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মার্জার গতিতে কার-পার্কের পিছনে গিয়ে উপস্থিত হল। তাকাল এধার-ওধার। কেউ কোথাও নেই। সারিবন্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো শুধু হিমে ভিজছে। সেলফ-ড্রাইভ হওয়ার দরুণ কোন গাড়িতেই ড্রাইভার নেই।

হরিপদ বাথরুমের মেথর যাতায়াতের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খোলা থাকার কথা নয়, তবু খোলা রয়েছে। হরিপদ ভেতরে ঢুকল। বাথরুম অন্ধকার। বাথরুমের ওধারের দরজার পরই প্যাসেজ। প্যাসেজ শেষ হয়েছে অফিস-ঘরে গিয়ে। প্যাসেজও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। দেওয়াল হাতড়াতে থাকলে সুইচ পাওয়া যেত। কিন্তু হরিপদ আলো জ্বালবার চেষ্টা করল না।

টাউরি খেতে খেতে অন্যধারের দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। পা দিল এবার প্যাসেজে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অফিস-ঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ থাকার দরুণই প্যাসেজে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই হরিপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল কিছু।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই অফিস-ঘরের দিকের দরজাটা খুলে গেল। সামান্য আলোকিত হল প্যাসেজ। অফিস-ঘরে নিশ্চয় এখন কোন জোরালো আলো জ্বলছে না। অ্যাটাচি কেসের মত কি একটা হাতে নিয়ে একজন এগিয়ে আসছে। চেনা যাচ্ছে না তাকে। ছায়ায় গড়া মূর্তি বলে মনে হচ্ছে।

কয়েক পা এগিয়ে আসার পরই নবাগত থমকে দাঁড়াল।

অন্যজনের উপস্থিতি সে বুঝতে পেরেছে।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে অফিস-ঘরের দিকে আবার পা বাড়াবার আগেই হরিপদ বলে উঠল, দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—কে তুমি ?

—আমি হরিপদ শীল। জানাজানির হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তবে মাল ছাড়ুন। আপনার হাতে সময় কম আমি জানি।

নবাগত এগিয়ে এল।

দাঁড়াল হরিপদর মুখোমুখি।

আমার সঙ্গে এস। পাঁচ হাজার টাকা দেব।

—পাঁচ হাজারে হবে না। ব্যাগটা আমায় দিন। আগের বারেরটা আপনি নিয়েছেন এবারেরটা আমি নেব।

পরমুহূর্তে হরিপদ অনুভব করল তার মাথায় শক্ত কিছু একটা এসে

পড়েছে। আঘাত তেমন প্রচণ্ড না হলেও সে পড়ে যাচ্ছিল—কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু ততক্ষণে একজোড়া হাত তার গলার উপর এসে পড়েছে। কঠিন পেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার আগেই হরিপদ চিৎকার করে উঠল।

ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে কয়েকজন লোক প্যাসেজে ঢুকে পড়েছে।

খান তিনেক টর্চ ঝলসে উঠল।

অনুচ্চ গলায় বাসব বলল, শিবশঙ্করবাবু, আরেকটা খুন করার দায়িত্ব নেবেন না। হরিপদকে ছেড়ে দিন।

নিজের বিমূঢ় ভাব এক লহমার মধ্যে কাটিয়ে উঠলেন 'ডার্লিং ডেন'-এর অতি সুখ্যাত বিনয়ী ম্যানেজার শিবশংকর চক্রবর্তী। হরিপদকে ছেড়ে দিয়েই তিনি বিদ্যুৎবেগে অফিস-ঘরের দিকে ধাবিত হলেন। উদ্দেশ্য হল গ্রীনরুমে যাবার দরজাটা দিয়ে অদৃশ্য হবেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল না। ততক্ষণে বিজিত মুখার্জী অফিস-ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়েছেন।

প্যাসেজের আলো জ্বলে উঠেছে এবার।

অবিরাম ঘামছেন শিবশংকর। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করেছে। তিনি মেঝের উপর বসে পড়লেন।

মলয় গাঙ্গুলী সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর অনুগত অনুচরের দিকে। শুধু তিনি নন, শিবশংকরকে দেখছেন আর অবাক হচ্ছেন তাপস লাহা, অনুপ ভটচায, সঞ্জীব, স্বর্ণকমল, সুনীল এবং কালিদাস।

বাসব বলল, পরে পুলিশের কিছু জাঁদরেল সাক্ষীর প্রয়োজন পড়বে। তাই আপনাদের ডেকে এনে এই নাটকীয় দৃশ্য আমি দেখালাম। ওই অ্যাটাচি কেসের মধ্যে বহু টাকা আছে, যা উনি মিঃ গাঙ্গুলীর দেরাজ থেকে হাতিয়েছেন। এর আগের বারে এইভাবে আটচল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়বার সময় মণিকা চৌধুরীর উপস্থিতি গোলমাল বাধাল। তখন তাকে খুন না করে উপায় ছিল না। যা হোক, মিঃ মুখার্জী, এবার আপনি নিজের কাজে নেমে পড়ুন।

বিজিত মুখার্জী এগিয়ে এলেন।

বাকিরা দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক ভাবে।

রাত তখন দশটা।

বাসব সোফায় গা এলিয়ে দিয়েই গলা ছাড়ল, বাহাদুর—

বাহাদুরের নিরেট চেহারার দেখা পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

—দু-কাপ কফি নিয়ে এস তাড়াতাড়ি ক্রীমট্রীম থাকলে দু-চার চামচ দিতে পার।

শৈবাল বসতে বসতে বলল, এই অসময়ে কফি খাবে?

—সময়ের হিসাব আর কত রাখব ডাক্তার? ডিনারের পর পাইপিং-হট

হল রেওয়াজ। আমরা না হয় আগেই খেলাম। ও প্রসঙ্গ থাক। শেষ পর্যন্ত কি রকম বুঝলে ?

ওরা সবেমাত্র ডার্লিংডেন থেকে ফিরেছে। শিবশংকর সেই যে চুপ করে গিয়েছিলেন, আর তাঁকে একটি শব্দও করতে দেখা যায়নি। শান্ত ভাবেই পুলিশ-ভ্যানে গিয়ে চেপেছেন। স্বর্ণকমল বাসবকে বলেছে, আগামীকাল সকালে দেখা করবে। অর্থাৎ সম্মান দক্ষিণা দিয়া আসবে গিয়ে তারই ইঙ্গিত। বাকিরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ে খাবি খেতে থেকেছেন।

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, তুমি আরেকবার আমাকে চমৎকৃত করেছ। বুদ্ধি বস্তুটা যে তোমার একচেটে সম্পত্তি তা যেন আরেকবার—

ওকে বাধা দিয়ে বাসব বলল, না, ডাক্তার। তোমার এই বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা আমি মানতে রাজি নই। চোখ কান খোলা রাখলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে কোন জটিল পরিস্থিতি সরল করে আনতে পারে। এই কেসটার কথাই ধর না। প্রথম নজরে বেশ ঘোরাল মনে হবে। আমারও মনে হয়েছিল। তখন আমার প্রথম কাজ হল ফাঁক খুঁজে বার করা। দুটো ব্যাপার আমাকে স্থির নিশ্চিত করে তুলল। এক, যে তিনজন অফিস-ঘরে ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে কেউ খুন করেনি। কারণ এরকম রিস্ক নেওয়া পাগলামি। কারণ মণিকাকে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থেকে অন্যত্র খুন করার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যেত। দুই, কোন মোটিভের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ মণিকা খুন হয়ে গেল ! এতে প্রমাণ হচ্ছে, আসল উদ্দেশ্য খুন নয়, এটা ঘটনাচক্রে পড়ে করা হয়েছে। উদ্দেশ্য আরো গভীরে থিতিয়ে রয়েছে।

বাসব পাইপ ধরাল।

কয়েক টান দেবার পর বলল, এখন প্রশ্ন উঠবে উদ্দেশ্যটা কি ? এসম্পর্কে অবশ্য আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। মলয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অফিস-ঘরের সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের দেরাজে আটচল্লিশ হাজার টাকা ছিল। বলতে গেলে, ওই টাকা পাহারা দেবার জন্যই তিনি মণিকাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছিলেন। এবং মণিকা যে অফিস-ঘরে আছে একথা আর কেউ জানত না। বুঝলাম, ওই আটচল্লিশ হাজার টাকাই হল মোটিভ। এরপর এক বিশেষ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল, হত্যাকারি কোন পথ দিয়ে অফিস-ঘরে ঢুকেছিল ? সকলে জোর দিয়ে বলেছেন, তাপস, অনুপ আর সঞ্জীব ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তিকে কেউ সামনের দরজা দিয়ে অফিস-ঘরে ঢুকতে দেখেননি। মলয় গাঙ্গুলী বলেছেন, সোনার বিস্কুট ক্রেতা বিদায় নেবার পর বাথরুমের দরজা ভেতর দিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে—

অফিস-ঘর ভাল করে দেখার পর ওই সমস্যারও সমাধান হল। দেখলাম তৃতীয় একটা দরজা আছে। ওই দরজা দিয়ে গ্রীনরুমে যাওয়া যায়। বিশেষ

প্রয়োজন ছাড়া ওই পথ ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য অফিস-ঘরের দিক থেকেই ছিটকিনি বন্ধ করা ছিল। তবু আমি নিশ্চিত হলাম, এই পথ দিয়েই হত্যাকারি ঘরে ঢুকেছে। জানি তুমি বিস্ময় প্রকাশ করবে। বলবে, ছিটকিনি যখন এধার দিয়ে বন্ধ ছিল তখন হত্যাকারি গ্রীন-রুমের দিক থেকে দরজা খুলল ...বে? সঙ্গত প্রশ্ন। এবার ওই কথাতেই আসছি। যে মুহূর্তে মোটিভ ...পেরেছি, বলতে গেলে কেস সলভ হয়ে গেছে তখনই।

...দুর দু-কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

...পাঁচেক আর দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না।

...ষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

...শেষ চুমুক দেবার পর শৈবাল বলল, তারপর কি হল?

...াহুল্য মলয় গাঙ্গুলীকে আমি সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ ...ারণ তাঁর বেশ বড় অঙ্কের টাকা চুরি গেছে। তিনি নিজের ...ক খুন করে যেচে সন্দেহভাজন হবেন না। সব চেয়ে বড় কথা ... বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাল ভাবেই জানেন, বার'এর মধ্যে রি... করলে তাঁর চালু ব্যবসা দারুণ ভাবে হোঁচট খাবে। তাহলে ... াম কাকে কাকে—মলয়, সঞ্জীব, তাপস এবং অনুপ। স্বাভাবি... এবং কালিদাসও বাদ পড়ে গেল। এবার স্বর্ণকমলের কথায় এ... ...ণের দরুণ তাকেও সন্দেহ করা গেল না। এক, সে মণিকাকে ... প্রমিকাকে অমন প্রকাশ্য জায়গায় নাটকীয় ভাবে খুন করতে ...। দুই, জেরার উত্তরে এমন কথা কেউ বলেনি যে সে আটটা ... আটটা চল্লিশের মধ্যে এক মিনিটের জন্যও নিজের জায়গা ছেড়ে কোথাও গিয়েছিল। এরপরও কথা আছে। হত্যাকারি গাঁটের কড়ি খরচ করে নিজের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নিযুক্ত করবে, এ বড় কষ্ট কল্পনা করা। কাজেই স্বর্ণকমলকেও হিসাবের বাইরে রাখতে হল।

এবার বাঁচল মাত্র একজন। শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। স্থির নিশ্চিত হতে আর আমার সময় লাগল না। শিবশংকর মলয় গাঙ্গুলীর ডান হাত। তার পক্ষেই একমাত্র জানা সম্ভব, সোনার বিস্কুটের খদ্দের কখন মোটা টাকা দিয়ে যাবে। তারপর টাকাটা থাকবে কোথায়। এবং তার পক্ষেই সম্ভব বিকেলের দিকে কোন এক সময় অফিস-ঘরে ঢুকে গ্রীনরুমের দিকের দরজার ছিটকিনিটা খুলে রাখা। যাতে পরে ওধার দিয়ে এঘরে ঢুকতে সুবিধা হয়। ছিটকিনিটা যে খোলা আছে এটা মলয়ের চোখে না পড়ার প্রধান কারণ হল, দরজার পর্দা ছিটকিনি আড়াল করে রেখেছিল। ভরসা করি ডাক্তার, এবার তোমার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, পরের ব্যাপারগুলো এবার নিশ্চয় তুমি সরল করবে?

—অবশ্য। শিবশংকরের উপর সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হবার পরও একটা সমস্যার সমাধান হল না। খুন ঠিক কটার সময় হয়েছে? অর্থাৎ হত্যাকারি ঠিক কোন্ সময় অফিস-ঘরে ঢুকেছিল। শিবশংকরের অ্যালিবাই গ্রানাইট পাথরের মতই নিরেট। সে আটটা আন্দাজ সময় মলয়ের নির্দেশে ললি আহুজাকে তাড়া দিতে গ্রীন-রুমে গিয়েছিল। সেখানে মিনিট দশেক লেগেছিল ললির নানা বায়নাক্কা শুনতে। তারপর থেকেই তাকে দেখা গেছে হলে সকলের মাঝে! হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমাকে সচেতন করে তুলল, সত্যি কি সে দশ মিনিট ললির সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল?

দেখা করলাম ললির সঙ্গে। কথায় কথায় জানতে পারলাম, সেদিন ললি মেকআপ নিয়ে তৈরি হয়েই বসেছিল। শিবশংকর এসে বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে ডাইসের উদ্দেশে যাত্রা করে। মলয় তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বক্তৃতা শেষ হবার পরই সে নাচ আরম্ভ করে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছ ডাক্তার, সমস্ত কিছু কেমন সহজ হয়ে গেল। শিবশংকর নিজের স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী মোটেই দশ মিনিট ধরে ললির সঙ্গে কথা বলেনি। ললি ডাইসের দিকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনরুমের দরজা দিয়ে অফিস-ঘরে ঢোকে। এবং টাকা হাতাবার সময় ধরা পড়ে যাওয়ায়, বাধ্য হয়ে মণিকাকে খুন করে, প্যাসেজের মুখের পর্দা দিয়ে নোটগুলো মুড়ে বাথরুম দিয়ে বেরিয়ে যায়। অবশ্য ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আগে গ্রীনরুমের দরজার ছিটকিনি এধার দিয়ে লাগিয়ে আসে। তখন সে দারুণ নার্ভাস ছিল। মলয় গাঙ্গুলীর গাড়ির কেরিয়ারে টাকা রাখতে গিয়ে ভুল করে সুনীলের গাড়ির কেরিয়ারে টাকা রেখে সামনের দরজা দিয়ে হলে ফিরে এল। সে সময় সকলের দৃষ্টি নাচের উপর থাকায়, তার ফিরে আসা কেউ লক্ষ্য করল না।

শৈবাল বলল, টাকাটা সে মলয় গাঙ্গুলীর গাড়ির কেরিয়ারে রেখেছিল কেন?

—লুকিয়ে রাখার ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি ছিল বল? অকারণে কেরিয়ার খুলে সে রাত্রে কেউ দেখত না। পরে টাকাটা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রচুর সুযোগ ছিল। কিছুক্ষণ পরে বোধহয় শিবশংকরের খেয়াল হয়, দারুণ ভুল করে ফেলেছে। অবশ্য তখন আর কার-পার্কে গিয়ে টাকাটা যথাস্থানে চালান করে দেবার সুযোগ ছিল না। পুলিশ এসে গেছে। জেরা টেরা আরম্ভ করে দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পুলিশ যখন তদন্তে ব্যস্ত —সঞ্জীব আর সুনীল বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। শিবশংকর সজাগ ছিল। সে মরিয়া অবস্থায় মলয়ের গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করল ওদের। কারণ টাকাটা কোথায় চলেছে তার ঠিকানা জানা দরকার।

—ঠিকানাটা জেনে আসবার পর, গ্যারাজের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে টাকাটা সে ওখান থেকে বার করে এনেছিল—এই তো?

—একজ্যাক্টলি ডাক্তার। কথাটা তোমাকে আগেই বলেছিলাম। দারোয়ান যদিও স্বীকার করেনি, তবু আমি বলব শিবশংকর অত্যন্ত কাঁচা কাজ করেছিল। হঠাৎ অপরাধীরা এই ধরনের ভুল করে থাকে। যাহোক, এবার আবার পুরানো কথায় ফিরে যাব। টাকাটা ছিল অফিস-ঘরের সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের দেরাজে। বিশেষ ধরনের গা-তালা লাগানো ছিল। যে কোন চাবি দিয়ে দেরাজ খোলা সম্ভব নয়। চাবি ছিল মলয়ের পকেটে। তবে—? এরপরই একটা কথা আমাকে কিছুটা চাঙ্গা করে তুলল। শুনলাম, একই চাবি দিয়ে সব দেরাজগুলো খোলা যায়। টেবিল পরীক্ষা করে দেখলাম, একটা খালি দেরাজের গা-তালা লাগানো নেই। খোলা অবস্থায় রাখা রয়েছে। ব্যাপার কি? জিজ্ঞেসবাদ করে জানলাম, ওই গা-তালাটা খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুণ কোম্পানিতে পাঠানো হয়েছিল। ঠিক হয়ে ফিরে এলেও, লাগানো হয়ে ওঠেনি। টেবিল সরবরাহকারী কোম্পানীতে গিয়েছিলাম। ওঁরা অবশ্য দরকারে লাগে এমন কিছু বলতে পারলেন না। তবে একটা জিনিস জানতে পারলাম, গা-তালা ঠিক হয়ে যাবার পর শিবশংকর ওটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুই আর তিনে সাত হয় না, পাঁচই হয়—একথা আমি ভালই জানি। কাজেই আমার অনুমান নিতে অসুবিধা হল না। গা-তালাটা ফিরিয়ে আনার সময় কোন দুঁদে চাবিওয়ালার কাছ থেকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে আনা হয়েছিল। শিবশংকর সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হবার পর আমি একান্তে মলয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করলাম। হত্যাকারির নাম না বলেই আমি তাঁর সঙ্গে অনেক কথা চালালাম। তিনি সাহায্য করতে রাজি হলেন। এনায়েত বিস্কুটের ক্রেতা সেজে তাঁর কাছে অমুক দিন, অমুক সময় আসবে জানিয়ে রাখলাম। দেরাজে যেন কয়েক হাজার টাকা থাকে সে-কথা বলতেও ভুললাম না। যথা নিয়মে এনায়েতকে বাথরুমের দরজা দিয়ে বার করে দিতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই শিবশংকর যথা সময়ে জানতে পারল একজন ওজনদার ক্রেতা আসছে। খুশী হল মনে মনে। হরিপদকে ইতিমধ্যে তালিম দিয়ে রেখেছিলাম। তারপর কি ঘটেছে তোমরা সকলে নিজের চোখে দেখেছ।

—শিবশংকর যদি তোমার টোপ না গিলত?

—সে সম্ভাবনা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। টোপ না গিললে তার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আনতে অসুবিধা হত। তবে সে একেবারে রেহাই পেত না। চুরি যাওয়া আটচল্লিশ হাজার টাকা আজ বিকেলে শিবশংকরের বাড়ি সার্চ করে পুলিশ বার করেছে। সে তখন ডিউটি দিতে বার'এ চলে এসেছে। টাকাটা অন্যত্র সরিয়ে রাখলে অসুবিধা হত। আগেই বলেছি, অনেক কাঁচা কাজ করেছে সে।

—অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের অসম্ভব বুদ্ধিমান মনে করে। এই মনোভাব যে সময় সময় পতনের কারণ হয়ে ওঠে তাতো আমরা বহুবার

দেখেছি। যাক, ওকথা! এখনও কিন্তু দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি।

—কি বলতো ?

—অনুপ ভটচায বললেন না, হরিপদ কার সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল। সে লোকটা কে ? আর, পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে ?

—হরিপদর সঙ্গে ও প্রসঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ও ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। লোকটা হরিপদর গ্রামতুতো ভাই। মাস আটেক আগে পনের টাকা ধার নিয়েছিল। তাই নিয়েই কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, পুলিশকে ফোন করেছিল তাপস লাহার নির্দেশে কালিদাস। লাহার মুখ থেকেই কিছুক্ষণ আগে কথাটা শুনলাম।

বাসব আড়মোড়া ভাঙল।

শৈবালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সেণ্টার টপের দিকে হাত বাড়াল।

পাইপ আর পাউচ রাখা রয়েছে ওখানে।

তূণের বাইরে তীর

অন্ধকার যেন অতি দ্রুত নেমে এল।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল প্রলয়। ও লক্ষ্য করেছে শীত ঋতুতে বিকেলের আয়ু বলে এখানে কিছু নেই। বেলা চারটের পরই অন্ধকার গ্রাস করে ফেলে চারিধার। অবশ্য এ অঞ্চলের সমস্ত ইতিকথা জানা নেই প্রলয়ের।

মাসখানেক হল ও এখানে এসেছে। ঠিক বলা হল না বোধহয়, এখনো দু'দিন বাকি আছে এক মাস হতে। প্রলয় কলকাতার ছেলে। যতদিন লেখাপড়া করেছে, কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে নেবার পরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

চাকরি চাই।

চাইলেই যে চাকরি পাওয়া যায় না, এ তো জানা কথা। প্রলয়ও জানতো। খুঁটির জোর থাকলে অবশ্য কথা ছিল। কাল না হয় পরশু নিশ্চিতভাবে একটা কাজ জুটে যাবে। কত অচল পয়সা তো খুঁটির জোরেই সচল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রলয় সেরকম খুঁটি পাচ্ছে কোথায় ?

বাবা বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন বছর পাঁচেক আগেই। দুই কাকা রেলে কাজ করেন। তাঁদের অফিসার বলা যায় না। মামারা দেওঘরে থাকেন। জমিজমা আছে, কাজেই সরকারি বা বেসরকারি কোন দপ্তরের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। এই তো হল প্রলয়ের আত্মীয়বর্গের মধ্যে। অবশ্য এতে নিরাশ হল না।

উঠে-পড়ে লাগল চাকরির জন্যে। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। কোথায় কি ? চাকরি পাওয়া তো দূরের কথা, ইণ্টারভিউ-এর আহ্বান পর্যন্ত এল না কোথাও থেকে। এবার নিরাশা মনের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগল ধীরে ধীরে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর কোন পরিকল্পনা খাড়া করতে সাহস হয় না। বড়মামা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সংবাদ পাবার পরই মা ভীষণ উতলা হয়ে পড়লেন। কাজেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রলয় মাতুলালয়ে পৌঁছল। হাই-প্রেসারের দরুণ কাহিল হয়ে পড়েছিলেন বড়মামা। কয়েকদিনের মধ্যেই মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

অনেক দিন পরে প্রলয় এখানে এসেছে। তাকে কেউ ছাড়তে চাইলেন না। কাজকর্ম যখন কিছু করছে না, তখন মাসখানেক এখানে থেকে গেলে ক্ষতি কি ?

প্রলয় আপত্তি করল না। অন্তত চাকরি না পাওয়ার শোকটা কিছুদিন ভুলে থাকতে পারবে। মেজমামার ছেলে রবীন তারই বয়সী। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘুরে বেরিয়ে সময়ও মন্দ কাটছে না।

সেদিন খবরের কাগজ আসতে দেরি হচ্ছিল।

প্রলয়কে উসখুস করতে দেখে রবীন বলল, ট্রেন লেট হলেই কলকাতার পেপার আসতে দেরি হয়। তাও একদিনের বাসি। তুমি লোকাল নিউজ পেপারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে পারতে—

মৃদু হেসে প্রলয় বলল, এখানে তো সব দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদপত্র। খবর বলে তাতে কিছু থাকে নাকি আবার !

খবর না থাক, মাঝে মাঝে লোভনীয় কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকে।

তাই নাকি ?

আজকের কাগজেই বিহার সিভিল সার্ভিসের বিজ্ঞাপন রয়েছে।

হতাশ ভঙ্গিতে প্রলয় বলল, বেল পাকলে কাকের কি ? আমি কলকাতার ছেলে। অ্যাপ্লাই করলেও আমাকে ডাকবে কেন ?

মুখে একটা শব্দ করে রবীন বলল, সোজা পথ দিয়ে হাঁটলে আজকাল চাকরি পাওয়া যায় না। ভাগ্নেরা কি মামার বাড়িতে মানুষ হতে পারে না ? এমন দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই ?

তা থাকবে না কেন ! তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি কলকাতায় লেখাপড়া করেছি কেন ?

বিহারের হাজার হাজার ছেলে কলকাতায় লেখাপড়া করেছে—এখনো করে চলেছে। ওটা কোন ফ্যাক্টরই নয়। তুমি এই প্রদেশের লোক প্রমাণ করা শক্ত হবে না। জ্যাঠামশাই তোমাকে ডোমিশাইল সার্টিফিকেট খুব সহজেই জোগাড় করে দিতে পারবেন।

তাহলে বলছ—

আমাদের ঠিকানা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দাও। কয়েক মাস পড়ার সময় পাচ্ছ। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।

প্রলয় সত্যি সত্যিই একদিন আবেদন পত্র পাঠাল পাটনায়।

তারপর—

রবীনের বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত বাস্তব রূপ নিল।

আনুষঙ্গিক সমস্ত বেড়া টপকে যথা সময়ে বি. ডি. ও. হিসাবে ও পোস্টেড হল সেমাপুরে। মুঙ্গের শহর থেকে মাইল পনের দূরের এই অঞ্চলটি সুন্দর প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে। জায়গাটি বেশ ভাল লাগল প্রলয়ের। মানুষ ক্রমেই যেন নগর-সভ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে।

আজ কাজের চাপ ছিল না একেবারেই। দুটোর সময় চলে এসেছে অফিস থেকে, সেই তো এখানকার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। কোয়ার্টারে ফিরেই বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছিল। এলোমেলো চিন্তায় আর পত্রিকার পাতা উল্টে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হেলে-পড়া সূর্যের আভা বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের শাখাটিকে রক্তাভ করে রেখেছিল,

ক্রমে তাও মিলিয়ে গেল। প্রলয় কিন্তু অজানা কারণে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জানলার ধারে। হঠাৎ মৃদু শব্দে ওর চটকা ভাঙল। পেছন ফিরে দেখল, চাপরাশি এসে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু বলবে ?

ঠাকুরসাহাব এসেছেন।

ঠাকুরসাহাব !!!

এই অঞ্চলের এক বিখ্যাত পুরুষ। এখানে পা দেবার পর থেকে এই মানুষটি সম্পর্কে প্রলয় এত কথা শুনেছে যে তার আর কোন হিসাব নেই। বিশ্বাস করা যায় না, এমন বহু কাহিনীর দুরন্ত নায়ক মীর্জা হাবেলির ঠাকুরসাহাব। কিন্তু তিনি এখানে কেন ? কি প্রয়োজন থাকতে পারে তাঁর প্রলয়ের সংগে ?

তাঁকে বসিয়েছ তো ?

বসিয়েছি সাব।

প্রলয় বাইরের ঘরে এল।

গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় ঠাকুরসাহাব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রগের দু'পাশের চুল ধূসর হয়ে এলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর বয়স এখনো পঞ্চাশ অতিক্রম করেনি। ধারালো মুখের ওপর গভীর আভিজাত্যের ছায়া। পরণে একই রঙের ট্রাউজার আর প্রিন্সকোট। এই পোশাকে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

নমস্কার। আমি মীর্জা হাবেলির ঠাকুরসাহাব। আমাকে এ অঞ্চলের সকলে ভালভাবেই চেনে।

তাঁর কণ্ঠস্বর একটু উঁচু স্বরে বাঁধা।

প্রলয় নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। আলাপ করার তো সুযোগ ছিল না···কি আশ্চর্য, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? বসুন, ওই চেয়ারটায় বসুন।

বসতে বসতে ঠাকুরসাহাব বললেন, আমার কথা শুনেছেন আগে ? আজেবাজে কথাই শুনে থাকবেন। আসল কথা কি জানেন ? এখানকার অধিকাংশ লোক আমাকে ভয় পায়। ভয় পায় বলেই কুৎসা রটনা করে।

না, সেরকম কোন কথা আমি শুনিনি। সাড়ে চারটের ট্রেনে সদর থেকে ফিরেছেন বোধহয় ?

মুঙ্গেরে বড় একটা যাই না। হাবেলি থেকে আসছি। আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু শোনেননি বলছেন ? ভাল। এবার তাহলে কাজের কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

কাজের কথা ! কোন কাজে এসেছেন নাকি ? কিন্তু—

ঠাকুরসাহাব হাসলেন।

প্রয়োজন না থাকলে আমি বড় একটা কোথাও যাই না। আপনার আগে যিনি ছিলেন—রামাবতার সিনহার কথা বলছি, আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

ছিল। যে কোন কাজে এলেই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা করে দিতেন। তার বিনিময়ে আমিও কিছু…

বিচিত্র হাসিতে মুখ ভাসিয়ে কথাটা আর শেষ করলেন না ঠাকুরসাহাব। তাতার

আমি কিন্তু…

কিন্তুর পিছুটান রাখলে আজকের দুনিয়ায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায় না সোমবাবু। প্রথম প্রথম একটু বাধো বাধো ঠেকে, পরে চমৎকার ভাবে সমস্ত সয়ে যাবে দেখবেন।

এই বিচিত্র মানুষটির কথাবার্তা ক্রমেই প্রলয়কে উতলা করে তুলছিল। টাকা খাইয়ে তিনি নিজের স্বার্থের অনুকূলে যে কোন কাজ করিয়ে নিয়ে থাকেন, এই কথাই উনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

আপনার কি কাজ আছে বলুন? আমার অধিকারের মধ্যে থাকলে করে দিতে অসুবিধা হবে না।

পকেট থেকে সুদৃশ্য সোনার সিগারেট কেস বার করে, বিশেষ জায়গায় চাপ দিয়ে ডালাটা খুলে ফেললেন ঠাকুরসাহাব। তারপর এগিয়ে ধরলেন প্রলয়ের দিকে। দামি সিগারেট একের পর এক সাজানো রয়েছে।

অভ্যাস আছে নিশ্চয়?

অনিচ্ছার সঙ্গেও একটা সিগারেট তুলে নিল প্রলয়।

কি বলছিলেন, কাজটা আপনার অধিকারের মধ্যে আছে কিনা? তা না থাকলে কি আর এই সময় আমায় এখানে দেখতে পেতেন?

বলুন এবার—

ঠাকুরসাহাব সিগারেট ধরিয়েছেন। ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে বললেন, ভামরাউলির বাঁধটা নিয়ে নাকি আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন?

এনকোয়ারি করে দেখার নির্দেশ পেয়েছি।

আপনাকে রিপোর্ট দিতে হবে, বাঁধ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। ভেঙে ফেললে হাজার হাজার একর জমি জল পাবে না।

একথা ঠিক নয় ঠাকুরসাহাব। বাঁধ ভেঙে না ফেললেই হাজার হাজার একর জমির ক্ষতি। আপনারা বাঁধ বেঁধে সমস্ত জল আটকে নিয়ে নিজেদের কাজেই লাগাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ অনেক দিন থেকেই এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছিল আপনি জানেন। সরকার এতদিন পরে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার আদেশ দিয়েছেন।

সরকারের কথা ছাড়ুন সোমবাবু। কথাটা হচ্ছে, আপনার ও আমার মধ্যে। বাঁধকে আরো কিছুদিন ওখানে খাড়া রাখতে আপনিই পারেন।

কিভাবে?

রিপোর্ট লিখবেন, সেচের কথা বিবেচনা করলে বাঁধ ঠিক জাগাতেই আছে। সাধারণ মানুষের চেয়ে বি. ডি. ও-কেই বেশি বিশ্বাস করবে সরকার।

ক্রমে · হয় না ঠাকুরসাহাব।

জানি হয় না ?

এ কাজ আমি করতে পারব না।

ইংরাজ সরকার থাকলে আমি আপনার কাছে আসতাম না সোমবাবু। নিজেদের ক্ষমতার জোরেই ব্যাপারটাকে সামলে নেওয়া যেত। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। যারা পায়ের তলায় থাকত, তারা এখন মাথার ওপর নাচছে। তাই বাঁকা পথ ধরে এগুনো ছাড়া উপায় নেই।

আমি নিরুপায়।

বেশি দিন নয়, এক বছরের মত ব্যাপারটাকে আটকে রাখতে পারলেই আমি পাটনার কর্তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব।

প্রলয় একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল, তা হয় না। আমাকে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতেই হবে।

বাঁধ ভাঙার অনুকূলে রায় দেবেন ?

বাঁধ থাকলে আপনার একার লাভ হচ্ছে। না থাকলে, কয়েক হাজার মানুষ বেঁচে থাকার অবলম্বন পাবে।

বাঙালী মাত্রই কি কমিউনিস্ট হয় ?

এ কমিউনিজমের কথা নয় ঠাকুরসাহাব। বাস্তবের কথা। আর সেই বাস্তবকে কার্যকরি করার দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে।

নিশ্চয় থাকবে। তবে হেরফের তো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়।

আমি আপনাকে প্রথম থেকে সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, এক্ষেত্রে কোন হেরফের হবার সম্ভাবনাই নেই।

নিজের হিতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় সোমবাবু।

ও সমস্ত কথা থাক ঠাকুরসাহাব। আপনাকে বরং চা দিতে বলি।

প্রলয় বেয়ারাকে ডাকবার আগেই মীর্জা হাবেলির ঠাকুরসাহাব উঠে দাঁড়ালেন। প্রিন্সকোটের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে একতাড়া নোট বার করে আনলেন। তার মধ্যে একশ' এবং দশ টাকার নোট দুই-ই আছে। সামনের টেবিলে তাড়াটা রাখলেন তিনি।

মৃদু হেসে বললেন, নিরামিষ পানীয়তে আমার রুচি নেই। তবে আপনার এখানে চা আমি খাব। আজ নয় অবশ্য, আরেকদিন। টাকাগুলো রইল। জীবনটাকে যদি রঙিন করে তুলতে চান, তবে এর সহযোগিতা অস্বীকার করতে যাবেন না কখনও। এখন চলি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চরম অস্বস্তি বোধ নিয়ে নোটগুলির দিকে তাকিয়ে রইল প্রলয়। লোকটির সাহস আছে সন্দেহ নেই। তবে এই সাহস তিনি একদিনে সঞ্চয় করেননি। অর্থের বিনিময়ে যে কোন সুবিধা লাভ করা যায়, এই প্রবণতা তাঁর মনে

প্রসারিত হয়েছে কিছু সুবিধাবাদী লোকের দৌলতেই। তারপরই তিনি প্রচণ্ড সাহসী হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু প্রলয় এখন কি করবে?

এরকম বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ও আর কখনও পড়েনি।

কয়েক মিনিট চিন্তা-ভাবনার পর ও স্থির করে ফেলল, ওই বেআইনী কাজ যখন কোন মতেই করতে পারবে না, তখন এই নোটের তাড়া নিজের কাছে রাখা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আগামীকাল এগুলি ফিরিয়ে দিয়ে আসবে ঠাকুরসাহাবকে। প্রয়োজন বোধে শুনিয়ে আসবে দু-চার কথা।

অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। টেবিলের ওপর থেকে টাকাগুলো সরিয়ে নিল প্রলয়। বাক্সর মধ্যে রেখে দিয়ে আবার এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। শোবার ঘরের মত এ ঘরের জানলাও পাহাড়মুখী। মন ভীষণ খিঁচড়ে গেছে! এরকম উটকো ঝামেলা যে আগত সন্ধ্যাকে বিশ্রী করে তুলবে ভাবতেই পারেনি।

মিনিট দশেক কেটে গেল চুপচাপ।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে প্রলয় সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়েছে, ক্ষীণকায় এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে হবে। খাড়া নাকটিই মুখের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। মাজা মাজা রং। গায়ে বড় গোল ধরনের বোতাম লাগানো কালচে বেগনে রঙের কোট। এই ধরনের কোট রেলের কর্মচারিরাই ব্যবহার করে থাকে।

আসুন মাস্টারমশাই।

চেয়ারে বসতে বসতে সেমাপুরের স্টেশন মাস্টার শ্রীকান্ত দত্ত বললেন, সাহেবগঞ্জ লোকাল আজ আধ ঘণ্টা লেটে পাশ করল। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আর তো কোন গাড়ি নেই। ভাবলাম, আপনি কি করছেন দেখে আসি।

ভালই করেছেন এসে। লোকাল প্রায়ই লেট থাকে, না?

রাইট টাইমের ধার ধারে না গাড়িটা। এত বেশি চেনপুল হলে এরকম হবেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি যে। বাড়ির দোরে দোরে যদি ট্রেন থামাতে না পারলাম, তাহলে আর হল কি!

কথাটা শেষ করেই শ্রীকান্ত দত্ত হাসলেন।

সেমাপুর ছোট স্টেশন। কোন বড় ট্রেন এখানে থামে না। আপ-ডাউনের গুটি কয়েক প্যাসেঞ্জার নিয়েই কারবার। অবশ্য বহু গুডস ট্রেনের স্টপেজ আছে এখানে। সেমাপুর পাথরের জন্য বিখ্যাত। রাস্তা ও ব্রীজ তৈরির জন্য এখান থেকে পাথর চালান যায় প্রচুর। শ্রীকান্ত দত্ত ছাড়া স্টেশনে আছেন দুজন গুডস ক্লার্ক, কেবিনম্যান, বুকিং ক্লার্ক, গ্যাংম্যান ইত্যাদি।

এখানে পা দেবার পরই দত্তর সঙ্গে আলাপ হয় প্রলয়ের। বিদেশে বাঙালি —দুজনের বয়সের পার্থক্য থাকলেও ঘনিষ্ঠতা হতে বিশেষ সময় নেয়নি। তিনি

আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন ওর। তাঁরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। গল্পগুজব বা তাস খেলা হয়। শহরের প্রাণবন্ত জীবনের বাইরে সময় কাটাবার এই তো মাধ্যম।

প্রলয় বলল, একটা সিগারেট ধরান মাস্টারমশাই।

সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলের ওপরই পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে শ্রীকান্ত বললেন, আপনাকে আজ যেন কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ।

শরীর ঠিক আছে তো?

শরীরে কোন গোলমাল নেই। তবে—

বাড়ি থেকে বিয়ে করার জন্য তাড়া এসেছে নাকি? ও নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা করবেন না। করে ফেলুন। এমন মিষ্টি ব্যাপার আর নেই।

না, না, সে-সব কিছু নয়। ভাবছি, কথাটা আপনাকে বলব কিনা।

গুরুতর কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে। ভেবে আর সময় নষ্ট করবেন না। হয়ত আমি আপনার কোন উপকারে লেগে যেতে পারি।

প্রলয় একটু চুপ করে থেকে ঠাকুরসাহাব সংক্রান্ত ব্যাপারটা বলল।

ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একাগ্র মনেই সমস্ত শুনলেন শ্রীকান্ত। ভ্রূ-কুঁচকে একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর উচ্চহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুললেন। এমন রোগা শরীর থেকে এত জোরে হাসি বেরতে পারে ভাবা যায় না।

আপনি হাসছেন!

প্রলয় অবাক হয়ে যায়।

হাসব না? এমন হাসির কথা বহুদিন শুনিনি।

আপনার এটা হাসির কথা বলে মনে হল? আমি তো মনে করি রীতিমত সিরিয়াস ব্যাপার।

মা-লক্ষ্মী দরজার গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছেন, অথচ আপনি দরজা খুলে দেবেন না! আপনার বোকামি দেখেই আমার হাসি পাচ্ছে।

ঘুষ নেওয়ার মত জঘন্য কাজ আর আছে নাকি? এ সমস্ত দুর্নীতিকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

ঘুষ!!!

মহা আশ্চর্য হয়ে শ্রীকান্ত বললেন, ঘুষ আপনি বলছেন কাকে? বলুন আখের গুছিয়ে নেবার ঢালাও ব্যবস্থা। শুনুন মশাই, আজকের দুনিয়ায় সোজা পথ দিয়ে হেঁটে কেউ ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারে না। জীবনকে যদি উপভোগ করতে চান, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতে চান, তবে প্রতিটি সুযোগ চোখ কান বুজে গ্রহণ করে যান।

তা হয় না মাস্টারমশাই।

আপনার আগে যিনি ছিলেন, খবর পেয়েছি তিনি পাটনায় বাড়ি তুলেছেন।

হতে পারে। তবে—

এই পথের পথিক আজ কে নয় বলুন তো? সবচেয়ে উঁচুতে যিনি বসে আছেন তিনি, আর সবচেয়ে নিচে যে আছে, সেও।

আপনার কথা অস্বীকার করছি না। লোভের থাবা চারধারে প্রসারিত, এ কথা কে না জানে। আমি না হয় তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলাম।

করুন চেষ্টা। পারবেন না।

আমি পারব মাস্টারমশাই।

রক্ত এখন গরম। এই বয়সে সকলেই একটু আধটু আদর্শবাদী হয়। আপনার কথাবার্তায় মোটেই অবাক হচ্ছি না। যদি নিজেকে ঠিক রেখে চলতে পারেন, সে তো ভাল কথা। তবে আমি জানি, তা আপনি পারবেন না।

প্রলয় মৃদু হেসে বলল, ও কথা থাক। এবার বলুন তো কিভাবে টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

আপনি কিছু ভেবেছেন?

ভাবছিলাম, কাল ওঁর হাবেলিতে গিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে আসব। এছাড়া আর কোন উপায় আছে নাকি?

না, আর কোন উপায় আছে বলে তো আমার মনে হয় না। তবে কি জানেন, খেলা তারপরই জমে উঠবে।

খেলা! কিসের খেলা?

টাকার খেলা মশাই।

তার মানে?

একটু থেমে থেমে শ্রীকান্ত বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন, আপনাকে দেওয়া প্রতিটি নোটের নম্বর ঠাকুরসাহাব টুকে রেখেছেন। আপনি ওখানে গেলেই উনি পুলিশের ভয় দেখাবেন।

পুলিশ!

হয়ত ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই রকম, তাঁর তহবিল থেকে চুরি করা টাকা তাঁর কোন কর্মচারি আপনাকে দিয়েছে। যে কোন সুবিধা আদায় করবার জন্যই দিয়েছে আর কি? পুলিশ সার্চ করে সহজেই সেই নম্বরের টাকাগুলো আপনার কাছ থেকে পাবে।

প্রলয় আঁৎকে উঠল।

বলেন কি? কিন্তু তাঁর কর্মচারিও যে বেকায়দায় পড়ে যাবে?

তা যাবে বৈকি। তার কিছুদিন জেল হবে। কি যায় আসে তাতে? আপনার তো চাকরি যাবে!

আমার চাকরি গেলে ঠাকুরসাহাবের কি উপকার হবে?

উপকার হবে না মানে? আপনার জায়গায় যিনি আসবেন, তাঁকে দিয়ে ঠাকুর-

সাহাব কাজ আদায় করে নেবেন। আপনার মত সকলে তো আর আদর্শবাদী নয়!

তবে তো—

প্রলয় কথা শেষ করতে পারল না। কেমন যেন তার ভয় ভয় করতে লাগল।

এবার শ্রীকান্ত দত্তর মৃদু হাসার পালা।

কে আর পুলিশের ঝামেলায় গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায় বলুন? আপনিও ও-পথ পরিহার করবার চেষ্টা করবেন। তাই বলছিলাম, পারবেন না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এই স্রোতে গা ভাসাতেই হবে।

বেশ গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। ভেতরে যে এত কিছু থাকতে পারে, আমার মনেই আসেনি।

ইয়েস-ম্যান হয়ে যান, দেখবেন গোলমালের মেঘ কোথায় উড়ে গেছে! অবিরাম টাকা আসতে থাকবে তখন।

প্রলয় কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন ডাঃ ঘোষাল আর সিরাজ মল্লিক। ঘোষাল ব্লকের ডাক্তার। ধানবাদের কোন এক ব্লক থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। বেশ আমুদে লোক। মানভুম জেলার বঙ্গভাষী সিরাজ মল্লিক ব্লকের ওভারসিয়ার। বছর পঁয়ত্রিশের মানুষটি বেশ চটপটে ধরনের।

ডাঃ ঘোষাল বললেন, মাস্টারমশাই এসে গেছেন দেখছি। তাহলে তো কিছুক্ষণ তাস হতে পারে।

মল্লিক বলল, দিন ছয়েক ধরে তো আমরা স্রেফ আড্ডা মারছি। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন, আজ তাস হোক।

সাহেবের আজ আবার মেজাজ ঠিক নেই। উনি কি তাস খেলতে চাইবেন?

শ্রীকান্তর কথা শুনে তাড়াতাড়ি প্রলয় বলল, না, না, তেমন কিছু নয়। আসুন, খেলাই যাক।

পাথর-ঢাকা পথের ওপর দিয়ে ঠাকুরসাহাবের জিপ দ্রুত ছুটে চলেছে। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছেন। আর কেউ নেই গাড়িতে! সেমাপুর থেকে তাঁর হাবেলির দূরত্ব মাইল দুয়েকের কম হবে না। অনেক আগেই পেঁৗছে যেতে পারতেন। অন্য একটি কাজ সারতে সময় গেল।

ঠাকুরসাহাবের চওড়া কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কালকের ছোকরা, সবেমাত্র কাজে ঢুকেছে—তার তেজ দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ভামরাউলির বাঁধ অটুট রাখতে ওই ছোকরার তেজ তাঁকে ভাঙতেই হবে। অবশ্য তিনি জানেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুকূলেই সমস্ত কিছু হবে।

জিপের হেড লাইটের আলো অন্ধকারকে চিরে চিরে এগিয়ে চলেছে। একহাত স্টিয়ারিংয়ের ওপর রেখেও অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ঠাকুরসাহাব সিগারেট

ধরালেন। দু'পাশের ঘন জঙ্গল দ্রুত সরে চলেছে পেছনে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে মাঝে মাঝে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঠাকুরসাহাব দৃষ্টি সামনের দিকেই প্রসারিত রাখলেন।

ভামরাউলির বাঁধের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে তিনি এই রাস্তাটির কথা ভাবতে লাগলেন। গাড়ি জার্ক খেল। কিছুক্ষণ আগে বার কয়েক জার্ক আরো খেয়েছে। নানা জায়গা ভেঙে-চুরে যাওয়ার জন্যই যে এরকম হচ্ছে ঠাকুরসাহাব বুঝতে পারলেন। শীতের শেষে সংস্কার করানো দরকার।

এই রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন ঠাকুর যশপাল সিং—ঠাকুরসাহাবের পিতামহ। তখন মোটর ছিল না। ঘোড়সওয়াররা বিদ্যুৎবেগে যাতায়াত করত এই রাস্তা দিয়ে। ঠাকুর যশপাল কৃতী পুরুষ ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের সুদূর রায়বেরেলি থেকে ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিলেন বিহারের এই অঞ্চলে। তারপর কিভাবে এক নামী পড়তি মুসলমান পরিবারের কাছ থেকে প্রাসাদ—যার নাম মীর্জা হাবেলি, কিনে নিয়ে জমিদারী পত্তন করেছিলেন, নিঃসন্দেহে তা আরেক দুরন্ত ইতিহাস।

জমিদারী বিলোপ বিল কার্যকরি হবার পর পনের হাজার একর জমি··· অবশ্য আর নেই। তবে এখনও স্বনামে ও বেনামে যা আছে, তার পরিমাণ অল্প নয়। এছাড়া আছে অর্থ উপার্জনের নানা পথ। এই বিশাল আয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী ঠাকুরসাহাব। সময় সময় তিনি ভেবেছেন, এত টাকা নিয়ে কি করবেন? তবুও আয় বৃদ্ধির প্রয়াস থেকে বিরত হননি। এও বোধহয় একটা তীব্র নেশা।

হাবেলির গেট অতিক্রম করল জিপ।

যদিও অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে, তবু এখনও বিশাল প্রাসাদে পারসিক হর্ম্যশিল্পের ছাপ বিদ্যমান রয়েছে! বৈদ্যুতিক সংযোগের কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। তবে তার অভাব পূর্ণ করেছে ডায়নামো। একটানা শব্দ তুলে যন্ত্রটি প্রাসাদকে আলোকিত করেছে। সাবেকি বহুমূল্য ঝাড়গুলির মধ্যে থেকে এখন মোমের বদলে বাল্ব থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঠাকুরসাহাবের জিপ প্রবেশ করতেই কর্মচারি মহলে তটস্থ ভাব এল। গাড়িবারান্দায় এসে জিপ থেকে নামলেন ঠাকুরসাহাব। ইংরাজি কায়দায় গাড়িবারান্দা তিনিই তৈরি করিয়েছেন কয়েক বছর আগে। সিঁড়ির একপাশে বিনয়াবনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন মুনিম কৈলাসপতি।

বয়স হয়েছে তাঁর। জমিজমা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু দেখাশোনা করার ভার তাঁর ওপর। বহুদিন ধরে এই পরিবারের সেবা করছেন। তাঁর ঘিয়ে-ভাজা চেহারা আর বিশেষত্ব বর্জিত মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই, তুচ্ছ ব্যাপারে কতবার হাসতে হাসতে দাঙ্গা করবার আদেশ দিয়েছেন লেঠেলদের। তবে আজকাল দুনিয়ার হাওয়া বদলে গেছে। অনেক দেখেশুনে, হিসাব করে তবে পা ফেলতে হয়। অনুচ্চ কণ্ঠে কৈলাসপতি বললেন, আমি আপনার জন্য

বিশেষ চিন্তিত ছিলাম হুজুর।

জুতোর শব্দ তুলে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছিলেন ঠাকুরসাহাব। ফিরে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কর্মচারিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন! কেন বলুন তো?

আপনি একা গেছেন। সঙ্গে আবার বন্দুক নিয়ে যাননি।

নাগিনা সিংয়ের লোকেরা এধারে ঘোরাফেরা করছে নাকি?

এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে বাস করেন আরেক প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী নাগিনা সিং। দুই পরিবারের মধ্যে বেশ ভাবভালবাসাই ছিল। বছর কয়েক আগে এক বিয়ের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ভালবাসায় ফাটল ধরেছে। তারপর থেকেই নানা ছুতোনাতায় নাগিনা সিং গোলমাল বাধিয়ে আসছে। এমন কি ঠাকুরসাহাবকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রও যে হচ্ছে না, এ কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

নাগিনা সিংয়ের লোকেরা এত কাছাকাছি আসতে সাহস পাবে না। আমি বাঘের কথা বলছিলাম।

ভ্রূ-কুঁচকে ঠাকুরসাহাব বললেন, বাঘের উপদ্রব আবার বেড়েছে নাকি?

দিন দুয়েক থেকে বেপরোয়াভাবে লোকালয়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে হুজুর। আজ ভোরে বুধন যাদবের ঘরের পাশে ডাক শোনা গেছে। এস্টেটের প্রায় শ'খানেক বয়েল আছে। জমিচাষের কাজে লাগানো হয় এদের। এই সমস্ত বয়েল যারা দেখাশোনা করে, তাদের প্রধান ছিল ওই বুধন। বয়স হয়েছিল অবশ্য।

আক্ষেপসূচক শব্দ করে ঠাকুরসাহাব বললেন, শেষ পর্যন্ত লোকটা এইভাবে মারা পড়ল!

তারপর পকেট থেকে রিভলবার বার করে কৈলাসপতির সামনে মেলে ধরে বললেন, একেবারে খালি হাতে ছিলাম না। এই অস্ত্রটা সব সময় সংগেই থাকে, আপনি তো জানেন?

তিনি সিঁড়ি অতিক্রম করে হলে প্রবেশ করলেন।

কৈলাসপতি তাঁর পিছু পিছুই আসছেন।

মুনিমজী—

হুজুর—

প্রায় বছর খানেক পরে আবার বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হল, তাই না? কিন্তু এইভাবে চলতে দিতে থাকলে তো মানুষ আর গৃহপালিত জীবের ভয়ানক ক্ষতি হতে থাকবে। রামবরণ সিংকে খবর পাঠান।

এখুনি খবর পাঠাচ্ছি।

সে চেষ্টা করে দেখুক, মারতে পারে কিনা। তারপর অন্য ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখতে হবে।

বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের যে শাখাটি এই অঞ্চল দিয়ে গেছে—তাকে ঘিরে রেখেছে মাইলের পর মাইল গভীর অরণ্য। চিতা, মাঝারি সাইজের বাঘ ও লাকাড় নামে বাঘজাতীয় জন্তু বেশ কিছু সংখ্যক বাস করে। এরা সময় সময় লোকালয়ে প্রবেশ করে উৎপাত আরম্ভ করে দেয়। গত বছর এই রকম উৎপাত যখন আরম্ভ হয়েছিল, তখন শিকারী রামবরণ সিংকে নিয়োগ করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল।

ঠাকুরসাহাব নিজের খাস কামরায় চলে গেলেন।

খাস কামরার একপাশে কাঁধে তোয়ালে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল ত্রিলোক। ঠাকুরসাহাবের প্রিয় ভৃত্য সে। উনি হাবেলিতে প্রবেশ করার পর, কাছাকাছি থেকে ওঁর সুখ-সুবিধা দেখাই হল তার কাজ। পিঠে ছোট একটা কুঁজ আছে। মাথা ঝুঁকিয়ে চলে বলে অনেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্নর মত দেখায় ত্রিলোককে। যৌবনে শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার করেছিল বোধহয়, এখনও তার চিহ্ন মুখের ওপর আঁকা রয়েছে।

মালিককে দেখে তাড়াতাড়ি সে হুইস্কির বোতল আর সোডা ছোট গোল টেবিলটার ওপর এনে রাখল। ঠাকুরসাহাব একবার সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে সোফায় গিয়ে গা ঢেলে দিলেন। ত্রিলোক দ্রুত হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দিতে লাগল।

ওগুলো এখান থেকে সরিয়ে নাও।

তাড়াতাড়ি উঠে টেবিলের ওপর থেকে পানীয়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বিনীতভাবে ত্রিলোক বলল; আপনার শরীর কি ভাল নেই মালিক?

ভালই আছে। তুমি রাণীসাহেবাকে খবর দাও।

নিজের বাঁকা শরীর নিয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় বছর সাতেক আগে ঠাকুরসাহাব হেমাবতীকে ঘরে এনেছেন। একটু বেশি বয়সে যে বিয়ে করেছেন তা নয়। বরং রেওয়াজ অনুসারে কৈশোর অতিক্রম করার পরই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। যৌবনের মধ্যদিনে তাঁর সেই স্ত্রী সামান্য কয়েকদিনের অসুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এরপর ও-পথ আর মাড়াবেন না—একরকম স্থিরই করে ফেলেছিলেন। তিন বছর সে প্রতিজ্ঞা অটুট ছিল তাঁর। কিন্তু সেবার রাঁচিতে হেমাবতীকে দেখার পরই মনের মধ্যে এক দারুণ বিপ্লব এল।

বিশেষ আমন্ত্রণে রাঁচি গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে। গোলমাল ঝামেলা এ সমস্ত এড়িয়েই চলতে চান ঠাকুরসাহাব। বহুদিন গ্রাম থেকে বেরোননি, বড় একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল জীবন। কয়েকদিন ঘুরে এলে মন তাজা হয়ে উঠতে পারে, তাই গিয়েছিলেন।

নাগিনা সিংও সেখানে উপস্থিত।

সেই আত্মীয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে নাগিনার। যেখানে উঠেছিলেন, তাঁর পাশের বাড়িতে বাপ-মা'র সঙ্গে থাকত হেমাবতী। তাকে দেখেই মোহিত হয়ে গেলেন ঠাকুরসাহাব।

বাপের অবস্থা ভাল নয়। কোন এক প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। অস্বচ্ছলতার দরুণ মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি। দিন দিন তাঁর বয়স বেড়েই চলেছে। যথা নিয়মে নাগিনা সিংও হেমাবতীকে দেখলেন। এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাছে পাবার জন্য অসম্ভব উতলা হয়ে উঠলেন।

যদিও তাঁর স্ত্রী আছেন, তাতে কি যায় আসে ? আইনানুসারে যে দুটি স্ত্রী রাখা যায় না, তাও তিনি জানেন। ভদ্রঘরের মেয়েকে টাকার বিনিময়ে উপপত্নী হিসাবে যে রাখা যায় না, তাও অবধারিত। নাগিনা দ্রুত এক প্ল্যান খাড়া করে ফেললেন। তাঁর আশ্রিত এক ন্যালাখ্যাপা ভাগ্নে আছে। তার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা ঘটিয়ে দিতে পারলে, প্রকৃতপক্ষে হেমাবতী তাঁর ভোগেই লাগবে। ঘুটি পাকিয়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলেন নাগিনা।

নাগিনা সিং কি প্ল্যান করছেন, তা বুঝতে না পারলেও, সহজেই ঠাকুরসাহাব অনুমান করতে পারলেন। আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, সঙ্গত পথ ধরেই তিনি দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরসাহাবেরই জয় হল।

কোন ধনী ব্যক্তির ভাগ্নের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে ঠাকুরসাহাবের মত পাত্রকে জামাই করা যে অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না হেমাবতীর বাবার। বয়সের পার্থক্য একটু বেশি হচ্ছে অবশ্য তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধাই হতে পারে না। মেয়ে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে থাকবে, এর চেয়ে আর বেশি কি চাই ?

সেই দিন থেকে নাগিনা সিং আগুন হয়ে আছেন। ঠাকুরসাহাবের ক্ষতি করার জন্য সদাই তিনি তৎপর।

মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল দরজার বাইরে। আতরের মিষ্টি গন্ধও হাওয়ায় ভাসতে আরম্ভ করেছে। রেক্সিন দিয়ে মোড়া গদি যুক্ত গড়ানে চেয়ারে শরীর ঢেলে দিয়েছিলেন ঠাকুরসাহাব। এবার ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। হেমাবতী ঘরে প্রবেশ করছে।

রূপের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এক কথায় এইটুকু বলা চলে, এমন নিখুঁত সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না। বাসন্তী রঙের শাড়ি হেমাবতীর শরীরে জড়ানো। চলনের ভঙ্গিতে যদি পুরুষের মন বিশেষ এক রিপুর তাড়নায় জর্জরিত হয়, তবে দোষ দেওয়া যায় না। বয়স ছাব্বিশ সাতাশের বেশি হবে না।

আমায় ডেকেছ ?

ঠাকুরসাহাব সোজা হয়ে বসলেন।

না ডাকলে তো তুমি আসবে না।

যখন তখন এখানে আসাটা কি ঠিক? তুমিই হয়ত বিরক্ত হবে।

তোমার ওপর ছাড়া আমার আর কোন নারীর ওপর দুর্বলতা নেই, তুমি তা ভালভাবেই জানো। বিরক্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নিচু গলায় হেমাবতী বলল, আমি বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা কর।

ওইখানে বসো। আদব-কায়দার কথা শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেছি। তুমিও ওই ধরনের কথা বল না। একটু সহজ হও, একটু আন্তরিক হও।

তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীর খারাপ নাকি?

শরীর নয় হেমা মন। ভামরাউলির বাঁধ নিয়ে গোলমাল আরম্ভ হয়েছে তুমি তো জানো। সেই ব্যাপারে বি. ডি. ও. র কাছে গিয়েছিলাম। এতদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সেই ছোকরা তছনছ করে দিয়েছে। আজকের দিনে বিনা পরিশ্রমে টাকা পেয়েও নিতে অস্বীকার করে কেউ, শুনেছ?

তার বোধহয় তেমন টাকার প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন নেই কি বলছ! নিশ্চয় আছে। আসল কথা নতুন তো, হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। সৎ হয়ে থাকার ইচ্ছা মনে প্রবল হয়ে রয়েছে আর কি। কিন্তু আমি জানি, মনের এই ভাব সে বজায় রাখতে পারবে না।

একটা কথা বলব—বিরক্ত হবে না তো?

না। বল।

তোমার এত আছে। ভামরাউলির বাঁধ যদি ভেঙেই যায়, তাতে কী আর এমন ক্ষতি হবে?

লাভ-ক্ষতির কথা নয় 'এর সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

আমি ঠিক বুঝলাম না।

ত্রিলোক দরজার পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে ঠাকুরসাহাব বললেন, তুমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা কর। লক্ষ্য রাখবে এদিকে যেন কেউ না আসে—

ত্রিলোক আদেশ পালন করল।

নিজের আসন ছেড়ে ঠাকুরসাহাবের চেয়ারের চওড়া হাতলের ওপর এসে বসল হেমাবতী।

এই ব্যাপারটা সরকারের গোচরে আনার নেপথ্যে আছে নাগিনা সিং। আমাকে সে বেকায়দায় ফেলতে চায়। আমি মুখ বুজে ব্যাপারটাকে তো মেনে নিতে পারি না। আমার রক্ত সে শিক্ষা দেয়নি। বাঁধ যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। তারপর হবে নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া।

কি করতে চাও তুমি?

এখনো জানি না কি করতে চাই। সময় হলে প্ল্যান ঠিক মাথায় এসে যাবে।

তবে নাগিনা সিং বেঁচে থাকুক এ আমার পছন্দ নয়।

তুমি—

সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে আমি তাকে খুন করাতে পিছপা হব না।

খুন করাবে!

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই। শুনেছি, আমার পিতামহ ঠাকুর যশপাল নিজের জীবনে দেড়শোর ওপর খুন করিয়েছিলেন। আমিও না হয় একটা করালাম। ও সমস্ত কথা এখন থাক, এই চিঠিটা পড়ে দেখ তো—

ঠাকুরসাহাব পকেট থেকে একটা খাম বার করে আবার বললেন, কালকের চিঠিখানা এসেছে। তোমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

হেমাবতী খামখানা নিজের হাতে নিয়ে, চিঠি বার করে পড়তে লাগল। ওর মুখের রঙ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, লক্ষ্য করলেন ঠাকুরসাহাব। কিন্তু পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বললেন না।

চিঠিটা নিম্নরূপ—

মান্যবর মহাশয়,

একটি ব্যাপার ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলেছে লক্ষ্য করে আপনাকে এই চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না।

আপনার সম্বন্ধী দিবাকর কিছুদিন হল এখানেই অবস্থান করছেন। তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখেন কি? আপনার এই অতি নিজের লোকটি ভয়ানক এক খেলায় মেতেছেন। আপনার বিরুদ্ধবাদী নাগিনা সিংয়ের ওখানে তিনি খুব যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। মনে হয় আপনার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র অতি দ্রুত গড়ে উঠছে।

নানা কারণে নিজের পরিচয় দিতে বর্তমানে অনিচ্ছুক। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই সতর্ক করে দেওয়ার এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সহজেই অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

জনৈক সতর্ককারী

পড়লে?

হেমাবতী মাথা নাড়ল।

এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?

বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না।

তোমাকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দিবাকরকে ইচ্ছে করেই আমি এখনো কিছু বলিনি। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি আগে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। তারপর বলব।

কিভাবে অনুসন্ধান করবে ?

সেই কথাই ভাবছি।

ঠিক এই সময় আলো নিভে গেল। অন্ধকারে ডুবে গেল বিশাল মীর্জা হাবেলি। ডায়নামো কি ফেল করল? নিশ্চয়ই তাই। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমাবতী ঝুঁকে পড়েছিল ঠাকুরসাহাবের দিকে। তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। এইভাবে আলো আগে কিন্তু কখনো নেভেনি।

ত্রিলোক—

মালিক।

প্রভুর আহ্বানে দরজার কাছ থেকে সাড়া দিল সে।

এখুনি বিজলি-ঘরে চলে যাও। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে বল।

তাঁর কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই বাঘের হুঙ্কারে কেঁপে উঠল চারধার। একবার নয়, পর পর কয়েকবার। মনে হল, এই ঘরের ঠিক সামনে থাবা গেড়ে বসে, লেজ আছড়াতে আছড়াতে জন্তুটা ডেকে চলেছে। ঠাকুরসাহাবের দুই বাহুর মধ্যেই হেমাবতী শিউরে শিউরে উঠছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আলোর আভাস পাওয়া গেল। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ত্রিলোক আসছে। ভীষণ উত্তেজিত সে।

হেমাবতী সরে এল। ঠাকুরসাহাব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি দেখে এলে ? মেসিন খারাপ হয়ে গেছে ?

বিজলি-মিস্ত্রিকে বাঘে মেরে ফেলেছে মালিক।

মেরে ফেলেছে !!

ঠাকুরসাহাব দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে বললেন, দরবারা সিং, রূপনারায়ণ—এরা কি করছিল ? গুলি চালাতে পারেনি ? লোকালয়ে বিশেষ করে হাবেলির হাতায় এসে বাঘে মানুষ মারল—এ তো বড় ভয়ানক ব্যাপার ! অপদার্থগুলো কি বসে বসে খইনি টিপছিল ? হেমা, আমি দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

হেমাবতী কাঁপা গলায় বলল, আমার ভীষণ ভয় করছে !

হাবেলির মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। ত্রিলোক, রাণীসাহেবাকে তাঁর ঘরে পেঁছে দিয়ে এসো। রামপেয়ারীকে বলবে, সে যেন ওঁর কাছে থাকে।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেঁছিলেন ঘটনাস্থলে। হাবেলির পশ্চিমদিক ঘেঁষে বাউণ্ডারি ওয়ালের গায়ে ডায়নামো-ঘর। সেখানে তখন বহুলোক জড়ো হয়েছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাবার্তা বলছে তারা। মুনিম কৈলাসপতিও উপস্থিত রয়েছেন। কর্তাকে আসতে দেখে সকলে চুপ করে গেল।

ঠাকুরসাহাব দেখলেন, ডায়নামো-ঘরের দরজার সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ইলেকট্রিসিয়ান বিনোদ বর্মা। শরীর ক্ষতবিক্ষত। রক্ত গড়িয়ে চলেছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মুখের। চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুরসাহাব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না সেদিকে।

কয়েকবার ঘাড় চুলকে কৈলাসপতি বললেন, পুলিশে খবর দেব কি ?

পুলিশে খবর দেবেন! কেন বলুন তো ?

অপঘাতে মৃত্যু তো···মানে···

আপনি বিনোদের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। ওরা এসে সৎকারের ব্যবস্থা করুক। কিন্তু এ সমস্ত কি হচ্ছে মুনিমজী ? পাহারাদারগুলো কি করছিল ? মাসে মাসে মাইনে নেওয়া ছাড়া ওদের আর কিছু করণীয় আছে কিনা আমি জানতে চাই। দুনিয়ার যত অপদার্থগুলো আমার কাছে এসে জুটেছে !

হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটে গেছে হুজুর। হাতার মধ্যে বাঘ ঢুকবে, এ তো ভাবাই যায় না। তাছাড়া আলোটা নিভে যাওয়ায়···

কোন কৈফিয়ৎ আমি শুনতে চাইনি। দরবারা আর রূপনারায়ণকে আমি বরখাস্ত করলাম। ওদের হিসেব মিটিয়ে দেবেন। হাবেলিতে উপস্থিত না থাকলে ব্যাপারটা আমি বিশ্বাসই করতাম না। বাঘটাকে কেউ দেখেছে ?

জানা গেল কেউ দেখেনি। সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। ডায়নামো-ঘর একটেরে হওয়ায় নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে এদিকে কেউ আসে না। অবশ্য দুর্ঘটনার কয়েক মিনিট আগে দরবারা সিং এধারে রাউণ্ড দিয়ে নিজের ডিউটি বজায় রেখেছে।

এই অন্ধকার ঠেঙিয়ে, প্রাণ হাতে করে কেউ যে পাশের গ্রামে বিনোদ বর্মার বাড়িতে খবর দিতে যেতে চাইবে না, কৈলাসপতি তা ভাল ভাবেই জানতেন। সকালের অপেক্ষায় তিনি ব্যাপারটা মুলতুবি রাখলেন।

ঠাকুরসাহাব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে বললেন, এত উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল টপকে বাঘ এসেছে, আবার ফিরে গেছে বলে আমার মনে হয় না। দেউড়ি দিয়ে ঢুকেছিল—একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে কোন্ পথ দিয়ে জানোয়ারটা এসেছিল বলে আপনার মনে হয় মুনিমজী ?

একজন কর্মচারি বলে উঠল, এধারের দরজাটা খোলা আছে মালিক।

ডায়নামো-ঘরের সামান্য কয়েক হাত দূরে বাউণ্ডারি ওয়াল-সংলগ্ন একটা ছোট দরজা আছে। ওই পথ দিয়ে মেথর, মালী—এরা যাতায়াত করে। তবে সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মৃতদেহের কাছে গোটা চারেক লণ্ঠন জ্বলতে থাকলেও, দূরের কিছু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। কৈলাসপতির হাতে তিন সেলের একটা টর্চ ছিল। টর্চটা নিয়ে ঠাকুর-সাহাব লক্ষ্যের দিকে তাক করে বোতাম টিপলেন। এক ঝলক আলো ছোট দরজাটার ওপর গিয়ে পড়ল। সত্যি, তার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা।

এর মানে কি মুনিমজী ?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না হুজুর।

এই দরজা বন্ধ করার ভার কার ওপরে ?

বনোওয়ারীর ওপর ভার আছে। দরজাটা আজ খোলা রেখেছিল কেন বোঝা যাচ্ছে না।

দরজা খোলা পেয়ে বাঘ এই পথ দিয়েই ঢুকেছিল। এই গাফিলতি আমি সহ্য করব না। বনোওয়ারী কোথায় ?

বনোওয়ারী সেখানে ছিল না। তাকে খ‍ুঁজতে লোক ছ‍ুটল।

ওদিকে—

লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে চলেছে ত্রিলোক, পেছনে হেমাবতী। সত্যি তার ভীষণ ভয় করছে। রাঁচির মত বড় শহরে সে মান‍ুষ হয়েছে। ভয় জিনিসটা যে কি, বোঝার অবকাশ ছিল কম। এখানে পা দেবার পর থেকে রাজ্যের দ‍ুর্বলতা তাকে ঘিরে ধরেছে। বছরের পর বছর যে কিভাবে কাটিয়ে চলেছে সেই জানে। আজ আবার এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

বারান্দার মোড় ঘ‍ুরতেই দিবাকরকে দেখতে পেল হেমাবতী।

সে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বয়স ত্রিশের কিছ‍ু ওপরেই হবে। একহারা, লম্বাটে চেহারা। অস্থিসার ম‍ুখ। দিবাকর হেমাবতীর সহোদর নয়, মামাতো ভাই। কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল এখানে। কোন চাকরি-বাকরি করছে না—মানে, চাকরি পাচ্ছে না শ‍ুনে ঠাকুরসাহাব ওকে আটকেছেন। কথা দিয়েছেন, ম‍ুঙ্গেরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।

হেমাবতী দিবাকরের সামনে এসে থামল।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

হঠাৎ আলো নিভে গেল। তাই···

বাঘের ডাক শ‍ুনতে পেয়েছিলে ?

দ্র‍ুত গলায় দিবাকর বলল, কয়েকবারই তো ডাকল। বাঘটা কাছাকাছি ঘ‍ুরঘ‍ুর করছে। ঠাকুরসাহাব করছেন কি ? জন্ত‍ুটাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা না করলে তো যখন তখন মান‍ুষ তুলে নিয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে ডায়নামো-ঘরের মিস্ত্রি মারা পড়েছে। ত্রিলোক, এ ঘরের জন্য একটা আলো নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

ত্রিলোক হাতের লণ্ঠন নামিয়ে রেখে চলে গেল।

ত্রস্তভাবে দিবাকর বলল, মারা পড়েছে! হাবেলির মধ্যে বাঘ ঢুকে পড়েছিল ? কি সর্বনাশ! আর এখানে নয়, রাঁচিতে ফিরতে হল দেখছি।

তোমার চাকরির কি হবে তাহলে ?

হবে না। চাকরির অপেক্ষায় থেকে কি বাঘের পেটে যাব ? আর যে ক'দিন এখানে থাকব, সন্ধ্যার পর ঘর থেকে আর পা'টি বাড়াচ্ছি না বাইরে।

তুমি যে এত ভীতু, তা তো আমি জানতাম না দিবাকরদা ? যাক, ও সমস্ত। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল। তোমার নাকি আজকাল

নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে খুব দহরম মহরম ?

দহরম মহরম ! কে বললে তোমায় ?

নিজের শান্ত ভাব বজায় রেখেই হেমাবতী বলল, কে বলল, সেটা বড় কথা নয়। কথাটা হচ্ছে, যা জানতে চাইলাম, তা সত্যি কিনা ?

ইতস্তত করে দিবাকর বলল, আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কাছে কেউ লাগিয়েছে বুঝতে পারছি। না, সে রকম কিছু নয়। মানে···

থামলে কেন দিবাকরদা ?

একদিন সোমাপুরে নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাকে এক কাপ চা খাইয়েছিলেন। এই আর কি।

আর কিছু নয় ? আমরা কিন্তু অন্যরকম কথা শুনছি।

সমস্ত মিথ্যা রটনা হেমাবতী। তোমাদের এখানে এমন একজন নিশ্চয় কেউ আছে, যে আমাকে পছন্দ করছে না।

মিথ্যা রটনা হলেই ভাল। ওই লোকটিকে ঠাকুরসাহাব পছন্দ করেন না, একথা যেন কখনও ভুলো না।

ত্রিলোক আরেকটি লণ্ঠন নিয়ে ফিরে আসছিল। হেমাবতী আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরের দিকে এগোল মন্থর পায়ে। দিবাকর তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে রইল ওর গমন পথের দিকে।

বেলা তখন সাড়ে এগারোটা।

নিজের ছোট্ট অফিস ঘরে বসে প্রলয় ফাইল দেখছিল, এবার মুখ তুলে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। আর আধ ঘণ্টা পরে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলেই চলবে। প্রতিদিন বারোটা আন্দাজ সময় কোয়ার্টারে যায় খেতে। প্রলয় আবার ফাইলের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল। কাজে একেবারে মন বসছে না।

ওধার থেকে চাপা কলগুঞ্জন ভেসে আসছে। ক্লার্করা কাজ করার চেয়ে গল্পগুজবই করছে বেশি। জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, অদূরের খড়ে ছাওয়া চায়ের দোকানটা। সেখানে কিছু লোকের জটলা চলছে। তাদের মধ্যে হিন্দুস্থান কোয়ারির মালিক সুদর্শন অরোরাও রয়েছে। প্রতিদিন ব্লক অফিসে নানা লোক আসে নানা কাজে—তার দৌলতেই ওই চায়ের দোকান চলে।

ঠাকুরসাহাবের সঙ্গে প্রলয়ের সেই নাটকীয় সাক্ষাতের পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এ ক'দিন অনেক ভেবেও স্থির করতে পারেনি তাঁর ফেলে যাওয়া টাকাগুলোর কি গতি করবে। অস্বস্তি মনের মধ্যে চাগ বেঁধে রয়েছে তাই। ঠাকুরসাহাব হয়ত ভেবে বসে আছেন, শেষ পর্যন্ত লোভ সংবরণ করতে না পেরে ঘুষ সে স্বীকার করে নিয়েছে। এবং তাঁর কাজ করেও দেবে।

ফাইল বন্ধ করে প্রলয় সিগারেট ধরাল।

ওই সমস্যার সমাধানে পেঁছনো বেশ শক্ত ব্যাপার।

অফিসের বড়বাবু কেদার সিনহা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে কিছু কাগজপত্র। সই করিয়ে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রলয়ের সামনে কাগজগুলি রাখলেন তিনি।

একে একে সবগুলিতে সই করে দিল ও।

বড়বাবু, আজ যেন গোলমাল একটু বেশি হচ্ছে। কাজকর্ম কেউ কি কিছু করছে না?

আজ মাইনের দিন স্যার। সকলেরই মনে একটু খুশী খুশী ভাব।

তাই তো! আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

পে-শিটটা কি এখানে নিয়ে আসব স্যার? আপনি কি—

তার দরকার হবে না। আমি নিজেই পে-ক্লার্কের কাছে যাব।

সই করা কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে বড়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রলয়। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। মাইনে নিয়ে আজই দেড়শ' টাকা বাবাকে পাঠিয়ে দেবে। টাকাটা পেয়ে তিনি বিশেষ খুশী হবেন সন্দেহ নেই। তখনই কিন্তু অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হল না।

হন্তদন্ত হয়ে পে-ক্লার্ক এসে ঢুকল।

তার পেছনে একটি মেয়ে।

কি ব্যাপার?

ইনি স্যার খুব ঝামেলা করছেন। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

প্রলয় আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। ভালভাবে মেয়েটির—অর্থাৎ যুবতীটির দিকে তাকাল। বিবাহিতা। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য অনেক খুঁত বেরুবে। তবে সব মিলিয়ে সুশ্রীই বলা চলে। পে-ক্লার্ককে যে কি ধরনের ঝামেলায় এই যুবতী ফেলতে পারে, ও বুঝতে পারল না।

কি হয়েছে বলুন তো?

দশদিনের মাইনে কাটা গেছে। তাই নিয়ে উনি গোলমাল করছেন। নিজেও মাইনে নিচ্ছেন না, অন্যকেও নিতে দিচ্ছেন না।

ব্লকের অধীন কয়েকটি প্রাইমারি স্কুল থাকে। যুবতী সেই সমস্ত স্কুলের কোন একটির শিক্ষিকা, প্রলয় এবার বুঝতে পারল। সঙ্গত কারণ না থাকলে দশদিনের মাইনে যে কাটা যেতে পারে না, সে কথা অনুমান করতেও কষ্ট হয় না।

আপনি এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

যুবতী বলল, আমি দশদিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম ঠিকই। তবে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়েছি। ছুটিও পাওনা আছে আমার। তবে কেন মাইনে কাটা যাবে, বুঝতে পারছি না।

...ঙ্গত প্রশ্ন।

প্রলয় বলল, হয়ত আপনার সার্টিফিকেট সময় মত যথাস্থানে পেঁছয়নি। তাই এই গোলমাল। এরকম হয় মাঝে-মধ্যে। আপনি গিয়ে মাইনেটা নিয়ে নিন।

নিয়ে নেব। কিন্তু—

আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি। কেস যদি জেনুইন হয়, আপনি দশদিনের পাওনা নিশ্চয় পাবেন। এতগুলো লোকের মাইনে-পত্র দিতে হবে। আর পে-ক্লার্কের সময় নষ্ট করাবেন না।

এর পরও যুবতী দাঁড়িয়ে রইল।

আর কিছু বলবেন ?

এই ব্যাপারটা আপনার কি পরে মনে থাকবে ?

নিশ্চয় থাকবে। আপনার নাম আর কোন্ স্কুলে আছেন বলুন, নোট করে রাখি বরং।

তানিমা সহায়। মীরপুর প্রাইমারি স্কুলে আছি।

বাঙালি মেয়ে হলে তনিমা হত।

নাম ও ঠিকানা লেখার পর তানিমা ও পে-ক্লার্ক বিদায় নিল। এবার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রলয়। কোয়ার্টার খুব বেশি দূর নয়। এই-টুকু পথের জন্য জিপের দরকার পড়ে না। হেঁটেই যাওয়া-আসা করে। চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় সুদর্শন অরোরার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আগেই আলাপ হয়েছিল। কোয়ারির মালিককে নানা কারণে বি-ডি-ও এবং ব্লক অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখতেই হয়।

আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছিলাম।

বিস্ময়ের সুরে প্রলয় বলল, এখানে কেন ? অফিসে গেলেই তো পারতেন।

মোলায়েম হাসিতে মুখ ভরিয়ে সুদর্শন বলল, বেসরকারি প্রয়োজন কিনা স্যার, তাই অফিসে যাইনি। আগামীকাল সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে।

হঠাৎ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ?

বিশেষ কোন কারণ নেই। হঠাৎ বাড়তি কিছু টাকা এসে গেছে। সকলে মিলে জোর আনন্দ করা যাবে, এই আর কি।

একটু চিন্তা করে প্রলয় বলল, বেশ, যাব। আপনার ক্যাম্প তো মীরপুরে ? আর কে কে যাচ্ছেন ?

আপনার পরিচিত সকলকেই দেখতে পাবেন। লোককে স্যার আমি খাওয়াতে ভালবাসি। মেনু অবশ্য আহামরি কিছু নয়। মুর্গির কারি আর ঘি ভাত। অবশ্য কয়েক বোতল হুইস্কিও থাকবে।

প্রলয় আর কিছু না বলে এগোল।

কোয়ার্টারে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি।

সুদর্শন অরোরা ওর সঙ্গে এগোতে এগোতে বলল, একটা খবর শুনে ভা.. খুশি হলাম আপনার মত লোকই আমাদের মধ্যে দরকার ছিল।

কি বলুন তো ?

ঠাকুরসাহাব একটা অন্যায় কাজ আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছিলেন। আপনি রাজি হননি। লোকটা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। মুখের মত জবাব পাওয়া দরকার ছিল।

প্রলয় অত্যন্ত বিরক্ত হল। শ্রীকান্ত দত্ত ছাড়া একথা আর কারোর মুখ থেকে সুদর্শন অরোরা শুনতে পারে না। তাঁর মানে তিনি রসিয়ে গল্প করে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। ও আর কিছু না বলে দ্রুত পা চালাল। অরোরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিরে গেল চায়ের দোকানে।

কোয়ার্টারে ফিরে প্রলয় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। শীতকালে এখানে নিয়মিত স্নান করার কথা ভাবাই যায় না। ঘণ্টাখানেক বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। অফিসের দিকে না গিয়ে, পা চালাল স্টেশনের দিকে। দত্তকে দু-চার কথা বলা দরকার। বয়স হয়ে গেছে, অথচ কথা চালাচালি করার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি !

শ্রীকান্ত দত্ত নিজের চেয়ারে ছিলেন না। বোধহয় গুদামের দিকে গেছেন। প্ল্যাটফর্মে কয়েকজন যাত্রী ঘোরাফেরা করছে। লোকালের আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। প্রলয় প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগল শ্রীকান্ত দত্তর অপেক্ষায়।

টিকিট ঘরের লাগোয়া করোগেট সেডের তলায় পুরুষদের অপেক্ষা করার জায়গা। তবে মহিলাদের জন্য ঘেরা একটা জায়গা আছে। তাকে ওয়েটিংরুম না বলে উপায় নেই। সেই ওয়েটিংরুমের কাছ দিয়ে যাবার সময় প্রলয় লক্ষ করল, দরজার সামনে তানিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও যাবে নিশ্চয়। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রলয়কে দেখে সে এগিয়ে এল।

আপনি কোথাও যাচ্ছেন ?

না। স্টেশনেই একটু কাজ আছে। মাইনে নিয়েছেন তো ?

হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই দশদিনের টাকাটা এই মাসেই পাব তো ?

মনে হয় না। এ সমস্ত ব্যাপারে একটু দেরি হয়ই।

ম্লান গলায় তানিমা বলল, আমার খুব অসুবিধা হবে। কি বা মাইনে পাই। তার থেকে টাকা কাটা গেলে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়।

ইচ্ছে ছিল না, তবুও প্রলয় প্রশ্ন করে বলল, আপনার সংসার খরচ কি খুব বেশি ?

সংসার বলতে তো আমি একা। মাকে টাকা পাঠাতে হয়। আমি না

দেখলে তাঁর তো খাওয়া-পরা জুটবে না।

এই প্রশ্ন করার জন্য আমি লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছুই মনে করিনি। আপনি কিন্তু আমার টাকাটার জন্য চেষ্টা করবেন।

নিশ্চয় করব।

এরপর কি বলা উচিত প্রলয় ভেবে পেল না। বিহারী মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণা একটু অন্যরকম ছিল। তানিমার সপ্রতিভতায় এখন অবাক হয়ে গেছে। জীবিকার জন্য যারা অবিরাম পরিশ্রম করে চলে, তারা যে কোন জাতের মেয়ে হোক না, একই ধাঁচের হয় বোধহয়।

এই সময় শ্রীকান্ত দত্তকে আসতে দেখা গেল।

প্রলয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

তিনি এসেই বললেন, কি ব্যাপার, আপনি অসময়ে যে?

কিছু কথা ছিল।

তানিমা ওয়েটিংরুমের ভেতরে চলে গিয়েছিল।

চলুন, কোয়ার্টারে গিয়ে বসি।

শ্রীকান্তর সংসার বলতে কিছু নেই। স্ত্রী বহুদিন হল গত হয়েছেন। ছেলে নেই। মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে। কালে ভদ্রে দেখা হয়। কোয়ার্টারে একাই থাকেন। পোর্টাররা রান্না করে দেয়, বাসন মাজার ভারও তাদেরই ওপর। তাঁর মতে তিনি সুখেই আছেন।

রহস্যময় হাসি হেসে শ্রীকান্ত বললেন, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে দেখছি।

কোন্ মেয়েটি? ও—উনি তো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। আমার সঙ্গে যোগাযোগ তো হতেই পারে। আপনি চেনেন নাকি?

বিখ্যাত মেয়ে মশাই। এ তল্লাটে ওকে চেনে না কে?

বিস্মিত গলায় প্রলয় বলল, কিসের জন্য বিখ্যাত?

চটকদার চেহারার জন্য। কত লোক যে ওকে কাছে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে, কি বলব। কিন্তু—

ওপক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন এল না দেখে, শ্রীকান্ত আবার বললেন, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে তুখোড় মেয়ে। কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

আমি কিন্তু আপনার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি মাস্টারমশাই। একটা ভাল মেয়েকে নষ্ট করার জন্য এখানকার কিছু লোক আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!

দড়ি ছেঁড়া গাইকে অনেকেই নিজের গোয়ালে নিয়ে যেতে চায়। আপনার এখন বয়স অল্প। ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবেন।

দড়ি ছেঁড়া গাই মানে, ওর স্বামী আছে!

আছে ঠিকই। তবে এখানে থাকে না।

যাক, ও সমস্ত কথা। পরচর্চা না করাই ভাল। যে জন্য আপনার কাছে এলাম, তাই বলি এবার। সেদিনের সেই ব্যাপারটা আপনি ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন? এরকম হবে জানলে, আমি কিন্তু আপনাকে বলতাম না।

কোয়ার্টারের মধ্যে প্রবেশ করল দুজনে।

কোন্ ব্যাপারটা বলুন তো?

তারপর মনে পড়ে গেছে, এরকম ভঙ্গি করে শ্রীকান্ত বললেন, এর জন্য আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো বরং ভালই করেছি। লোকে জানল আপনি ঘুষ নেন না। ঠাকুরসাহাবের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোককে আপনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি।

আমি কিন্তু চাইনি, এ সমস্ত জানাজানি হয়ে যাক।

আপনি না চাইলে কি হবে। লোকে শুনে খুশী হয়েছে। ভাল কথা, সুদর্শন অরোরা আপনাকে নিশ্চয় নেমন্তন্ন করেছে? কাল সন্ধ্যায় যাচ্ছেন তো ওর ওখানে?

যাব ভাবছি।

তৈরি হয়ে যাবেন। ঠাকুরসাহাব থাকবেন ওখানে। আবার বাঁধের কথা ওঠা বিচিত্র নয়।

প্রলয়ের মন তেতো হয়ে উঠল।

ঠাকুরসাহাবও ওখানে যাচ্ছেন! তাহলে আমার না যাওয়াই ভাল।

অমন কাজও করবেন না। তাহলে অরোরা ভাববে আপনার তম্বির দৌড় বেশি দূর নয়। তবে কি জানেন, এসবে নাম হয়, পেট ভরে না। আবার বলছি, কাজ গুছিয়ে নিন। ভবিষ্যৎকে সোনায় মুড়ে ফেলার এই হল শ্রেষ্ঠ সময়।

ওকথা থাক। আমি এবার চলি। অফিসে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

নেমন্তন্ন না যাবার কথাই বোধহয় এখন ভাবছেন?

তা কেন! কথা যখন দিয়েছি, তখন যাবই। আপনাকে তুলে নেব কি?

আমি আর ডাঃ ঘোষাল থানার গাড়িতে যাচ্ছি। দারোগাসাহেবও আমন্ত্রিত কিনা—

আরো দু-চার কথার পর প্রলয় ওখান থেকে বিদায় নিল।

সুদর্শন অরোরা প্রায় বছর তিনেক এ অঞ্চলে আছে। আগে পাকুড়ে কারবার ছিল তার। পাকুড় চিপসের চাহিদা দেশের সর্বত্র। তবে ওখানকার তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়েই নতুন জায়গার সন্ধান করতে করতে এখানে এসে পড়েছিল।

এখানে তখন পাথর কাটার কাজ হত না। সরকারের কাছ থেকে পাহাড়ের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে সুদর্শন অরোরাই প্রথম কাজ আরম্ভ করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন—অল্প দিনেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তার কম্পানির চিপস রিহান্দের

মত বড় বড় পরিকল্পনার কাজে লাগানো হচ্ছে।

অরোরার আস্তানায় প্রলয় পেঁছিল প্রায় ছ'টার সময়।

মিশমিশে কালো হয়ে উঠেছে চারধার। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্রী শব্দ করে একটানা ডেকে চলেছে নাম না জানা পোকারা।

ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রলয়ের অবশ্য বিশেষ অসুবিধা হয়নি। বাঁশ, বেত আর করোগেট দিয়ে তৈরি বেশ শক্তপোক্ত গোটা দশেক বড় বড় ঘর। এতেই অরোরা তার কর্মচারিদের নিয়ে থাকে। পাথর ভাঙে যেসব কুলী, তারা অবশ্য আশপাশের গ্রাম থেকে আসে।

অনেক হ্যাজাক যোগাড় করা হয়েছে। তারই আলোয় চারধার ঝকঝক করছে। এখান থেকে ঠাকুরসাহাবের মীর্জা হাবেলি বোধহয় খুব বেশি দূরে নয়। ডায়নামোর একটানা শব্দ ক্ষীণভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সুদর্শন প্রলয়কে দেখেই মহা সমাদরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

সকলেই প্রায় এসে গেছেন। শীতকাল বলে বোধহয় সকলেই নেমন্তন্নর পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফিরে যেতে চান আর কি। চেয়ার টেবিলের কোন ব্যবস্থা নেই। বিশাল গদির ওপর ধপধপে চাদর পাতা সার্বেক ব্যবস্থা। কোলের ওপর তাকিয়া তুলে নিয়ে অতিথিরা এক একটি বৃত্ত সৃষ্টি করে গল্প-গুজব করছেন।

প্রলয়কে দেখে সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন।

ঠাকুরসাহাব একটু হেলে বসে সিগারেট টানছিলেন। ওকে দেখে মৃদু হাসলেন।

হাসি ফিরিয়ে দিয়ে শ্রীকান্ত দত্ত ও ডাঃ ঘোষালের মাঝখানে বসে পড়ল প্রলয়। একটা জিনিস ও এখানে এসেই লক্ষ্য করেছিল। ঘরে বন্দুকের ছড়াছড়ি। রণসাজে সজ্জিত হয়ে সকলে নেমতন্ন রক্ষা করতে এসেছেন—এ এক বিচিত্র দৃশ্য!

ডাঃ ঘোষাল বললেন, আপনি বন্দুক আনেননি?

আমার তো বন্দুক নেই? কি ব্যাপার বলুন তো? ঘরে যেন বন্দুকের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—

আপনি জানেন না কিছু?

কি হয়েছে?

কয়েকদিন থেকে এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সকলেই তাই একটু সতর্ক হয়ে থাকতে চান।

বলেন কি? আমি তো কিছুই জানি না।

ঘরের গুঞ্জনধ্বনি ছাপিয়ে এবার বিশাল বপু দারোগার বাজখাঁই গলা শুনতে পাওয়া গেল: আপনারা বাঘটাকে মেরে ফেলার তো কোন চেষ্টাই করছেন না। আমি এস. পি. সাহেবকে খবর পাঠিয়েছিলাম, তিনিও তো চুপচাপই রয়ে গেলেন।

চেষ্টা চলছে—

ঠাকুরসাহাব বললেন, আমার লোকই ওটাকে শেষ করবে।

সুদর্শন বলল, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, বাঘটা এত গোলমাল করে বেড়ালেও তাকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি।

হাসতে হাসতে শ্রীকান্ত বললেন, বাঘ দেখার জন্য রাতে-বেরাতে লণ্ঠন হাতে করে কে আর ঘুরে বেড়াবে বলুন ?

দারোগা বললেন, আমি কিন্তু একটা কথা কয়েকদিন থেকে ভাবছি। পাহাড় থেকে পাথর খসিয়ে আনার জন্য প্রত্যহ ডিনামাইট চার্জ করা হয়। তার প্রচণ্ড শব্দে জন্তুদের তো এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাবার কথা। অথচ এই ব্যাঘ্রপ্রবর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এখানে বিরাজ করছে !

সুদর্শন বলল, আমার মনে হয়, মানুষের রক্তের স্বাদ পাবার পর বাঘটা সমস্ত ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। অতিথিদের আর বিলম্ব করানো যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করেই সুদর্শন সকলকে আহারের জন্য আহ্বান জানাল। মাটিতে বসে স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা। আজকের এই ভোজের আয়োজন করার পেছনে পাঞ্জাবী ব্যবসাদারটির যে কোন উদ্দেশ্য আছে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ।

সকলে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন।

এবার ফেরার পালা।

কেউ কেউ আবার দু-এক পেগ হুইস্কিও গলায় ঢেলেছেন ইতিমধ্যে। চিন্তিত মনে সিগারেট ধরিয়েছিল প্রলয়। বাঘের ব্যাপারটা তাকে বিশেষ উতলা করে তুলেছে। একলা ফিরতে হবে। মাঝপথে সে যদি দেখা দেয়, তাহলেই তো চিন্তার কথা। অথচ কাউকে সহযাত্রী হবার কথা বলতেও বাধো-বাধো ঠেকছে। যতদূর সম্ভব জোরে জিপ চালাতে হবে। এছাড়া আর উপায় কি ?

ঠাকুরসাহাব পাশে এসে দাঁড়ালেন।

আসুন না, আমরা একটু ওধারে যাই—

কোন কথা না বলে প্রলয় তাঁকে অনুসরণ করল।

সকলের চোখের আড়ালে আসার পর তিনি বললেন, কি স্থির করলেন ?

আমিও ও সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে চাইছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ আপনার বিবেচনা বোধের ওপরই নির্ভর করছে ঠাকুরসাহাব।

কি রকম ?

যে অনুরোধ করেছেন, তা যে রাখা সম্ভব নয়—আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আপনার মত বহুদর্শী ব্যক্তির বুঝতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হয়নি। আমি নিজের কার্যবিধির বাইরে এক-পা'ও বাড়াব না।

কিন্তু আমাকে যে নিজের স্বার্থরক্ষা করতেই হবে সোমবাবু।

বেশ তো। আমার এতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবে আপনার কাছ থেকে আমি একটা ফেবার চাইব—

ফেবার!

আমি বদলির জন্য দরখাস্ত করছি। অনেক তদ্বির করতে হবে। এর জন্য হয়ত দু'মাস লেগে যেতে পারে। এই সময়টুকু আপনাকে আমায় দিতে হবে। আমার জায়গায় যিনি আসবেন, তাঁকে দিয়ে সহজেই হয়ত আপনি কাজ আদায় করে নিতে পারবেন। টাকাটা এখন সঙ্গে নিয়ে আসিনি, কালই ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে।

ঠাকুরসাহাব ভ্রূ-কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আপনি আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভিৎ নাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার অভিজ্ঞতায় কিছু ভেজাল ছিল। নিজের স্বার্থের অনুকূলে টাকা দিয়ে সকলকে আনা যায় না। আপনাকে বদলির চেষ্টা করতে হবে না। যা হয় রিপোর্ট দেবেন। আমি পাটনা থেকে নিজের সুবিধা কেনার ব্যবস্থা করছি।

ধন্যবাদ ঠাকুরসাহাব।

আমার কথা শুনে আপনি বোধহয় অবাক হয়ে যাচ্ছেন? সেদিন এত চাপাচাপি করছিলাম, অথচ আজ আপনার কথা নির্বিবাদে মেনে নিলাম! আসল কথা কি জানেন, আমি লোক খুব খারাপ নই। দশজনে আমাকে খারাপ বলে।…যাক, আর আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখব না, রাত বাড়ছে। আপনি এবার বেরিয়ে পড়ুন।

ছায়াচ্ছন্ন মনে প্রলয় আবার সকলের মধ্যে ফিরে এল।

একসঙ্গে অনেকেই ওর মুখের দিকে তাকালেন। অস্বস্তি ওর শরীরটাকে পাক দিতে আরম্ভ করল।

সুদর্শন অরোরা বলল, আপনি স্যার রাতটা আজ আমার এখানেই থেকে যান। পথ-ঘাট ভাল নয়, সঙ্গে আবার বন্দুকও নেই—

প্রলয় দ্রুত গলায় বলল, কিচ্ছু হবে না। আমি বেশ চলে যেতে পারব।

সিরাজ মল্লিক কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল। এবার বলল, আমাকে নিয়ে যাবার লোক নেই স্যার। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

তাহলে তো ভালই হয়। চলুন।

দারোগা রাজেশ সিনহা বললেন, মাস্টারমশাই, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিন। আমরাও এবার ফিরব।

শ্রীকান্ত ডাঃ ঘোষালকে ইশারায় কাছে ডেকে নিলেন।

দারোগা আবার বললেন, ঠাকুরসাহাব, যাচ্ছেন নাকি? কাল হয়ত আপনার ওখানে যেতে পারি—

কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই?

একটা এনকোয়ারি নিয়েই যাব। আপনার ডায়নামো-মিস্ত্রি অপঘাতে

মারা গেছে। পুলিশকে না জানিয়ে তার মৃতদেহ সৎকার করে দেওয়া ঠিক আইনসম্মত নয়—

তীক্ষ্ন গলায় ঠাকুরসাহাব বললেন, আপনাদের আইনকে যে আমি গ্রাহ্য করি না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ তো পেয়েছেন। কোন বাঁকা মতলব নিয়ে আমার হাবেলির চৌহদ্দির মধ্যে গেলে বিপদে পড়বেন। বাঘের আক্রমণে বিনোদ মারা গেছে, এই হল শেষ কথা !

তাঁর মুখের দিকে প্রলয় তাকাল। ঠাকুরসাহাবের এখন অন্য রূপ। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে এই অবস্থা উপভোগ করা শোভন নয়। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এল প্রলয়। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এখন বড় বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। এখন তো আকাশে চাঁদ থাকবার কথা। প্রলয় ওপরের দিকে মুখ তুলতেই দেখল, চাঁদের পরিবর্তে আকাশে মেঘের ঘনঘটা।

বৃষ্টি এল বলে।

প্রলয় চিন্তিত হয়ে পড়ল। জিপের হুড নেই। বৃষ্টি আরম্ভ হলে আর দেখতে হবে না। এই রকম জমজমাট ঠাণ্ডা, তার ওপর যদি কাকভেজা ভিজতে হয়, তাহলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া। সিরাজ মল্লিকও এসে পড়েছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সেও ভিত হয়ে পড়ল।

ভীষণ বৃষ্টি আসছে স্যার !

তাই তো মনে হয়। আর দেরি নয়, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া ভাল।

চাবিটা আমায় দিন। একটা শর্টকাট রাস্তা আমি জানি। ওই দিক দিয়ে গেলে সেমাপুর তাড়াতাড়ি পেঁছে যাব।

প্রলয় আপত্তি করল না। গাড়িতে স্টার্ট দিল সিরাজ মল্লিক।

জিপ শ' দুয়েক গজ সোজা যাবার পরই বাঁক নিল ডানদিকে। পিচঢালা রাস্তা এটা নয়। শুধু মাত্র পাথর পাতা, কিছুটা সরুও। বেশ ঝাঁকুনি লাগছে। হাওয়ার বেগ আরো বেড়ে গেছে। মেঘ হয়ত উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বৃথা আশা। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। সিরাজ মল্লিক গতি বাড়িয়ে দিলেও, এই শোচনীয় রাস্তার ওপর দিয়ে দুর্বার বেগে জিপ ছুটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

হেড লাইটের আলো আর বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত নয়। বৃষ্টির দরুণ সামনের দিকটা ঝাপসা মনে হচ্ছে। পুরু গরম কাপড়ে দুজনের শরীর মোড়া। তবু এখন ঠাণ্ডা হাড়ে হাড়ে দাঁত বসাচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রলয় আগে কখনো পড়েনি।

ক্রমেই মন ভারি হয়ে উঠছে লক্ষ্য করেই প্রলয় কথা আরম্ভ করল : আমি স্টিয়ারিং ধরব কি ?

না, না, ঠিক আছে। এখন মনে হচ্ছে, শর্টকাট করতে না গেলেই ভাল

হত। সেই তো ভিজলামই। এই রাস্তাটা যে এত খারাপ আগে ভাবতে পারিনি।

এই এবড়ো-খেবড়ো পথ আর কতটা আছে?

আর বেশি নয়।

ঠিক এই সময়—

গম্ভীর অথচ তীক্ষ্ন চিৎকারে চারধার কেঁপে উঠল। এ এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। বাঘের গর্জন যে এমন রক্ত জল-করা হতে পারে, প্রলয়ের ধারণার অতীত ছিল। তার শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে কি যেন দ্রুত নেমে চলেছে। কোনরকমে সে বলল, যতদূর সম্ভব স্পীড বাড়িয়ে দিন!

সিরাজ মল্লিকের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। স্টিয়ারিং ঠিক রাখা তখন তার পক্ষে কষ্টকর। আবার সেই ক্রুদ্ধ হুংকার! এরপর যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটল। অসম্ভব নার্ভাস হয়ে-পড়া মল্লিকের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিল না—

জিপ একটা টাল অবশ্য সামলে নিল। কিন্তু তারপরই মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল একটা গাছের গায়ে। প্রলয় কিছু একটা ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। শরীর ছিটকে পড়ল। তারপর অন্ধকার···চারধার অন্ধকার···

তখনো অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

ধীরে ধীরে প্রলয় চোখ মেলল। চারধারের অন্ধকারকে যেন ছুরি দিয়ে কাটা যায়। গায়ে অসম্ভব ব্যথা। প্রলয় অনুভব করল, জল-কাদার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে সে পড়ে আছে। মরেনি তাহলে! এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট এড়িয়ে যেতে পেরেছে!

কিন্তু সিরাজ মল্লিকের কি হল?

সেও কি তারই মত আহত অবস্থায় বেঁচে আছে? না, আঘাত আরো গুরুতর হওয়ায় মারা গেছে? প্রলয় উঠে বসল। মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করছে। শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়েছে বোধহয়, তাই এত দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে।

কিন্তু এখানে চুপচাপ বসে থাকা চলতে পারে না। শরীরে যত দুর্বলতাই থাক, কোনরকমে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরীরের পরিচর্যা করা দরকার। তাছাড়া সেই হিংস্র জন্তুটা হয়ত এখনও শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাতের কাছে যে গাছটা ছিল, সেটা নির্ভর করেই প্রলয় উঠে দাঁড়াল। দুর্বলতা ছাড়া প্রবল যন্ত্রণা বোধ তো ছিলই, এবার ঠাণ্ডার অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। এবার চমকাতেই ভালভাবে লক্ষ্য করল, জংলা জায়গার মধ্যে রয়েছে।

ঘন না হলেও ঝোপঝাড় চারধারে। বড় বড় গাছও রয়েছে প্রচুর। এখন মীরপুর এলাকার মধ্যেই রয়েছে, না আর কোথাও—প্রলয় স্থির করতে পারল

না। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, এরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে যে মানুষ বাস্তবেও পড়ে, প্রলয় এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

লক্ষ্যহীন ভাবে নিজের প্রায় বিকল হয়ে যাওয়া শরীরকে কোনরকমে টেনে নিয়ে চলল। গাছপালার সঙ্গে প্রতিক্ষেত্রেই ধাক্কা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে। মন্দের ভাল, বাঘের সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। জন্তুটা হয়ত এখন এ তল্লাটে নেই।

কতক্ষণ নিজের শরীরকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, প্রলয় জানে না। তবে বিদ্যুতের ঝলকানির দৌলতে এটুকু বুঝতে পেরেছে, ঝোপঝাড় আর গাছ-পালার বাধা তেমন নেই। ক্রমেই গিয়ে পড়ছে পরিষ্কার জায়গার মধ্যে। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ল কি?

আশা মনকে দ্রুত নাড়া দিতে লাগল।

কাছেই কোথাও আছে আশ্রয়।

প্রলয় যতদূর সম্ভব নিজেকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। চারধার ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। জঙ্গল আর নেই বললেই চলে। বৃষ্টির জন্য চারধার অসম্ভব ঝাপসা হয়ে আছে, নইলে দেখা যেত কাছাকাছি কোন বাড়িঘর আছে কিনা।

বিদ্যুৎ অবশ্য আগেকার মতই চমকে চলেছে। তবে তার আলোয় অদূরের কিছু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এই সময় বাজ পড়ল কোথাও। আগেও পড়েছে কয়েকবার। প্রলয় টলতে টলতে কাদায় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইচ্ছে করছে জুতো জোড়া খুলে ফেলে দেয়। ভিজে ভিজে অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময় কিসের সঙ্গে পা আটকে যাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রলয়। আহত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণধার ছোরা যেন কেউ নির্মম হাতে টেনে দিল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। মরা মানুষের মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর কোনরকমে উঠে বসতে হল ওকে। বেশিক্ষণ পড়ে থাকলে চলবে না। যত কষ্টই হোক, আশ্রয়ের সন্ধান করা দরকার।

উঠে দাঁড়াবার সময় এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হল প্রলয়কে। যার সঙ্গে পা আটকে পড়ে গিয়েছিল, তার ওপর হাত পড়তেই চমকে উঠল। কোন গাছের ভেঙে পড়া ডাল নয়—মানুষের দেহ। সিরাজ মল্লিক কি? কিন্তু দুর্ঘটনাস্থল থেকে এত দূরে এসে পড়বে কিভাবে?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল তখুনি।

বিদ্যুৎ চমকাতেই প্রলয় দেখল, যে পড়ে আছে সে সিরাজ মল্লিক নয়। এক অচেনা পুরুষ। অহিংসার মুখ ও লম্বাটে চেহারা। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ চমকাতেই চরম সত্যটা উপলব্ধি করা গেল। লোকটার পেটে ছোরা বিঁধে রয়েছে। ছোরার ধারালো অংশের সবটাই অদৃশ্য, শুধু কালচে রঙের বাট

বেরিয়ে রয়েছে বাইরে।

নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড।

আর এক সেকেণ্ড এখানে অপেক্ষা করা চলে না। প্রলয় নির্মমভাবে নিজের শরীরকে টেনে নিয়ে চলল। চলতে আর পারছে না! কিন্তু উপায় নেই। মাথার মধ্যেকার ঝিমঝিমে ভাবটা আরো দ্রুত হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

কতক্ষণ ধরে, কতটা পথ প্রলয় এগিয়েছে জানে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, আর পারবে না। প্রতিবারেই পা টলে যাচ্ছে। আশার কথা এইটুকুই, অদূরে আলো দেখা যাচ্ছে। আলো কাঁপছে, কুপি বা মোমবাতির হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে প্রলয় পৌঁছতে পারল না। এতটা পথ অপরিসীম শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে আসতে পেরেছে, কিন্তু আর কয়েক গজ পারল না। ফুরিয়ে গেল সমস্ত শক্তি। পা দুমড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

ধীরে ধীরে প্রলয় চোখ খুলল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল জানে না। আশ্চর্যের বিষয়, কাদার ওপর নয়, বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। ভেজা প্যাণ্ট পরণে থাকলেও, গায়ের জামা-কাপড় নেই। এখানে ওখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শরীর ঢেকে দেওয়া হয়েছে, কাঁচা পশমের তৈরি মোটা কম্বল দিয়ে।

শরীরে যন্ত্রণা বোধ থাকলেও, তার ওপর বিস্ময় প্রভাব বিস্তার করল। কোথায় শুয়ে আছে—কারা ওকে এখানে নিয়ে এল? শব্দ শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আগেকার মতই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। খাপরা দিয়ে চাল-ছাওয়া ঘরের চারধারটা প্রলয় একবার দেখে নেবার চেষ্টা করল।

একটা টেবিলের সামনা-সামনি দুটো চেয়ার, দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো বুককেস, আসবাব বলতে এই আছে ঘরে। সব মিলিয়ে দীনতার ছাপই প্রকট। আলোর উৎস হল, টেবিলের ওপরকার মোটা মোমবাতি। ঘরে ও ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

প্রলয় আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

এই সময় একটি মেয়ে এক হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন আর অন্য হাতে গঙ্গামাটির পাত্র নিয়ে প্রবেশ করল। সেই পাত্রে আবার গনগনে আগুন। প্রলয়ের মনে হল, আগে কোথায় দেখেছে মেয়েটিকে। সে আগুন সমেত পাত্র খাটিয়ার তলায় রেখে দিয়ে প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, জ্ঞান হয়েছে আপনার! বাঁচলাম। আমি তো খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম।

আমি এখন কোথায়?

আমার ঘরে।

আপনি—

আমায় চিনতে পারছেন না! আমি তানি।

তানি!!

মানে…তানিমা। কয়েকদিন আগে মাইনের ব্যাপারে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, মনে পড়ছে না?

আপনি এখানেই থাকেন?

এটা তো মীরপুর। এখানেই তো স্কুল। এখানেই থাকি।

প্রলয় ভেবে পেল না, শিক্ষিকা তানিমা কিভাবে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। সে কি এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! তাছাড়া তার মত মেয়ের পক্ষে পুরুষের ভারি দেহ একা বয়ে আনা কি সম্ভব? ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে।

কি হয়েছিল, বলুন তো? শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। ওইভাবে পড়েছিলেন জল-কাদার মধ্যে?

জিপ দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমায় দেখতে পেলেন কিভাবে?

তানি যা বলল তার সারমর্ম হল, এই বাড়ির দুটি ঘর নিয়ে সে থাকে। বাকি অংশে বাস করেন গৃহকর্তা ঝা-জী। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলেপুলে নেই। বর্তমানে স্ত্রীও গেছেন বিশ্বনাথ দর্শনে। ওঁর অনেকগুলি ভেড়া আছে। প্রলয় যে কম্বল গায়ে দিয়ে আছে—ওর ভেড়াদের লোমেই বাড়িতে বোনা।

ঝা-জীর দুটো ভেড়া খোঁয়াড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দুটোকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলেন উনি বৃষ্টির মধ্যে। ভেড়া খুঁজতে খুঁজতেই উনি প্রলয়কে পড়ে থাকতে দেখেন। একজন ভদ্র চেহারার লোককে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন ঝা-জী। ছুটতে ছুটতে তানিকে এসে সংবাদ দেন। তানি অনেক কৌতূহল নিয়ে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই প্রলয়কে চিনতে পেরে হতবাক হয়ে যায়। কাছাকাছি আর কোন বাড়ি নেই, লোকজন সহজে পাওয়া যাবে না। ওরা দুজনেই অনেক পরিশ্রম করে প্রলয়ের দেহ এখানে বয়ে এনেছে।

আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আপনারা না এসে পড়লে হয়ত আমি মরেই যেতাম। ওখানে কিন্তু আমার সঙ্গী পড়েছিল, লক্ষ্য করেননি।

কই, না তো!

একটু চিন্তা করে প্রলয় বলল, আমারই ভুল। আমি তো সেখান থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলাম। কিভাবে আপনারা দেখবেন?

আপনার কোন সঙ্গী?

না, না, আমি তাকে চিনি না। লোকটা মরে পড়ে আছে। কেউ তাকে ছোরা মেরেছে।

কি সর্বনাশ! একজন খুন হয়ে পড়ে আছে?

আমি তো তাই দেখেছি।

এরপর মিনিটখানেক দুজনেই চুপচাপ। তারপর তানি বলল, ওকথা এখন থাক, কাল সকালে খোঁজ নিয়ে দেখলেই চলবে। আপনি ভিজে প্যাণ্ট পরে আছেন। এবার ছেড়ে ফেলুন।

পরার কিছু তো নেই। মানে…

আপনাকে দেওয়ার মত আমার কাছেও কিছু নেই। একটা শাড়ি দিচ্ছি। ওটা জড়িয়েই রাতটা কাটিয়ে দিন। আগুনে সেঁকে আমি প্যাণ্টটা শুকোবার ব্যবস্থা করছি।

তানিমাদেবী—

আমাকে তানি বলুন। আপনি নয়, তুমি। সবদিক দিয়েই আপনার চেয়ে আমি ছোট। কি বলছিলেন?

আমার জন্য কি দারুণ অসুবিধা…

আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। তাছাড়া আপনাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব না—তা কি হয়!

কথা শেষ করেই তানি পাশের ঘর থেকে একটা শাড়ি এনে দিল।

আমি বাইরে যাচ্ছি। কাপড় বদলে নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। এখন আপনার ঘুমের দরকার। খাটিয়ার তলায় ঘুরা জ্বালা আছে। ঘর গরম হয়ে উঠছে ক্রমেই। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

তানি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, নিজের যন্ত্রণাকাতর শরীরের কথা ভুলে ওই মেয়েটির কথাই ভাবতে লাগল। সময়মত সাহায্যের পসরা নিয়ে উপস্থিত হতে না পারলে ও কি বাঁচত? নব-পরিচিতের প্রতি এমন আন্তরিক ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে মেশবার কতটুকু সুযোগই বা পেয়েছে প্রলয়?

সকাল হবার পর বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

আকাশ অবশ্য পরিষ্কার হয়নি। ভারি মেঘের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কাঁচা শাক-সব্জী নিয়ে প্রতিদিন যারা মীরপুর থেকে সেমাপুর স্টেশনের সামনে বাজার বসায়, তারাই প্রথমে মৃতদেহ দেখতে পেল। দেহের অর্ধেকটা কাদার মধ্যে তলিয়ে গেছে। মরার আগে চরম আতঙ্কে যে শিউরে উঠেছিল লোকটি, মুখের দিকে তাকালে এখনো বুঝতে পারা যায়।

যারা মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, স্বাভাবিক কারণেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল তারা। কেউ কেউ চুপচাপ সরে পড়বার পরামর্শই দিল। কিন্তু প্রবীণদের মত হল, এখুনি পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার। শেষ পর্যন্ত ওই মতই গৃহীত হল। থানা এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। দুজন ছুটল খবর দিতে, বাকিরা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে নানা গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগল।

গতকাল দারোগা রাজেশ সিনহা গভীর রাতে বাসায় ফিরেছেন, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ওই অঞ্চলে রাতের আমন্ত্রণ আর গ্রহণ করবেন না। সুদর্শন অরোরার ওখান থেকে ফেরার পথে যখন জলে ভিজে গোবর হয়ে গিয়েছেন, তখনই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল বাঘের ডাক।

পিলে চমকে উঠেছিল সেমাপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগার। তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। ডাঃ ঘোষাল ও শ্রীকান্ত দত্তও সঙ্গে ছিলেন। থাকলে কি হবে, বাঘ মুখোমুখি হলে, তাঁর নধরকান্তির দিকে আগে যে দৃষ্টি দিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! ভাগ্যক্রমে সে রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

থানা-লাগোয়াই তাঁর বাসা। মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেই বিছানায় লম্বা হয়েছিলেন। বেলা বারোটার আগে ঘুম থেকে উঠবেন না, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। তা আর হল কই! ডাকাডাকির চোটে আটটার সময়ই উঠে থানায় আসতে হল। এসেই শুনলেন, মীরপুরের জঙ্গলের ধারের মাঠটায় একটা ডেডবডি পড়ে আছে। লোকটাকে নাকি চেনা যাচ্ছে না।

অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায়, এমনিতেই রাজেশ সিনহার মনটা খিঁচড়ে ছিল, তার ওপর এই সাত সকালে খুনের কেস এসে উপস্থিত হওয়ায় একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু উপায় নেই, এনকোয়ারিতে যেতেই হবে। খান সাতেক লাড্ডু আর তিন কাপ চা উদরস্থ করার পর কিছুটা ঠাণ্ডা হলেন তিনি। তারপর আরো ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে, ধড়াচূড়া চাপিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরোলেন।

দুর্ঘটনাস্থলে প্রায় বারোটার সময় দারোগা সাহেব পেঁছিলেন। তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। মীরপুর প্রায় ভেঙে পড়েছে। রাজেশ সিনহা হুঙ্কার ছাড়তেই জনতা দূরে সরে গেল। মৃতদেহ তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। মৃতব্যক্তিকে কোথাও আগে দেখেছেন বলে মনে হল না।

পথে অবশ্য আরেক দৃশ্য তিনি দেখে এসেছেন।

একটা জিপ গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে আছে। দেখেই চিনেছেন, জিপখানা বি. ডি. ও. র। কিন্তু প্রলয়ের দেখা তিনি পাননি। বাঘে নিয়ে গেল কিনা কে জানে! তবে আহত অবস্থায় সিরাজ মল্লিককে পেয়েছেন। বেচারা তখনও অজ্ঞান। আশু চিকিৎসার জন্য তাকে ডাঃ ঘোষালের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছেন।

গ্রামের মাতব্বর গোছের কয়েকজনকে ডেকে কথাবার্তা বললেন রাজেশ। রহস্যময় খুন সম্পর্কে মূল্যবান কোন সূত্র পাওয়া গেল না। শুধু এইটুকু জানা গেল, মৃতব্যক্তিকে কেউ ঠাকুরসাহাবের হাবেলি থেকে মাঝে মাঝে বেরোতে দেখেছে। মনে হয় লোকটি ওখানেই থাকত।

ঠাকুরসাহাব! দাঁতে দাঁত ঘষলেন রাজেশ সিনহা। বেআইনী কাজকর্মের রাজা। গতকাল সুদর্শন অরোরার ওখানে ওই ব্যক্তি যেভাবে তাঁকে অপমান

করেছে, তা তিনি জীবনে ভুলবেন না। একজন কনস্টেবলকে দৌড় করিয়ে দিলেন মীর্জা হাবেলির দিকে। ওখান থেকে কেউ এসে দেখুক, মৃতব্যক্তি সত্যি তাদের পরিচিত কিনা।

এত সমস্ত করে সোমাপুরের দারোগা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। এদিক-ওদিক তাকাতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল অদূরের খাপরায় ছাওয়া একটি বাড়ির ওপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। দাওয়ায় কিছুটা ঔৎসুক্য নিয়েই দাঁড়িয়েছিল তানি। পুলিশ এসে গেছে। এবার হয়ত জানা যাবে, কে খুন হল।

তানিকে দারোগাসাহেব বিলক্ষণ চেনেন। আরো অনেকের মত এই মেয়েটিকে দেখলে তাঁর মনের মধ্যেও মোচড় দিয়ে ওঠে। এখানে ওখানে কয়েকবার কথা বলার সময় ইসারাও করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এখন তানিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ছুঁড়িটা এখানেই থাকে, কে জানত!

কি খবর, ভাল তো? এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

মাইনর স্কুলের মাস্টারনিকে আবার আপনি সম্বোধন করবেন কি!

এই দারোগা কি বস্তু তানি তা ভালভাবেই বোঝে।

শান্ত গলায় বলল, আমার এখানে চায়ের পাট নেই।

নেই নাকি? কি আশ্চর্য! তাহলে একটা চেয়ার এনে দাও, খানিক বসি।

এক্সট্রা চেয়ার কোথা থেকে পাব?

এবার বিলক্ষণ বিরক্ত হলেন দারোগা।

আমাকে খুশী করার জন্য লোকে কত ব্যস্ত থাকে, তা বোধহয় তুমি জানো না?

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দাওয়ার কোণের দিকে। সেখানে কিছু রক্তমাখা নেকড়া জমা করা ছিল। ব্যাপারখানা কি? ওগুলির উপস্থিতি বেশ সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

রক্তমাখা কাপড় পড়ে আছে কেন ওখানে?

ওই কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান মোছা হয়েছিল।

কার ক্ষতস্থান? সেই আহত ব্যক্তি ঘরে আছে নাকি?

তানি বাধা দেবার আগেই রাজেশ সিনহা প্রায় লাফ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সেখানেও তাঁর জন্য কম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল না। প্রলয়ের দুর্বল শরীর বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ছিল।

সোমবাবু, আপনি এখানে?

সে অনেক কথা দারোগাবাবু। ডাক্তার ঘোষালকে সকালেই খবর পাঠানো হয়েছে। তিনি এখনও কেন আসছেন না বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। সাইকেলে একজন কনস্টেবলকে তাঁর কাছে পাঠান না!

ডাক্তার কি করবে! মিষ্টি হাতের সেবা পাচ্ছেন, ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? কৌতূহল দমন করা ক্রমেই আমার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠছে।

বসুন। বলছি।

মীর্জা হাবেলিতে তখন প্রচুর সোরগোল।

গত সন্ধ্যা থেকে দিবাকরকে পাওয়া যাচ্ছে না। নৈশ আহারের সময় তার অনুপস্থিতি হেমাবতীকে সচকিত করে তোলে। সে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখে দিবাকর ঘরে নেই। রাত্রে হাবেলি ছেড়ে বাইরে পা দেবার তো কথা নয়! বিশেষত বাঘের উপদ্রব যখন চলেছে।

ঠাকুরসাহাব নিমন্ত্রণ সেরে ফিরতেই শুনলেন ব্যাপারটা।

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, ব্যাপারটা কিছু বুঝছ?

হেমাবতী বলল, আমার তো খুব চিন্তা হচ্ছে। কোথায় যে গেল?

শেষ তুমি তাকে কখন দেখেছ?

আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেলা তিনটের সময়। তবে মুনিমজী নাকি ওকে বেলা পাঁচটার পরও দেখেছেন।

উড়ো চিঠিটার কথা ওকে বলা তোমার ঠিক হয়নি। ভয় পেয়ে গিয়ে হয়ত পাকাপোক্ত ভাবেই নাগিনা সিংয়ের কাছে চলে গেল। গিয়ে যদি থাকে, তবে যাক। অমন লোকের আমাদের হাবেলি থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কি বিশ্রী ব্যাপার বল তো? ভাবতেও খারাপ লাগছে, ও আমার আত্মীয়।

স্ত্রীর মনের ভাব বুঝছিলেন ঠাকুরসাহাব। তাকে সান্ত্বনাসূচক দু-চার কথা বলে, বাইরের মহলের দিকে গেলেন। দিবাকর কোথায় গেল, এখন তাঁর নিশ্চিতভাবে জানা দরকার।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। রাত হয়েছে। ঠাকুরসাহাব বাইরের মহলের দিকে গেছেন, এখুনি ফিরে আসবেন। হেমাবতী নিজের ঘরের দিকে যাবার পথে দিবাকরের দরজার সামনে থামল। কি খেয়াল হতে বন্ধ দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভেতরে।

ডায়নামো চালু রয়েছে। কাজেই সুইচ টিপতেই আলো জ্বলল। টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল হেমাবতী। কাজে আসে এমন চিঠি বা ওই জাতীয় আর কিছু চোখে পড়ল না। হঠাৎ তার নজর খাটের এক জায়গায় আটকে গেল।

ওখানে কি যেন চকচক করছে!

এগিয়ে গিয়ে বস্তুটা হাতে তুলে নিতেই হেমাবতী অবাক হয়ে গেল। তারই জোড়া ভাঙা একটি কানের গয়না। জোড়ার আরেকটি কোথায়? তাছাড়া এই

গয়না এখানে এল কিভাবে? এখানে ওখানে গয়না ছড়িয়ে রাখা তো তার স্বভাব নয়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনের মধ্যে উদয় হতেই হেমাবতী নিজের ঘরের দিকে ছুটল।

খাটের ওপর দিকে দেওয়াল ঘেঁষে মেহগনি কাঠের আলমারি দাঁড় করানো। কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে, চাবি বেছে গা-তালাতে লাগাতে গিয়েই বুঝতে পারা গেল আলমারি খোলা। টানতেই পাল্লা সরে এল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই—গয়নার বাক্স নেই।

গয়নার সিংহভাগ অবশ্য মুঙ্গেরের ব্যাংকে জমা আছে। নিয়মিত ব্যবহারের জন্য কিছু গয়না এখানে ছিল। যা ছিল, তার দাম হাজার ত্রিশেক টাকার কম হবে না। এত টাকার গয়না হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

এক অদ্ভুত অনুভূতি হেমাবতীর মনের মধ্যে চিনচিন করে উঠল। হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। দিবাকর গয়নার বাক্স চুরি করে এখান থেকে পালিয়েছে। কি লজ্জার কথা! এই হীন কাজের নায়ক তারই ভাই! এখন সে মুখ দেখাবে কিভাবে? আলমারির কাছ থেকে সরে এসে বিছানার ওপর বসে পড়ল হেমাবতী।

বসে রইল কাঠ হয়ে। এখুনি ঠাকুরসাহাব ফিরে আসবেন। যত লজ্জাকর ব্যাপারই হোক, তাঁকে খুলে বলতে হবে সমস্ত। তিনি যদি পুলিশে খবর দিয়ে দিবাকরকে বামাল সমেত ধরবার জন্য সচেষ্ট হন, হেমাবতী তাতে বাধা দেবে না। কঠোর শাস্তি তার পাওয়া দরকার।

নিজের বসার ঘরে মন্থর পায়ে পায়চারি করছিলেন ঠাকুরসাহাব। কিছুক্ষণ আগে দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করেছেন। এখন সাড়ে বারোটা। গতকালই গয়না চুরির কথা জানতে পেরেছেন। দিবাকর যে এত নিচে নামবে ভাবতে পারেননি। লোভ অবশ্য মানুষকে দিয়ে সবই করিয়ে নেয়। পুলিশে খবর দিতে পারতেন। দেননি। কেলেংকারি বাড়িয়ে লাভ কি?

কৈলাসপতি দরজার সামনে দেখা দিলেন।

মুনিমজী, কিছু বলবেন?

দারোগাসাহেবের চিঠি নিয়ে একজন এসেছে হুজুর।

দেখি।

কৈলাসপতি চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন।

কয়েক ছত্র মাত্র লেখা। চোখ বুলিয়ে নিয়েই ঠাকুরসাহাব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। মীরপুরের শেষপ্রান্তে অজ্ঞাত পরিচয় একটি যুবক খুন হয়েছে। তার পরিচয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্য হাবেলির একজন কর্মচারীকে আহ্বান জানিয়েছেন দারোগা।

চিঠির বিষয়বস্তু কৈলাসপতির অজ্ঞাত নয়।

ঠাকুরসাহাব মুখ তুলতেই তিনি বললেন, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি ঘরে আসতে পারি হুজুর।

আমিই যাব। জিপটা বার করতে বলুন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ঠাকুরসাহাব ঘটনাস্থলে পেঁছিলেন।

আশপাশের গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক এসে জড়ো হয়েছে। পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে তাদের মৃতদেহের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে। রাজেশ সিনহা তানির ওখান থেকে বেরিয়ে গম্ভীর মুখে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নানা চিন্তা এখন তাঁকে বেশ বিচলিত রেখেছে।

জিপ থেকে নেমে ঠাকুরসাহাব কয়েক পা এগিয়েছেন মাত্র—মৃতদেহের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন। না, তিনি ভুল দেখেননি, দিবাকরের বীভৎস মৃতদেহই ওখানে পড়ে রয়েছে। ওর জীবনের পরিণতি যে এত করুণ হবে আগে কে জানত? হেমাবতীর গয়নার বাক্স তবে কি হত্যাকারী ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে?

সিনহা এগিয়ে এলেন।

আপনি একে চিনতে পারছেন?

আমার শ্যালক।

ধাক্কা খেলেন সেমাপুরের দারোগা। এরকম উত্তর আশা করেননি।

বলেন কি? আপনার শ্যালক···

খুন হয়ে পড়ে রয়েছে দেখছি তো। আর দশটা কেসের মত চেপে না গিয়ে এ ব্যাপারে একটু গা ঘামাবেন আশা করছি।

এ আপনি কি বলছেন? প্রতিটি কেসের ওপরই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

খুবই ভাল কথা। তবে দিবাকরের হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে, আমার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ব্যাপার তখন অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। আই-জি'র কানে ওঠাও অসম্ভব নয়।

ঠাকুরসাহাব জিপে গিয়ে বসলেন।

আপনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, এখন আমায় যেতে হচ্ছে। আপনার যদি দিবাকর সম্পর্কে কিছু জানবার থাকে, হাবেলিতে আসবেন।

এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে জিপ বেরিয়ে গেল।

অপমানে সারা শরীর জ্বলতে থাকল রাজেশ সিনহার। ওই দাম্ভিক লোকটিকে একবার বাগে পেলে হয়। গুম হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি আবার চনমনে হলেন। মৃতদেহ সদরে পাঠাতে হবে পোস্টমর্টেমের জন্য—তার ঝামেলা অনেক। তিনি হাঁকডাক আরম্ভ করলেন।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় ডাঃ ঘোষাল এলেন।

প্রলয় বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিল। ব্যথায় সমস্ত শরীর টনটন করছে। জ্বরও হয়েছে মনে হয়। ওর জন্য তানির ব্যস্ততার সীমা নেই। বৃদ্ধ ঝা-জীও মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছেন।

ডাঃ ঘোষাল একা আসেননি, চিন্তিত মুখে শ্রীকান্তও এসেছেন। কোথা থেকে খবর পেয়ে সুদর্শন অরোরাও পৌঁছে গেছে ওই সময়। তার মুখেও অনুশোচনার ছায়া। ডাঃ ঘোষালের করণীয় সমস্ত কিছু সারতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল।

শ্রীকান্ত প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

ভয়ের কিছু নেই। তবে সময়মত ওষুধপত্র পড়েনি তো, তাই একটু ভোগাবে।

জ্বর আছে নাকি ?

জ্বর একটু হবেই।

তারপর ঘরে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ডাঃ ঘোষাল বললেন, পরিবেশের দিক থেকে এ ঘরখানা অবশ্য খুব ভাল নয়। তবে উপায় নেই। ধকল সহ্য করার মত শরীর আপনার নয়। কয়েকদিন এখানে থাকতে হবে। আমি নিয়মিত এসে দেখে যাব। একটু বল সঞ্চয় হলেই আপনি সেমাপুর যাবেন।

একটু করুণ হেসে প্রলয় বলল, আপনি যা বলবেন, তাই হবে ডাক্তার। শুধু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ভাল করে তুলুন।

সিরাজ মল্লিকের কথাও জানা গেল। গুরুতর অবস্থা তারও নয়। তবুও তাকে সদরে পাঠানো হয়েছে। কারণ তার আঘাত লেগেছে মাথাতে। তানি দরজার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ ঘোষাল তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। রুগীকে কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে তারই উপদেশ দিতে গেলেন বোধহয়।

অনুতপ্ত গলায় সুদর্শন অরোরা বলল, আমারই জন্য আপনার এই দুর্ভোগ। যদি দিনেরবেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতাম, তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা হত না।

শ্রীকান্ত বললেন, সমস্তই গ্রহের ফের। আপনি নিমিত্ত মাত্র।

প্রলয় বলল, মাস্টারমশাই, একটা সিগারেট খাওয়াতে পারেন। ধোঁয়ার জন্য মন আনচান করছে।

কেন পারব না! এই নিন।

চোখ বুজে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রলয় বলল, ডাক্তার ঘোষাল এখন আমায় এখানে ক'দিন ফেলে রাখবেন কে জানে।

যত বেশিদিন রাখেন, ততই তো ভাল। সারা অঞ্চলের লোক যার সঙ্গ পাবার জন্য মাথা কুটোকুটি করছে, আপনি তার প্রাণ ঢালা সেবা পাচ্ছেন। ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে। এত জায়গা থাকতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন

কিনা ঠিক এই বাড়িটারই সামনে।

কথা শেষ করে হাসলেন শ্রীকান্ত দত্ত।

প্রলয় ও অরোরাও হেসে ফেলল।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর ওঁরা উঠলেন। ওষুধপত্রের যথাবিধি ব্যবস্থা করেছেন ডাঃ ঘোষাল। প্রলয় মনে করিয়ে দিল, আগামী সকালেই নিশ্চিত ভাবে যেন কিছু জামা-কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

তানি বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

এক অনাস্বাদিত প্রশান্তিতে প্রলয়ের মন ভবে উঠল। মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ ও পায়নি। কো-এডুকেশন কলেজে অবশ্য লেখাপড়া করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার ইচ্ছে কোনদিন হয়নি। কিন্তু এখন—নাটকীয় ভাবে এই মেয়েটির আশ্রয়ে এসে পড়ার পর সমস্ত কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আপনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন, না?

প্রলয় চমকে উঠল।

না, না, তা নয়।

কেন এত সঙ্কোচ বোধ করছেন আপনি? ভগবানের যা অভিপ্রেত, তাই ঘটেছে। আপনাকে তুলে না আনলে মারা পড়তেন যে!

আপনি যা করেছেন, সে ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না তানিমাদেবী।

তানি বলুন—তানি। কিসের ঋণ? এবই কথা বার বার বলবেন না। আমার ভাল লাগে না।

বেশ। আর বলব না। তবে একটা কথা যে আমার না বলে উপায় নেই।

বলুন—

আপনাকে আমার জন্য অনেক সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

কেন?

বুঝতে পারছেন না! আমি যে পুরুষমানুষ। আপনি নিজের ঘরে আমাকে স্থান দিয়ে ভাল কাজ করেননি।

তানি চুপ করে রইল।

তাছাড়া—

থামলেন কেন?

তাছাড়া আপনার স্বামী এসে পড়তে পারেন। তিনি এই ব্যাপারটাকে কখনই ভাল চোখে দেখবেন না।

তানি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার পায়ের দিকে খাটিয়ার এক কোণে বসল। মুখ ফিরিয়ে ভেজানো জানলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। আচম্বিতেই

যেন গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

শেষে সে-ই নীরবতা ভঙ্গ করল, আমার স্বামী কোনদিন এখানে আসবেন না।

কেন ?

আমার স্বামী নেই।

তবে যে আপনার সিঁথিতে সিঁদুর ?

একে সিঁদুর না বলে, বলুন ঢাল।

ঢাল !

প্রলয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সম্ভ্রম বাঁচিয়ে এই সমস্ত জায়গায় মেয়েদের চাকরি করা যে কত শক্ত, তা কি আপনি বোঝেন না ? চেহারাই আমার কাল হয়েছে। এরপর যদি আমার মাথায় সিঁদুর না থাকত, তাহলে কতকগুলো লোক তো আমায় ছিঁড়ে খেত। তারা কারা আপনিও ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন।

আপনি তবে বিবাহিতা নন ?

সে অনেক কথা।

আপত্তি থাকলে বলবেন না।

এত কথা যখন বললাম, শেষটুকুও বলব আপনাকে।

এরপর তানি যা বলল তার সারমর্ম হল, তাদের সমাজের ব্যবস্থা মত মাত্র এগারো বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর বয়স পনের। স্থির হয়েছিল রুকসাতি (পাকাপাকি ভাবে স্বামীর ঘর করতে যাওয়া) হবে আরো বছর পাঁচেক পরে। তা আর শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিছুদিন পরে কি নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে দারুণ গোলমাল বাধল। পাত্রের বাবা আর কালবিলম্ব না করে অন্যত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তানিরও অন্যত্র বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু ভাল একটি পাত্র খুঁজতে খুঁজতেই মারা গেলেন বাবা। মা ছাড়া আর কেউ রইল না দুনিয়ায়। আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। বিয়ের ব্যাপারটা তখন তোলা রইল। একটু বেশি বয়সেই তানি স্কুলে ভর্তি হল। ম্যাট্রিক পাশ করল যথাসময়। তখনই সে অনুভব করেছিল শ্বশুরবাড়ি যাওয়া চলবে না। তাহলে মাকে দেখবে কে ? তিনি তো না খেতে পেয়ে মারা যাবেন।

চাকরি চাই। টিচার ট্রেনিংটা কোনরকমে সেরে নিয়ে ব্লকের অধীনে যে সমস্ত স্কুল আছে, তাতেই চাকরি পেয়ে গেল। মাইনে কম। তা হোক। দুজনের পেট চলে যাবে। মীরপুরের স্কুলে যোগ দেবার আদেশ পেল তানি। এখানে আসবার আগে একজন বয়স্কা শিক্ষিকা বলেছিলেন, তোমার বয়স অল্প। সাবধানে থেক। ওই সমস্ত জায়গায় নিজেকে ঠিক রাখা কিন্তু শক্ত ব্যাপার।

তানি বাধ্য হয়েই তখন মাথায় সিঁদুর চড়িয়েছে। বিবাহিতা মেয়েদের

সহজে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে না। স্বামী অন্যত্র চাকরি করেন, এই কথাই এখানে প্রচারিত। তিনটি ছেলেমেয়েও আছে—তারা থাকে মা'র কাছে।

নিজের কথা শেষ করে তানি করুণ হাসল।

অধীর মন নিয়ে প্রলয় সমস্ত শুনে গেল। কত ভাবেই না মানুষ নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সবাই কি রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে বিপদের হাত থেকে? এখন কি বলা উচিত প্রলয় ভেবে পেল না। মন ক্রমেই কেমন ভারি হয়ে উঠছে।

কি ভাবছেন?

আপনার কথাই ভাবছি।

বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু এখনো কুমারীই আছি।

অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না।

প্রলয়ের ভারি মন ক্রমেই হাল্কা হয়ে আসছে। দ্রুত চিন্তা করছে এখন কি বলা উচিত। তানি কি চিন্তা করছে সেই জানে। বাইরে থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝিদের ডাকই শুধু নীরবতা ভঙ্গ করে চলেছে।

শেষে—

সিগারেট খাবেন?

ইচ্ছে তো করছে। কিন্তু সিগারেট কই?

মাস্টারসাহাব এক প্যাকেট রেখে গেছেন। এই যে—

প্রলয় একটা সিগারেট দুই ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দেবার পর নিজেদের অসহায়ত্ব অনুভব করল। বাঁ-হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধা। এক হাত দিয়ে দেশলাই ধরানো যায় না। ওর বিব্রত অবস্থা দেখে তানি মৃদু হেসে, দেশলাই জেবলে কাঠিটা এগিয়ে ধরল।

ত্রিলোক নিজের জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর-সাহাবের খাস কামরার সামনে। প্রভু যে কোন মুহূর্তে আদেশ করতে পারেন—এইজন্য একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে।

গদি-মোড়া গড়ানে চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন ঠাকুরসাহাব। অনেকক্ষণ থেকে একই ভাবে বসে তিনি চিন্তা করছেন। চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই দিবাকর। হেমাবতীর গয়নার বাক্স সে নিশ্চয়ই চুরি করেছিল। কিন্তু তাকে খুন করল কে? রহস্য এখানেই গভীরে প্রবেশ করেছে। সমস্ত সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে বিচার করেও সমাধানের কূলে পেঁছিতে পারছেন না।

ত্রিলোক!

মালিক—

ত্রিলোক প্রভুর সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করছি, খুব ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও।

বললেন মালিক—

দিবাকরের গতিবিধি সম্পর্কে তুমি কিছু জানতে ?

আমি কিছুই জানি না।

সেদিন আমি বেরিয়ে যাবার পর তোমার হাতে কোন কাজ ছিল না। তখন তো দিবাকরকে লক্ষ্য করার ভাল সুযোগ পেয়েছিলে।

দিবাকরবাবু তখন ঘরেই ছিলেন মালিক। ঘণ্টাখানেক পরে—তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, দেখলাম তিনি একটা বাক্স হাতে নিয়ে পেছনের বাগানের মধ্যে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন।

দ্রুত গলায় ঠাকুরসাহাব প্রশ্ন করলেন, কত বড় বাক্স ?

হাতখানেক লম্বা স্টিলের বাক্স।

তারপর কি হল ?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি থতমত খেয়ে গেলেন। আমি বললাম, কোথায় চলেছেন বাবু ? হাবেলির বাইরে যাবেন না যেন! সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাঘটা আক্রমণ করে বসতে পারে। তিনি বললেন, কিছুক্ষণের জন্যে হাবেলির বাইরেই যাচ্ছি। ভয় নেই, বাঘ আমায় খাবে না। তারপরই তিনি ছোট দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

হুঁ, আমি এখুনি একবার বেরোব। থানার দিকে যেতে হবে। তুমি রাণীসাহেবাকে গিয়ে বল, তিনি যেন আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে দ্বিপ্রহরের আহার সেরে ঠাকুরসাহাব বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জিপের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরই ত্রিলোক পেছন দিকের বাগানে এসে দাঁড়াল। এখন আর কোন কাজ নেই, তাকে কেউ খুঁজবে না। সতর্ক ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ছোট দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

হাবেলির বাউণ্ডারি ওয়ালের এ-ধারটা ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। তারপরই আরম্ভ হয়েছে বিভিন্ন গাছের শ্রেণী। গায়ে গা লাগিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় পাতার ঘনত্ব সূর্যের আলোকে মাটি স্পর্শ করতে দেয় না।

ত্রিলোকের চলার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় তার বিশেষ যাতায়াত আছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। সামনেই ঢালু ফাঁকা জায়গা। দূরে দূরে গোটা কয়েক খাপরা-ছাওয়া বাড়ি। সবচেয়ে আগে যে বাড়িটি চোখে পড়ছে, সেটা আমাদের পরিচিত। ঝা-জীর বাড়ি, অর্থাৎ যে বাড়িতে তানি ভাড়া থাকে। যেখানে প্রলয় আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সামনের দরজা দিয়ে ত্রিলোক বাড়ির ভেতর ঢুকল না। পেছন দিকের যে অংশে ঝা-জী বাস করেন, সেই দিকে গেল। বৃদ্ধ ঝা-জী তখন সবেমাত্র খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মুখ ধুচ্ছিলেন। ত্রিলোককে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন না। অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সে মাঝে মাঝেই

এখানে আসে।

কি খবর ত্রিলোক?

ত্রিলোক তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আবার আসতে হল। কোন উত্তর এসেছে নাকি?

ঝা-জীও ঘরে প্রবেশ করলেন।

উত্তরের জন্য এত উতলা হচ্ছ কেন? আজকালের মধ্যে সে হয়ত এসে পড়বে।

এসে পড়লেই বাঁচি।

তোমাকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার বল তো?

বিশেষ কিছু নয়। বহুদিন ভাইটার খবর পাইনি। এখানে আসতে খবর পাঠিয়েছি। এলে মনে একটু শান্তি পাই—এই আর কি।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। তারপর ত্রিলোক বিদায় নিল। আগের পথ দিয়েই সে আবার ফিরে চলল হাবেলিতে। সূর্য তখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে একটু হেলেছে।

ওদিকে—

নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল হেমাবতী। গয়না সমেত বাক্সটা চুরি যাওয়ায় সত্যি তার মন খারাপ হয়ে রয়েছে। দিবাকর খুন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সম্ভাব্য চোর হিসেবে সে-ই চিহ্নিত। ঠাকুরসাহাব মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে এ সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক কিছু ভাবছেন। হেমাবতীর কাছে বিষয়টি কম লজ্জার নয়।

রাধিয়া ঘরে প্রবেশ করল। পানের বাটা রেখে চলে যাচ্ছিল। হেমাবতীর খাস পরিচারিকা সে। বছর সতের-র হাস্যমুখী তরুণী। রাধিয়াকে কিছুদিন হল রাঁচি থেকে আনিয়েছে।

কোথায় যাচ্ছিস?

মেথির পাতা তুলে নিয়ে আসি রাণীজী। আপনার হাতে অনেকদিন ফুল তোলা হয়নি।

কোথা থেকে তুলবি? হাবেলির মাধ্যে তো গাছ নেই?

পেছন দিকের পাঁচিলের ওধারে মেথির ঝাড় আছে। ওখান থেকেই তো তুলে আনি।

খাট থেকে নেমে হেমাবতী বলল, চল। আমিও তোর সংগে যাব।

রাধিয়া সবিস্ময়ে বলল, আপনি যাবেন!

চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। ওধারে তো কেউ যায় না। আমি ঘুরে এলে কেউ বুঝতেও পারবে না। চল।

দুজনে অন্দরের সিঁড়ি দিয়েই নিচে নেমে এল। তারপর যে পথ দিয়ে ত্রিলোক বেরিয়েছিল, সেই পথ দিয়েই পাঁচিলের বাইরে এল। পর্দা-প্রথার

ওপর ঠাকুরসাহাবের তেমন কোন দুর্বলতা নেই। ইচ্ছে হলেই স্ত্রীকে সংগে নিয়ে তিনি বেরোন। একবার এধারে এসেছিলেন পাখি শিকার করতে। পায়ে পায়ে সেবার স্বামীর সংগে অনেক দূর চলে গিয়েছিল হেমাবতী।

অযত্নে-বর্ধিত মেথির ঝাড় খুব বেশি দূরে নয়। রাধিয়া পাতা তুলে তুলে কোঁচড়ে জমা করতে লাগল। হেমাবতী নিজের মনকে হাল্কা করার প্রয়াসেই এখানে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এধার ওধার তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল, কাঁটাঝাড়ের ওধারে—আলোছায়ার মধ্যে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পেছন ফিরে থাকার দরুণ তাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। সেও বোধহয় তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারেনি।

চাপা গলায় হেমাবতী বলল, রাধিয়া—

রাণীজী।

ওই দেখ, একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে!

ওমা, তাই তো! ওই দেখুন, চিমসে বুড়োটাও এদিকে আসছে।

হেমাবতী দেখল, হন্তদন্ত হয়ে ত্রিলোক আসছে।

লোকটির কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল।

অসংলগ্ন ভাবে বলল, আ—আপনি···

তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি আজই আপনার কাছে যেতাম। আমার পাওনাটা এবার মিটিয়ে দিন।

আবার কিসের পাওনা? হাবেলি থেকে এক বাক্স গয়না তুমি চুরি করেছ। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।

গয়নার আমি কি জানি! আমার পাওনা মিটিয়ে দিন। নইলে—

মেথি-ঝাড়ের আড়ালে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে আড়ষ্টভাবে সমস্ত কিছু শুনেছে হেমাবতী আর রাধিয়া। এ এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা।

নইলে?

নইলে কি হতে পারে আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! মূর্খ কোথাকার! তোমার ভাগ্য আগেই স্থির হয়ে গেছে। তোমার মত সাক্ষীকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি না।

এবার অসম্ভব বিচলিত হল ত্রিলোক।

আমাকে···আপনারা···

এতক্ষণে তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।

আমার পাওনার দরকার নেই। আমি চাকরি ছেড়ে এখান থেকে চলে যাব।

তা আর হয় না ত্রিলোক। অস্বস্তিকে সাথী করে আমরা দিন কাটাতে পারি না।

এর পর কি ঘটল এরা দেখতে পেল না। ঝটাপটির মৃদু শব্দ—তারপরই চাপা আর্তনাদ। মারাত্মক কিছু নিশ্চয় ঘটল। হেমাবতী আর ওখানে দাঁড়াল

না ! দ্রুতপায়ে হাবেলির দিকে ফিরে চলল। এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপ
নয়। বলা বাহুল্য রাধিয়া তাকে অনুসরণ করেছে।

ছুটে আসার দরুণ হেমাবতী হাঁপাচ্ছিল। ঘরে ফিরেই বিছানায় বসে পড়ল
রাধিয়া বসল চৌকাঠের পাশে। নিজেদের স্বাভাবিক করে তুলতে দুজনে
মিনিট পনের লেগে গেল।

তারপর হেমাবতী বলল, রাধিয়া, তুই মুনিমজীর কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার
খুলে বল। উনি এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দেখুন কি হয়েছে ওখানে।

রাধিয়া দোতলা থেকে নেমে সদরের দিকে চলে গেল।

কৈলাসপতি নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে বসে বই পড়ছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত কো
বই হবে। সমস্ত শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ঘ
থেকে। হাঁকডাক করতেই কয়েকজন এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়
তিনি এগোলেন ঘটনাস্থলের দিকে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখা গেল, কৈলাসপতি নিজের দীঘ
জীবনে এমনটি আর দেখেননি। বীভৎস ব্যাপার। একটা দেবদারু গাছে
মোটা গুঁড়িতে ঠেস দেওয়া অবস্থায় রয়েছে ত্রিলোকের দেহ। কাপড়-জামা র
ভেসে যাচ্ছে। চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে
বুঝতে কষ্ট হয় না।

কৈলাসপতি প্রথমে কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গে
লোকেরাও স্তম্ভিত। অবশ্য বহুদর্শী কৈলাসপতি নিজেকে দ্রুত সামলে
নিলেন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা যে আইনসিদ্ধ
নয়, তা তিনি জানেন। সঙ্গীদের সেখানে পাহারায় রেখে তিনি দ্রুত ফিরে এলে
হাবেলির মধ্যে। থানার দিকে তখুনি লোক রওনা করিয়ে দিলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দারোগা রাজেশ সিনহা দেখা দিলেন। তাঁর বিশাল
বর্তুল মুখে অভ্রভেদী গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। এলাকার মধ্যে পর পর দুটি
খুন হয়ে যাওয়ায়—বিশেষে মীর্জা হাবেলিরই দুজন মারা পড়েছে, এতে
স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত।

যতদূর সম্ভব মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখলেন। ছোরা বা ওই জাতীয় কোন অস্ত্র
দিয়ে তিন জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। আর বেশি কিছু তিনি বুঝতে
পারলেন না। মৃতদেহ আপাতত থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি হাবেলির
মধ্যে এলেন। থানায় ফিরে গিয়ে বডি পোস্টমর্টেমের জন্য চালান দেবেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুরসাহাব ফিরে এসেছেন। কৈলাসপতির মুখ থেকে সমস্ত
শুনে কম বিস্মিত হননি। বিচিত্র ব্যাপার, ত্রিলোকের মত লোকও খুন হয়।
তারপর তিনি অন্দরে চলে গেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে এসে দেখেন,

রাজেশ সিনহা রাধিয়াকে জেরা করছেন।

হেমাবতী যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, একথা একেবারে চেপে যাওয়া হয়েছে। রাধিয়াকে সেইভাবেই তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। বাড়ির বৌকে পুলিশ জেরা করলে, তা মীর্জা হাবেলির পক্ষে সম্মানের নয়। রাধিয়াকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করলেন রাজেশ সিনহা। কিন্তু হত্যাকারীকে চিনতে পারা যায়, এমন কোন সূত্র সংগ্রহ করতে পারলেন না।

ঠাকুরসাহাব বেতের চেয়ারে বসে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জেরার গতি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন।

এবার বললেন, আমার একজন আত্মীয় এবং একজন কর্মচারি খুন হয়ে গেল। হাবেলির ইতিহাসে এরকম বিশ্রী ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

দারোগা বললেন, সত্যি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। হত্যাকারীদের ধরবার আমরা চেষ্টা করছি।

এ অঞ্চলের কোন খুনের কিনারা আপনি করতে পেরেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তবে এক্ষেত্রে কোনরকম গাফিলতি আমি বরদাস্ত করব না।

আপনি অন্যায় দোষারোপ করছেন ঠাকুরসাহাব। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না।

চেয়ারে বসে চেষ্টা করা আর দৌড়ঝাঁপ করে ব্যাপারটার সমাধানে পৌঁছবার প্রয়াস করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। শুধু খুন নয়, ত্রিশ হাজার টাকার গয়নাও চুরি গেছে। মনে রাখবেন, আপনার অকর্মণ্যতাকে আমি খুব বেশিদিন প্রশ্রয় দেব না।

অপমান হজম করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গম্ভীর মুখে রাজেশ সিনহা সদলবলে বিদায় নিলেন। এই দাম্ভিক মানুষটিকে কোন উপায়ে বেকায়দায় ফেলা যায় কিনা, সেই চিন্তাই তখন তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল কিনা বলা যায় না।

প্রলয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

এখন ক'টা বেজেছে, কে জানে। তবে রাত যে গভীর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেবিলের ওপর মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলছে। প্রলয় একটু নড়েচড়ে শুলো। এখন শরীর অনেকটা ভাল। আগামীকাল দুপুরে সেমাপুরে নিজের বাংলোয় ফিরে যাবে ভাবছে। কিন্তু তানি কি ওকে ছাড়বে?

প্রলয়ের মন ঘন রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সহানুভূতির উদ্রেক করে। এই সহানুভূতিই কি ক্রমে ক্রমে মনে প্রেমের সঞ্চার করছে? হাবভাব দেখে মনে হয়, অপর পক্ষ একই ভাবে এগিয়ে আসছে।

এই সময় প্রলয়ের চিন্তায় বাধা পড়ল। ভারি কিছু পড়ার শব্দ হল যেন। দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও। এই বাড়িতেই মনে হয়। মিনিট দুয়েক পরে

আবার। তবে এবার পড়ার নয়, কোন ভারি জিনিস টেনে সরিয়ে দেবার। প্রলয় উঠে বসতে যাচ্ছিল, লক্ষ্য করল পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

দরজার ফ্রেমের মধ্যে তানি এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনের অল্প আলোয় তাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। সে এগিয়ে এসে আলো বাড়িয়ে দিল। তারপর এসে দাঁড়াল প্রলয়ের বিছানার পাশে।

আপনি জেগে আছেন ?

ঘুম ভেঙ্গে গেল। দুবার কিরকম যেন শব্দ হয়েছে শুনেছেন ?

তাই তো উঠে এলাম।

আপনি বোধহয় জেগে ছিলেন ?

চিন্তার হাত থেকে থেকে রেহাই না পেলে ঘুম আসবে কি ভাবে বলুন ?

আপনার আবার চিন্তা কিসের ?

মৃদু হেসে তানি বলল, কি যে বলেন ! আমার চিন্তার কি শেষ আছে ?

চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই বাড়ে। ওতে শরীর খারাপ হয়। ভাল কথা, আমি কিন্তু কাল সকালে চলে যাব।

কালই ?

হ্যাঁ ! কালই !

আরো কয়েকদিন থেকে গেলে হত না ? আপনার শরীর তো এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

কাল আমায় যেতেই হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে তানি বলল, কাল থেকে আমিও তাহলে স্কুলে যেতে আরম্ভ করব। কদিন কামাই হয়ে গেল। আবার মাইনে যাতে কাটা না যায় দেখবেন।

প্রলয়ের মনে ঝড় বইছিল। এবার চরম দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করার জন্য তৎপর হল, স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

ছেড়ে দেব ! আমার চলবে কি ভাবে ? মাকে কি খাওয়াব ?

ধরুন, সে সমস্ত দায়িত্ব আমার।

আপনার !!!

হ্যাঁ। আমার।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে ! আমি—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই তানি।

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে তানি হতবাক হয়ে গেল। প্রলয়ের মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। ধীরে ধীরে মাথা নত হয়ে এল। তারপর গাল আর ঘাড়ে দেখা দিতে লাগল রক্তিমাভা।

অনেক চিন্তা ভাবনার পরই এই প্রস্তাব রাখলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি তোমাকে বাদ দিয়ে আর আমার জীবন কাটতে পারে না।

প্রায় বুজে আসা গলায় তানি বলল, আপনি নিজের ওপর অবিচার করছেন। আমার মত সাধারণ মেয়েকে…

অসাধারণ মেয়েরা আমাকে পছন্দ করবে কেন? তাছাড়া আমি জানি যে, এই সাধারণ মেয়েটি আমাকে ভীষণ ভাবে পছন্দ করে ফেলেছে।

কিন্তু আমি যে…

তুমি বাঙালি নও, এই তো? কি যায় আসে তাতে? আমাদের দুজনের পছন্দই তো এখানে শেষ কথা।

তানি এবার কি বলবে ভেবে পেল না।

প্রলয় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে গাঢ় গলায় বলল, তানি –

উঁ।

আমি কি তোমায় বিব্রত করে তুলেছি?

তানি উত্তর দেবার আগেই জোরালো একটা শব্দ হল। মনে হল কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কেউ হুড়মুড় করে পড়েছে। এবং পরিষ্কার এবার বুঝতে পারা গেল, শব্দটা এসেছে ঝা-জীর ঘর থেকেই। দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

আমাদের কিন্তু গিয়ে দেখা দরকার—

তানি বলল, এর আগের শব্দও তাহলে ওখান থেকেই এসেছে। আপনি বসুন, আমি গিয়ে দেখে আসছি।

একলা তোমার যাওয়া হবে না। আমিও যাব।

দরজা খুলে দুজনে দাওয়ায় এল। সাঁ সাঁ করছে শীতের রাত। চাঁদের আলো ম্লান হওয়ায় দৃষ্টি বেশিদূর প্রসারিত করা যায় না। দাওয়ার শেষের দিকের দুখানা ঘর নিয়ে থাকেন ঝা-জী। ওরা সেখানে পৌঁছে দেখল, দরজা হাট করে খোলা। লণ্ঠনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। গৃহকর্তা গেলেন কোথায়?

কোন অঘটন নিশ্চয়ই ঘটেছে।

আশঙ্কা যে মিথ্যা নয়, অবিলম্বে তা প্রমাণিত হল। বৃদ্ধ ঝা-জীকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল চৌকির ওধারে। মাটিতে পড়ে আছেন তিনি। মুখে কাপড় গোঁজা। তানি তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে দিল। তাঁকে সাহায্য করল চৌকির ওপর উঠে বসতে। সহজ হয়ে উঠতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল তাঁর।

প্রলয় প্রশ্ন করল, কি হয়েছিল বলুন তো?

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে রাত-বেরাতেও লোক আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাই কোন আশংকা না করেই দরজা খুলে দিয়েছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন আমাকে জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে, হাত-পা বেঁধে টেনে নিয়ে গেল

চৌকির ওধারে। তারপর—

আপনি লোকটার মুখ একেবারেই দেখতে পাননি ?

না, তবে মনে হয় চুরির উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। পাশের ঘরে জিনিসপত্র হাঁতড়াবার শব্দ পেয়েছি।

তিনজনে পাশের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

সমস্ত কিছু ছত্রাকারে ছড়ানো রয়েছে। বাক্সের ডালাগুলি চাড় দিয়ে খোলা হয়েছে। ভেতরকার জিনিসপত্র এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত। ঘরে যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। ঝা-জী মহাব্যস্ত ভাবে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, না, কিছু চুরি গেছে বলে তো মনে হয় না।

তানি বলল, বিচিত্র ব্যাপার! চোর এসে এত কাণ্ড করার পর চুরি না করেই চলে গেল!

তাই তো দেখছি।

চুরি যাক বা না যাক, পুলিশে খবর দেওয়া কিন্তু দরকার।

কাল সকালে যা হয় ভেবে চিন্তে করা যাবে। আপনারা এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন। রাত শেষ হয়ে আসছে।

তানি ও প্রলয় আর কিছু না বলে নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

কলকাতার হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের দুশো একচল্লিশের কে নম্বর বাড়িতে তখন সন্ধ্যার আসর বসেছে। আসর আলো করে কিন্তু অনেক লোক বসে নেই। অপরাধতত্ত্ব নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা চলছে। আলোচনাকে সতেজ রাখবার জন্যেই ইতিমধ্যে বোধহয় কফির কয়েকটি কাপ শূন্য হয়েছে।

বাসব বলছিল, অপরাধ-বিজ্ঞানকে সমুচিত সম্মান আমাদের দেশের সরকার আজও দিলেন না। অথচ আজকের জীবনে তার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ওদেশে—আমি ইউরোপের কথা বলছি, ওখানকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধবিজ্ঞান একটি আবশ্যিক বিষয়। ওই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ঘোরালো সব কেসে পুলিশকে সাফল্যের পথ দেখান।

শৈবাল বলল, বল কি! অধ্যাপকরা পুলিশকে সাহায্য করেন ?

তবে আর বলছি কি ডাক্তার। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ব্র্যাণ্ডের কথাই ধর না, তিনি এই ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন।

কি রকম ?

রহস্যময় কোন খুন হলেই পুলিশ তাঁর কাছে ছুটে যায়। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেই সমস্ত কেসের সমাধান অতি সহজেই করে দেন। একটা কেসের উদাহরণ দিলেই তুমি বুঝতে পারবে, কি পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেন। একবার

ভিয়েনার পুলিশ বিভাগের বড়কর্তা একটা পার্শেল পেলেন। পার্শেল খুলে তিনি দেখেন, তার মধ্যে রয়েছে মানুষের হাত থেকে কেটে নেওয়া একটা কড়ে আঙুল।

কড়ে আঙুল!

এখানেই শেষ নয়। কয়েকদিন পরে আরো একটা পার্শেল তিনি পেলেন। তার মধ্যে ছিল একটা মাঝের আঙুল। বুঝে দেখ ব্যাপারখানা। বড়সাহেব আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। এবার আঙুল এসেছিল আংটি সমেত। তিনি কার্ল ব্র্যান্ডের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্র্যান্ড আঙুল দুটো আর আংটিটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর নিজের রসায়নাগারে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

তারপর ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বড়-সাহেবকে জানালেন, এই আঙুল দুটি কোন মহিলার হাত থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। তিনি যে যুবতী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় আঙুলটি কেটে নেবার সময় তিনি জীবিত ছিলেন এবং অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে এখনো হয়ত বেঁচে আছেন। যে একাজ করেছে, সে মোটেই আনাড়ি নয়। সার্জিক্যাল ছুরি দিয়ে সে নিপুণ হাতে কাজ সেরেছে। অস্ত্র চিকিৎসায় তার জ্ঞান অপরিসীম। তিনি আরো বললেন, আংটিতে বিশেষ ধরনের অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই অ্যাসিড দিয়ে চামড়ার দাগ তুলে ফেলা যায়। আমার মনে হয়, মাঝের আঙুলে উল্কি ছিল। ওই উল্কি যুবতীর পরিচয় প্রকাশের সহায়তা করতে পারে বলে অ্যাসিডের সাহায্যে তুলে ফেলা হয়েছে।

বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করল।

বাসব ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করল, কি চাই ?

একজন ভদ্রলোক ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই চিঠিখান দিয়েছেন।

আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছে! শৈবাল বিলক্ষণ অবাক হল: দেখি চিঠিখানা!

বাহাদুর তার দিকে একটি খাম বাড়িয়ে দিল।

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করল শৈবাল। দ্রুত পড়ে গেল। তারপর এগিয়ে দিল বাসবের দিকে। বাসব পড়া শেষ করে মৃদু হাসল। চিঠিখানি এই রকম:

মান্যবরেষু,

নিজের পরিচয় প্রথমেই না দিয়ে রাখলে আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি আপনার কলিগ ডাঃ বরেন দত্তর পিসতুতো ভাই। গত বছর মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিনে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। বর্তমানে বিহারের মুঙ্গের জেলার সেমাপুর ব্লকের দায়িত্ব নিয়ে আছি।

পরপর দুটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এখানে সংঘটিত হওয়ায় এই চিঠির অবতারণা। নিহত দুজনই এই অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী দুর্দান্ত প্রকৃতির ঠাকুরসাহাবের কাছের মানুষ। হত্যাকারী ধরা পড়ে যাক এই তিনি চান। কিন্তু স্থানীয় পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, আপনার বন্ধু প্রখ্যাত গোয়েন্দা বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার দিকে ঠাকুরসাহাবের তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকবে।

ভরসা করি নিশ্চিত ভাবে এই ব্যাপারে বাসববাবুকে রাজি করাতে পারবেন। আপনিও সঙ্গে এলে খুশী হব। এখানকার নৈসর্গিক শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবে। এস্টেটের ম্যানেজার এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আপনাদের এখানে আসার বন্দোবস্ত করবেন।

কুশলে আছেন নিশ্চয়। নমস্কার গ্রহণ করুন।

প্রলয় সোম

যাবে নাকি ?

মাস দুয়েক থেকে তো বেকার বসে আছি। ঘুরে আসা যেতে পারে। আর কিছু না হোক, একঘেয়েমি কাটাবার সুযোগ পাওয়া গেল। তুমিও কিন্তু যাচ্ছ সঙ্গে।

•আমাকে বাদ দাও ভাই।

ওসব চালাকি রেখে দাও। যেতে তোমাকে হবেই। বাহাদুর, ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এস।

বাহাদুর চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে ঘরে এলেন কৈলাসপতি। বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণনা করার অনুরোধ জানাল।

দিবাকর ও ত্রিলোকের হত্যা সম্পর্কে যেটুকু জানতেন তা মোটামুটি গুছিয়ে বললেন কৈলাসপতি। তবে একথাও জানালেন, ঠাকুরসাহাব আরো ভালভাবে সমস্ত কিছু বলতে পারবেন। তিনি খুন দুটি নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। নানা ভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

বাসব গম্ভীর মুখে পাইপের ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কালই যাওয়া স্থির করলাম। আপনি দুটো বার্থের ব্যবস্থা করুন।

বেশ।

কোন্ গাড়িতে আমরা যাব ?

দিল্লী এক্সপ্রেসেই সুবিধা হবে। ভোরবেলায় কিউলে পৌঁছয়। ওখান থেকে জিপে হাবেলি পৌঁছতে ঘণ্টা খানেক লাগবে।

হাবেলি কি ?

প্রাসাদ। ঠিক সময় যাতে স্টেশনে জিপ তৈরি থাকে তার জন্য এখান থেকে বেরিয়েই তার করে দিচ্ছি।

সেই ভাল। বাহাদুর—বাহাদুর, কফি নিয়ে এস।

হাবেলির দক্ষিণ দিকের চারখানি ঘর নিয়ে অতিথি-নিবাস। মূল প্রাসাদের সঙ্গে ঘরগুলি যুক্ত থাকলেও, গঠন কৌশলে সমস্ত দিক দিয়ে পৃথক। আগে যখন উত্তরপ্রদেশের বড় বড় শহর থেকে বাঈজীরা আসত, তখন তাদের থাকার ব্যবস্থা হত এখানেই। এখন আর সেদিন নেই। দিনের পর দিন এখন অতিথি-শালা খালিই পড়ে থাকে।

বাসব ও শৈবালের থাকার ব্যবস্থা ওখানেই হল।

ট্রেনে চমৎকার ঘুম হয়েছিল দুজনের। তবু ট্রেন জার্নি বলে কথা। সামান্য ক্লান্তিবোধ রয়েছেই। থাকার ব্যবস্থা দেখে ওরা খুশি হল। ঘরগুলি বেশ বড় বড়। দামি আসবাব দিয়ে সাজানো। সুদৃশ্য ঝাড় ঘরে ঘরে ঝুলছে। সন্ধ্যা নামার পর সেগুলিতে এখন আর মোমের আলো জ্বলে না। জ্বলে বাল্ব।

প্রচুর জলযোগের পর ওরা বিছানায় একবার গড়িয়ে নেবে কিনা ভাবছিল। কৈলাসপতি দেখা দিলেন। জানতে চাইলেন ঠাকুরসাহাব এখনই দেখা করবেন কিনা। কাজ যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেওয়াই ভাল। বাসব জানাল, ওরা তৈরিই আছে। ঠাকুরসাহাবের সঙ্গে দেখা হলে খুশিই হবে।

কৈলাসপতি চলে গেলেন।

শৈবাল বলল, দুপুরের দিকে দেখা সাক্ষাৎটা হলে ভাল হত নাকি?

শরীরের এখন একটু বিশ্রাম দরকার তা আমি বুঝি। তবে কি জানো, দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোকটির মুখোমুখি হবার জন্য মন হাঁকপাঁক করছে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি বেশিদূর প্রসারিত করা যায় না। বাউণ্ডারি ওয়াল বাধার সৃষ্টি করেছে। তবে ওধারের বড় বড় গাছগুলির ঊর্ধ্বাংশ চোখে পড়ে। এখন সকাল সাড়ে আটটা, তবুও কনকনে ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। এই কনকনানি রাত্রে যে ভয়ঙ্কর রূপ নেবে তাতে আর সন্দেহ কি!

ঠাকুরসাহাব ঘরে প্রবেশ করলেন।

চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবির ওপর ঘি রঙের কাজ করা শাল তাঁর গায়ে। আভিজাত্যময় চেহারাকে এই সাজ আরো উগ্র করে তুলেছে। কুশল বিনিময়ের পর ওদের কোনরকম অসুবিধা এখানে হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন।

বাসব বলল, অসুবিধার কথা কি বলছেন! শহর থেকে দূরে এত স্বাচ্ছন্দ্য যে পাওয়া যাবে, তা আমরা ভাবতেই পারিনি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কৈলাসপতিবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি। তবে

আপনার মুখ থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনতে চাই। কোন কথা লুকোবেন না। তুচ্ছ বলেও কিছু বাদ দেবেন না। সমস্তই আমার উপকারে লাগতে পারে।

ঠাকুরসাহাব একে একে সমস্ত কথা বললেন। শুধু রাধিয়া নয়, ত্রিলোকের হত্যাকাণ্ডর সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি হেমাবতী যে উপস্থিত ছিল, সেকথাও বাদ দিলেন না। এখানে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে এবং ডায়নামো মিস্ত্রিকে মেরে ফেলেছে, সেকথাও বাদ দিলেন না।

নিজের বক্তব্য বেশ সময় নিয়েই শেষ করলেন ঠাকুরসাহাব। বাসবের মুখে তখন গভীর চিন্তার ছায়া পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সে কথা বলল না। পুরো বিষয়টিকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল বোধহয়।

তারপর—

এখন বাঘের উপদ্রব চলছে নাকি?

কয়েকদিন থেকে বাঘের ডাক শোনা যায়নি। জন্তুটা হয়ত অন্যত্র শিকারের সন্ধানে গেছে।

হুঁ। ত্রিলোকের মৃতদেহ নিয়ে যাবার পর পুলিশ আর এখানে এসেছিল?

না।

এর মানে হল, তার ঘর সার্চ করার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি এখানকার পুলিশ।

একটু হেসে ঠাকুরসাহাব বললেন, গ্রাম্য পুলিশের কারবারই আলাদা। এখানকার দারোগা আবার নিজেকে ভীষণ বুদ্ধিমান মনে করেন। কিন্তু আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে সে ক্লাউন ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনার সময় আর নষ্ট করব না ঠাকুরসাহাব। কথাবার্তা এখনকার মত এখানেই শেষ হল। আপনি শুধু একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখবেন। দুপুরের দিকে বেরোতে চাই।

বেশ তো। আর কিছু?

ত্রিলোক যেখানে খুন হয়েছে, সেই জায়গাটা এখন একবার দেখে আসব ভাবছি। একজন পথপ্রদর্শক চাই।

আসুন। মুনিমজী আপনাদের ওখানে নিয়ে যাবেন।

বাসব সুটকেশ খুলে টর্চটা বার করে নিল। ও আগেই শুনেছে, ঘন গাছপালার দরুণ সূর্যের আলো ওখানে ঢোকে না। কাজের সুবিধার জন্যই টর্চ নিয়ে নিল। ঠাকুরসাহাব ওদের কৈলাসপতির কাছে পেঁছে দিয়ে নিজের খাস কামরায় চলে গেলেন।

হাবেলির পিছন দিকের ছোট দরজা দিয়ে তিনজনে দুর্ঘটনাস্থলে পেঁছল। জায়গাটা সত্যি ছায়ায় ঢাকা। এখানে দাঁড়িয়ে কে বলবে বাইরে রোদ্দুর ঝলমল করছে। বাসব টর্চ জেলে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের কালো দাগ এখনো ঘাসের ওপর রয়েছে।

সরু একটি পথের রেখা আছে। পায়ের চাপেই এটির সৃষ্টি। ঘাস উঠে গেছে বলেই খুব পুরনো হয়নি এমন কয়েক জোড়া জুতোর ছাপ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে দেখা গেল। পুলিশের লোকেরাই এগুলির সৃষ্টিকর্তা হতে পারে। তবে একজোড়া পায়ের দাগ বাসবের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করল। একটা শালগাছের ঠিক সামনে বেশ গভীর ভাবে পড়েছে দাগজোড়া।

বাসব বলল, ডাক্তার, দেখছ—?

শৈবাল একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, কোন ভারি লোকের পায়ের দাগ।

আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে। হিলের দিকে তাকাও, টো-এর চেয়ে যেন বেশি বসেছে। এর অর্থ হল, একজন ওই শালগাছটায় হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হেলে দাঁড়ানোর দরুণই হিল এত গভীর ভাবে বসেছে।

তুমি বলতে চাও, হত্যাকারী ত্রিলোকের অপেক্ষায় এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারপর—

নিশ্চয় করে এখন কিছু বলতে পারি না। তবে জুতোর সাইজ দেখে এটুকু বলা যায়, সে হত্যাকারীই হোক আর যেই হোক, মোটেই বেঁটে লোক নয়।

শৈবাল কথা শুনতে শুনতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল, শালগাছের হাতখানেক ওধারে ছোট ছোট আগাছার মধ্যে কি যেন পড়ে রয়েছে।

আলোটা এধারে একবার ফেল তো —

কিছু দেখতে পেলে নাকি?

মনে হচ্ছে।

আলো পড়তেই দেখা গেল, কলমের মত কি পড়ে রয়েছে। ঝুঁকে শৈবাল তুলে নিল। কলম নয়, ডট পেন্সিল। শৈবালের হাত থেকে ডট পেন্সিলটা নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল বাসব। তারপর পকেটস্থ করল। এখানে কোন প্রয়োজনীয় সূত্র পাওয়া যাবে না অনুমান করেই ওরা এবার ফেরার উদ্যোগ করল। কৈলাসপতি এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দুজনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছিলেন। বাসব তাঁর কাছে গিয়ে বলল, চলুন, এবার ফেরা যাক।

তিনজন ছোট দরজার কাছে পেঁছিতেই বাসব আবার বলল, এরকম দরজা আর ক'টা আছে?

আর একটা। ডায়নামো ঘরের কাছাকাছি।

ওই দরজা খোলা পেয়েই তো বাঘ ঢুকেছিল। কে দরজাটা খুলে রেখেছিল জানতে পেরেছেন?

না। এখন এই দুটো দরজাতেই সন্ধ্যার আগে তালা মেরে দেওয়া হয়।

আর কোন কথা হল না। ওরা হাবেলির মধ্যে প্রবেশ করল।

নিজের বাংলোর বিছানায় শুয়ে প্রলয় খবরের কাগজ পড়ছিল। ঠিক

পড়ছিল না, পড়ার চেষ্টা করছিল। শরীর এখন মোটামুটি সুস্থ। ওষুধ এখনো চলবে, ওই সঙ্গে আরো কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিয়েছেন ডাঃ ঘোষাল। সদর থেকে সরকারী ডাক্তারও এসেছিলেন। দেখে-শুনে তিনি মত প্রকাশ করে গেছেন, ডাঃ ঘোষাল ঠিক পথেই এগোচ্ছেন। তাঁর প্রেসক্রিপশানই চলবে।

শরীর দ্রুত ভালর দিকে এগোচ্ছে, তা সত্ত্বেও প্রলয়ের মনের অবস্থা ভাল নয়। তাই খবরের কাগজের পাতায় একাগ্র হবার উৎসাহ পাচ্ছে না। আসল কথা হল, বাংলোয় ফিরে আসার পর আর তানির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ এক বিচিত্র ব্যাপার! কিছুদিন আগেও যাকে ভাল করে চিনত না পর্যন্ত, আজ তাকে কাছে পাবার জন্য মন অসম্ভব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

প্রলয় খবরের কাগজ মুড়ে একপাশে রাখল। কাল বাইরে বেরোবার অনুমতি চাইবে ডাঃ ঘোষালের কাছে। তিনি অনুমতি দেন ভাল, নইলে চাকরটাকে পাঠাবে মীরপুরে তানির কাছে। কিন্তু এখানে এসে—অর্থাৎ এই বাংলোয় এসে তার সঙ্গে ওর দেখা করাটা কি ঠিক হবে? লোকে অন্য অর্থ করতে পারে।

প্রলয়ের মনে পড়ে গেল, লোকে ইতিমধ্যে অন্য অর্থ করে নিয়েছে। অফিসে নাকি কেরানিরা এই নিয়ে জোর আলোচনা করছে। তাদের আর অপরাধ কি? তাদের সাহেব যখন এক অনাত্মীয়া যুবতীর ঘরে কয়েকরাত্রি কাটিয়ে এলেন, তখন তারা রসালো আলোচনা পরিহার করে চলবে কিভাবে?

তবুও প্রতিবাদ করেছিল। শ্রীকান্ত দত্তকে বলেছিল, এ কিন্তু অন্যায় মাস্টারমশাই, কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে যার-তার নাক গলানোর কোন মানে হয় না—

মানে হয় না বললেই তো হবে না। এটাই হল প্রচলন। দেখেন না, বড়ঘরের কত কেচ্ছা খবরের কাগজের প্রথম পাতার সংবাদ। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আর ওকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।

কার কথা বলছেন?

বলছি সেই মেয়েটির কথা।

ওকে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে আর উপায় নেই মাস্টারমশাই—

শ্রীকান্ত অবাক হয়ে গেছিলেন।

তার মানে! আপনি বড় রকম একটা কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে ছাড়বেন না দেখছি—

বরং বলুন, মহা বিব্রত একটি মেয়েকে আমি ঠিক পথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি। এখন নয়, আরেক দিন আপনাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলব।

মাস্টারমশাইয়ের সেদিনের মুখের ভাব মনে পড়ে যেতে হাসি পেয়ে গেল প্রলয়ের। তার কথাবার্তা শুনে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেছিলেন। প্রলয় বিছানা থেকে নেমে টেবিলের কাছে গেল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে

ধরিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এল বিছানায়।

সিগারেট পুড়ে চলেছে। এলোমেলো চিন্তা তার মনে।

কি ভাবছেন?

চমকে মুখ ফেরাল প্রলয়। দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে তানি। এ এক কল্পনাতীত মুহূর্ত। এমন ঘটনাও ঘটে! তাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মন্থর পায়ে এগিয়ে এল সে।

কি ভাবছিলেন?

বিশ্বাস কর, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তোমাকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে নাকি?

কই, না তো!

তানি খাটের পাশে টুলটায় বসল।

এখন কেমন আছেন?

ভাল। আমার প্রশ্ন করাটাই অন্যায়। আমারই জন্য তুমি বারবার ঠাট্টা-বিদ্রুপের মুখোমুখি হচ্ছ। তোমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

কার মুখ আটকাব বলুন!

তারপরেও তুমি এখানে এলে?

না এসে আমি থাকতে পারলাম না।

প্রলয় তানির একটা হাত নিজের হাতে নিল।

আমিও তোমায় না দেখে থাকতে পারছিলাম না। তুমি এসে পড়ায় কি যে ভাল লাগছে কি বলব! একি! তোমার সিঁথিতে সিঁদুর কোথায়?

নেই। মুছে ফেলেছি।

মুছে ফেলেছ!

তানি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, মুছে না ফেললে আবার সিঁদুর পরব কোথায়?

এবার জোরে হেসে উঠল প্রলয়।

দেখছ তো আমি কি বোকা! লোক দেখানো ওই লাল গুঁড়োগুলো তো মুছে ফেলতেই হবে। নইলে—

প্রলয়ের কথা শেষ হল না; চাকর এসে জানাল, দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান। কলকাতা থেকে এসেছেন ওঁরা।

দুজনের পরিচয় যে কি, প্রলয় সহজেই তা বুঝতে পারল। কারণ বাসব ও শৈবালের আজ এখানে পৌঁছবার কথা তার অজানা ছিল না। তাই সে বলল, তাঁদের এখানে নিয়ে এস।

তানি চঞ্চল হয়ে উঠল: আমি তাহলে এখন যাই—

না, তুমি যেও না। খুনের তদন্ত করতে ওঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার সঙ্গেও হয়ত ওঁরা কথা বলতে পারেন।

আমার সঙ্গে! আমি তো কিছুই জানি না—

আমিই বা কি জানি বল! অনেককে বাজিয়ে দেখতে হবে ও'দের। দু-দুটো খুনের কিনারা করা তো সহজ কথা নয়!

বাসব ও শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল। দুজনের কেউই ভাবতে পারেনি, এখানে একজন মহিলার সাক্ষাৎ তারা পাবে। প্রলয় ওদের বসতে বলল। তানির পরিচয় দেওয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে দেবে, প্রলয় স্থির করতে পারল না। শৈবাল ওর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রশ্ন করল।

বাসব বলল, আমাকে এখানে ডেকে আনার পরামর্শ কি আপনিই ঠাকুর-সাহাবকে দিয়েছিলেন?

কোন পরামর্শ দেওয়ার মত সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার নয়। বরং তিনি আমার ওপর কিছুটা বিরূপই ছিলেন বলতে পারেন। তবে কয়েকদিন আগে হঠাৎ তিনি আমার কাছে এসে বললেন, স্থানীয় পুলিশের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না। এখানকার দারোগাটা অকর্মার ধাড়ি। অথচ হত্যাকারী ধরা না পড়লে তাঁর সম্মান বজায় রাখা দুষ্কর হবে। লোকে বলবে কি? বিশেষ করে নিহত দিবাকর যখন তাঁর শালা। আপনি কেস হাতে নিয়ে এর আগে মুঙ্গেরে এসেছিলেন। ঠাকুরসাহাব আপনার নাম শুনিয়েছিলেন তখনই। আমি কলকাতার লোক, কাজেই আমাকে এসে ধরলেন। আমি যেন যে কোন প্রকারে আপনাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করি। সৌভাগ্যক্রমে শৈবালদার সঙ্গে পরিচয় থাকার দরুণ—

কথা শেষ না করেই মৃদু হাসল প্রলয়।

পরোক্ষভাবে একটা খুনের সঙ্গে তো আপনিও জড়িয়ে পড়েছেন।

তা বলতে পারেন। সে-রাতের কথা আমি জীবনে ভুলব না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আমি কিন্তু বিস্তারিত ভাবে সে-রাতের কাহিনী শুনতে চাই। তবে আপনি আরম্ভ করুন একটু আগে থেকেই। অর্থাৎ ঠাকুরসাহাবের সঙ্গে আপনার আলাপ হল কিভাবে ইত্যাদি থেকেই আমি শুনতে চাই।

বেশ। একটু চায়ের কথা বলি?

মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আকণ্ঠ খাওয়া হয়েছে। এখন আর চা খাব না।

তিনটে প্রায় বাজে। এককাপ চা ঠিক খেতে পারবেন।

প্রলয় চাকরটাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তানি উঠে পড়েছে। 'আমি আনছি' বলেই দ্রুত ভঙ্গিতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মোটামুটি আন্দাজ করা ছাড়া বাংলা প্রতিটি কথা তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তাই প্রথম সুযোগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কে হে?

আমার সব কথা শুনলেই ওর পরিচয় ভালভাবে পাবেন।

বাঁধের ব্যাপার নিয়ে তার কাছে ঠাকুরসাহাবের আসা থেকেই আরম্ভ করল প্রলয়। বেশ গুছিয়ে বলে গেল একে একে সমস্ত কথা। অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বাদ গেল না। একটু নাটকীয় মনে হলেও, তানিকে বাদ দিয়ে তার আগামী জীবন যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, একথাও জানিয়ে রাখল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসব একাগ্র ভাবে শুনছিল। এবার বলল, অন দি হোল ঠাকুরসাহাবকে আপনার কেমন মনে হয়?

দাম্ভিক নিশ্চয়। তবে আমি নানা ভাবে বিচার করে দেখেছি, পারিবারিক সম্মানকে তিনি সবচেয়ে ওপরে স্থান দেন। যা কিছু করেন বা করতে যান, তার নেপথ্যে থাকে ওই সম্মান রক্ষার প্রয়াস।

আপনার কি মনে হয়েছিল জিপ দুর্ঘটনার সময় বাঘটা খুব কাছাকাছি ছিল?

থাকলেও থাকতে পারে, ঠিক বলতে পারব না। তবে তার ডাক আমরা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি।

কিরকম ডাক?

অত্যন্ত উচ্চ গ্রামের রক্ত জল-করা ডাক।

চা এসে পড়ল। তানি অবশ্য ভেতরেই রয়ে গেছে। চিন্তিত মুখে কাপে চুমুক দিতে লাগল বাসব। শৈবাল ও প্রলয়ের মধ্যে চলতে লাগল পুরনো কথার আলোচনা।

এক সময় কাপ নামিয়ে রেখে বাসব বলল, তাহলে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন বলেই আপনি স্থির করেছেন?

ইচ্ছে তো সেই রকমই।

আচ্ছা, যে ভদ্রলোকের বাড়িতে মেয়েটি ভাড়া থাকে—কি যেন নাম বললেন তার?

ঝা-জী।

ওই ঝা-জী লোকটা কেমন?

প্রলয় ভেবে পেল না, দিবাকর ও ত্রিলোকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই ধরনের প্রশ্নের কি সম্পর্ক থাকতে পারে। শৈবাল অবশ্য বিস্মিত হল না। বাসবকে সে ভালভাবেই চেনে। সমস্ত দিক বাজিয়ে দেখে নেবার পর, কোন পথ ধরে এগোবে তা স্থির করে নেওয়াই হল ওর কার্যপদ্ধতির এক বিশেষ দিক।

আমার তো ভালই মনে হয়। তবে তানি আপনাকে তাঁর সম্পর্কে সঠিক কথা বলতে পারবে। ডাকব তাকে?

ডাকুন।

প্রলয়ের পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরেও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে অবশ্যই তানি আছে। মুখে তার বেশ ঘাবড়ানো ভাব। কি ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সেই চিন্তাই বোধহয় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এখন নিয়মিত বলার সুযোগ নেই এইটুকু। নইলে হিন্দী আর উর্দু মিশিয়ে কথা বলতে বাসব ভালই পারে। বাবা-মা মারা যাবার পর যৌবনে পা দেওয়া পর্যন্ত ওর জীবন কেটেছিল দিল্লীতে বড়মামার কাছে। তানিকে বসতে অনুরোধ করে, তার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি কি কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছি, তা আপনি নিশ্চয় জানেন। কাজের সুবিধার জন্যই গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

বলুন।

ঝা-জীকে আপনি কতদিন থেকে চেনেন?

বছর তিনেক—মানে ওঁর বাড়িতে যতদিন থেকে ভাড়া আছি।

প্রলয়বাবুর মুখ থেকে শুনলাম উনি সজ্জন ব্যক্তি। আপনি ওঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন?

বিশেষ কোন কথা—!

এই ধরুন, কখনো তাঁর কোন হাবভাব আপনার মনে খটকা লেগেছে কিনা?

একটু ভেবে তানি বলল, এমনিতে তো বেশ হাসি-খুশি মানুষ। তবে সন্ধ্যের পর কেমন যেন উসখুস করেন। একদিন ওই সময় ওঁর ঘরে গিয়ে পড়েছিলাম, বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

দিবাকর—মানে ঠাকুরসাহাবের শালাকে আপনি আগে কখনো দেখেছিলেন?

না।

ত্রিলোককে?

তাকে দেখেছি। ঝা-জীর কাছে কয়েকবার সে এসেছিল।

শেষ কবে এসেছিল বলতে পারেন?

যেদিন মারা গেছে, সেদিনই দুপুরবেলা এসেছিল।

কি কথাবার্তা হয়েছিল শোনেনি বোধহয়?

সলজ্জ ভঙ্গিতে তানি বলল, না, আমি তখন ওঁকে খাওয়াচ্ছিলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, ত্রিলোক ঝা-জীর ঘরে ঢুকল।

আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। মিস্টার সোম, এবার আমরা উঠি। পরে আবার দেখা হবে।

এখুনি উঠবেন?

একবার থানায় যেতে হবে। ডাক্তার, চল—।

তাহলে আমার চাকরটাকে সঙ্গে দিয়ে দিই, আপনাদের থানায় পেঁছে দিয়ে আসবে।

দরকার হবে না। আমরা নিজেরাই চিনে চলে যাব।

বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তানি বলল, আমিও এবার যাই।

দু' মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে আর যেতে হবে না। তোমার এই হাঁটাহাঁটি

আমার ভাল লাগে না। এখানেই থেকে যাও।

থেকে যাব! লোকে কি বলবে?

আমাকে তো নিজের ঘরে জায়গা দিয়েছিল, তখন তো ভাবনি লোকে কি বলবে?

তখন আপনি অসুস্থ ছিলেন। তখন আপনার—

এখনো আমি এমন কাজ করব না, যাতে তুমি ছোট হও। ও'দের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমি ভাবি ব্যবস্থাটা ছকে নিয়েছি মনে মনে। এক্ষুণি আমাদের অফিসের হেডক্লার্ক'কে ডেকে পাঠাব। তারপর—

হেডক্লার্ক'কে কেন?

তিনি আর্যসমাজী। আমাদের বিয়েটা আজই দিয়ে ফেলতে পারবেন। বিশেষ হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

তানি অবাক হয়ে প্রলয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপনার মত অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আমি আর দেখিনি।

এই অদ্ভুত মানুষটিকে এবার তুমি সারা জীবন ধরেই দেখবে।

এত তাড়াতাড়ি করবার কি আছে? আমি বলছিলাম, আজ থাক। আজ আমি ফিরে যাই, পরে বরং—

তবে থাক।

রাগ হল?

তোমার ওপর আমি রাগ করতে পারি না তানি। বেশ, সেই ভাল। চুপি চুপি নয়, সকলকে জানিয়েই বিয়ে করব। এবার একটা ফরমাস করব, রাখবে?

বলুন।

এক কাপ চা করে দেবে? তখন খাইনি। এখন তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তানি হেসে ফেলল।

দু-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থানায় পেঁছিতে বিশেষ অসুবিধা হল না। পায়ের ওপর পা চাপিয়ে দিয়ে থানার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা রাজেশ সিনহা তখন সিগারেট ধরিয়েছেন। বাসব ও শৈবালের মত দুই সভ্যমূর্তিকে দেখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। পরিচয় পাবার পর তাঁর মনের ভাব পাল্টে গেল। বিরক্তি মিশ্রিত গাম্ভীর্যের ঢল নামল তখন সারা মুখে।

কলকাতার একজন গোয়েন্দা খুনের রহস্যভেদ করার জন্য এখানে আসছে, তিনি শুনেছিলেন। সদর থেকেই তাঁর কাছে এই সংবাদ এসেছিল। এই অঘটন ঘটাবার জন্য ঠাকুরসাহাবই যে দায়ী, তাও তাঁর অজানা নয়। ওই দাম্ভিক লোকটি নিদারুণভাবে তাঁকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছেন। মহা বিরক্ত হয়েছেন।

তিনি হালে পানি পাচ্ছেন না, আর একজন বাইরের লোক এসে খুনী ধরবে ?

দারোগার মুখ দেখেই বাসব তাঁর মনের ভাব আঁচ করল। এই লোকটির কাছে সহজে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। অবশ্য ও তৈরি হয়েই আছে। এরকম অসহযোগিতার মুখোমুখি বহুবার দাঁড়াতে হয়েছে তাকে।

বাসব কাজের কথা আরম্ভ করল।

আমি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দুটো দেখতে চাই।

সরকারি কাগজপত্র আমি আপনাকে দেখাব কেন ?

দেখাতে আপনি বাধ্য। আমার তদন্তে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আপনাকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে। এই প্রদেশের পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। তাঁরা আমাকে সম্মানের চোখে দেখেন, এই কথাগুলো মনে করে রাখলেই ভাল করবেন।

রাজেশ গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বার কয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না। শেষে দেরাজ খুলে রিপোর্ট বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

বাসব মন দিয়ে পড়ল রিপোর্ট দুটি। বিশেষ কিছু জানা গেল না। দিবাকরকে হত্যাকারী আঘাত করেছিল তিনবার। তলপেট আর বুক—এই তার লক্ষ্য। ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন নেই। পাকস্থলিতে অ্যালকোহলের সন্ধান পাওয়া গেছে। মনে হয় মৃত্যুর সময় দিবাকর মাতাল অবস্থায় ছিল।

ছোরা বা ওই জাতীয় কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ত্রিলোককে আঘাত করা হয়েছে। বুকেই হল একমাত্র লক্ষ্যস্থল। মাথাতেও অবশ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। হাল্কা ধরনের। অনুমান করা যাচ্ছে, মাথায় আঘাত করে প্রথমে ত্রিলোককে কাবু করে ফেলে হত্যাকারী। তারপর অস্ত্র চালায়।

রিপোর্ট দুটো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, ছোরাটা এবার দেখান।

কোন্ ছোরা ?

দিবাকরের পেটে একটা ছোরা বিঁধে ছিল বলেই আমি শুনেছি।

রাগে গসগস করছিলেন রাজেশ সিনহা। কিন্তু আর অনুরোধ উপেক্ষা করতে যাওয়া যে স্বাস্থ্যকর হবে না, তা তিনি বুঝেছেন। কলকাতার এই গোয়েন্দাকে বিশেষ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। এস. পি.-র কাছে অভিযোগ জানিয়ে বসতে পারে। তখন পরিস্থিতি দারুণ গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে। যেক্ষেত্রে সদর থেকে তাঁকে জানিয়ে রাখা হয়েছে, বাসবকে সমস্ত রকম সহযোগিতা দেবার কথা।

ছোরাখানা বার করে দিতে হল।

চওড়া ব্লেডের আট ইঞ্চির মত লম্বা ছোরা। ফলা চকচক করছে না। ফলার দু'পাশেই হাল্কা লালের আস্তরণ। রক্ত কালচে হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে বাঁটের নিচে। বাসব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ছোরাখানা দেখতে লাগল।

বাঁটের ওপর যে কারুকার্য রয়েছে, তার প্যাটার্ন দেখে মনে হয় মোরাদাবাদের তৈরি।

বাঁটের ওপর থেকে কোন হাতের ছাপ তোলা গেছে ?

না।

আমি এটা নিয়ে যেতে চাইলে বোধহয় আপনি আপত্তি করবেন। ঠিক আছে, আমি সদর থেকে অনুমতি আনিয়ে নেব। এবার আমরা চলি। তবে আবার বিরক্ত করতে আসতে হতে পারে।

থানা থেকে বেরিয়ে জিপে চড়ার মুখে শৈবাল বলল, আর কোথাও যাবার ইচ্ছে আছে নাকি ?

স্টেশনমাস্টার আর সুদর্শন অরোরার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। আজ থাক, বেলা পড়ে আসছে। আলো থাকতে থাকতেই আস্তানায় ফেরা ভাল।

বাঘের ভয়ে কাহিল হয়ে পড়লে নাকি ?

বাসব তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

পথে আর কোন কথাবার্তা হল না। জিপ থেকে নেমে ওরা নিজেদের ঘরে চলে গেল।

এখন বাসবকে অনেক সহজ দেখাচ্ছে। মনে যে চিন্তার আলোড়ন চলছিল; তা বোধহয় থিতিয়ে এসেছে। ও চেয়ারে বসে পড়ে পাইপ ধরাল।

শৈবাল বলল, তুমি ঝা-জীকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন, বুঝতে পারছি না।

ওই ভদ্রলোক পুলিশকে এড়িয়ে গেছেন বলেই মাথা ঘামাচ্ছি।

তার মানে ?

বাড়িতে চোর ঢুকে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিল। এমন কি হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখে দিয়ে গেল। এত কাণ্ডের পরও গৃহকর্তা পুলিশে খবর দিল না! ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন নয় কি ? এতে এই সিদ্ধান্তে আসা কি অন্যায় যে, এমন কোন ব্যাপার আছে, যার জন্য সে পুলিশকে কাছে ঘেঁষতে দিতে নারাজ ?

তোমার অনুমান যদি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। খুন দুটোর সঙ্গে ও-ব্যাপারের সম্পর্ক কি ?

হয়ত কিছুই নয়। আবার অনেক কিছু। ত্রিলোক ওখানে কেন যাতায়াত করত, তা আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। ভুলে যেও না ঝা-জীর বাড়ি থেকে ফেরার পথেই সে খুন হয়েছিল!

একটু চুপ করে থেকে বাসব আবার বলল, আচ্ছা ডাক্তার, বাঘের চরিত্র সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কতটা ?

অবাক হয়ে শৈবাল প্রশ্ন করল, বাঘের চরিত্র ?

আমি যতদূর জানি, যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, সে

লোকালয়ের চারপাশে ঘুরঘুর করে। মানুষ ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না।

আমিও ওই কথাই জানি। কিন্তু এখানে উল্টো কাণ্ড ঘটছে। বাঘ লোকালয়ের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করেও মানুষ খাচ্ছে না।

খাচ্ছে না!

কই আর খাচ্ছে? ডায়নামো মিস্ত্রিকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু তাকে তুলে নিয়ে যায়নি। সিরাজ মল্লিক রাতভোর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, জন্তুটা তাকে খায়নি। প্রলয়বাবু জঙ্গলের মধ্যে এতক্ষণ ছিলেন, অথচ জন্তুটা তাঁর ধার ঘেঁষেনি। দিবাকরের মৃতদেহ পড়েছিল, এমন নিশ্চিন্ত আহার পেয়েও বাঘটা সেদিকে ফিরে তাকায়নি! এই ধারাবাহিক ব্যতিক্রমের মানে কি ডাক্তার? ম্যানইটাররা তো এমন হয় না!

সত্যি তো, ম্যানইটারের স্বভাব এমন হবে কেন? মল্লিক আর প্রলয়ের কাছাকাছিই ছিল বাঘটা। তার ডাকের জন্যই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। মুঠোর মধ্যে শিকার পেয়েও দিব্যি সে চলে গেল!—শৈবাল বেশ ভাবিত হয়ে পড়ল।

আমি তো ভাই কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কোন সমাধানে পৌঁছেছ নাকি?

ঠিক সমাধানে পৌঁছয়নি। তবে একটা সন্দেহ ক্রমেই মনের মধ্যে গভীরভাবে চেপে বসছে। আমার মনে হচ্ছে, খুন দুটো নয়, আরো বেশি হয়েছে।

কি রকম?

বাঘের আক্রমণে নয়··ডায়নামো মিস্ত্রি বিনোদ বর্মাও খুন হয়েছে। তাছাড়া—

তুমি বলতে চাইছ, বাঘের উপদ্রবটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা?

ঠিক তাই! ম্যানইটার মানুষ খায় না, এমন হতে পারে না।

কিন্তু তার গর্জন?

সেকথা আমার মনে আছে। বিনোদ বর্মার শরীর আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিল, তা আমি মনে রেখেছি। এই দুটো বিষয় কিভাবে সম্ভব হয়েছে, তা জানতেই হবে। নইলে আমাদের সন্দেহ টিকিয়ে রাখা যাবে না। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই সময় চা-জলখাবার এসে পড়ল।

ডান হাতের কাজ সেরে নেবার পর বাসব বলল, চল, ত্রিলোকের ঘরখানা একবার দেখে আসি।

বারান্দায় কৈলাসপতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ওদের নিয়ে চললেন। পশ্চিম দিকে বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁসে একসারি ঘর। তারই একখানায় ত্রিলোক থাকত। এগুলো চাকরদেরই ঘর। এখন তার ঘরে তালা দেওয়া। কৈলাসপতি তালা খুলতেই ওরা ভেতরে ঢুকল। কয়েকদিন বন্ধ থাকার দরুণই বোধহয়

ভ্যাপসা গন্ধ ছাড়ছে। কৈলাসপতি তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিলেন।

ঘরে আসবাব আছে দুটো। চৌকি আর কাঠের বাক্স। চৌকির ওপর আধময়লা বিছানা পাতা। এক পাশে দড়িতে টাঙানো কিছু ময়লা জামা-কাপড় ঝুলছে। মেঝের এখানে-ওখানে পোড়া বিড়ির টুকরো পড়ে রয়েছে। লোকটা মোটেই গোছানো ছিল না বুঝতে পারা যায়।

বাসব বলল, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। তালাটা রেখে যান। কাজ হয়ে গেলেই ঘর বন্ধ করে চাবি আপনাকে দিয়ে আসব।

কৈলাসপতি মাথা হেলিয়ে প্রস্থান করলেন।

বাসব প্রথমে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামাগুলোর পকেটে হাতড়াল। কিছু পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ খালি। এরপর বিছানা উল্টেপাল্টে দেখল। কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। এবার শৈবাল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, বাসব দেওয়ালে পোঁতা একটা গজাল উপড়ে আনার চেষ্টা করছে।

ওকি করছ ?

গজালটা দেওয়াল থেকে খোলার চেষ্টা করছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কি করবে ওটা ?

কিছুক্ষণ টানাটানি করার দরুণ গজালটা দেওয়াল থেকে খুলে এল। তার থেকে সুরকি ঝাড়তে ঝাড়তে বাসব বলল, এর সাহায্যে বাক্সর তালাটা ভাঙব।

সত্যিই ও গজালের চাড় দিয়ে বাক্সর তালাটা ভেঙে ফেলল।

ওপরেই রয়েছে ধোপার বাড়িতে কাচা একপ্রস্থ ধুতি-জামা। তার তলায় পাওয়া গেল কয়েকটা অর্ধ-সমাপ্ত চিঠি। অক্ষরগুলো এবড়ো-খেবড়ো। লেখক লেখার ব্যাপারে খুব পটু নয় বুঝতে পারা যায়। বাসব হিন্দী পড়তে পারে না। কাজেই কাকে কি লেখা হচ্ছিল জানা গেল না।

চিঠির কাগজ, খাতার পাতা বা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নয়। বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পুরু এবং লম্বা ধরনের। বড় আকারের চৌকো ঘর কাটা। তারই ওপর ব্লু পেনসিল দিয়ে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেনসিলটাও পাওয়া গেল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সামান্য কিছু টাকা-পয়সা ছাড়া আর এমন কোন জিনিস পাওয়া গেল না, যা তদন্তের কাজে লাগতে পারে।

বাসবের মুখে আশা-ভঙ্গের বেদনা। বাক্সর ডালাটা নামিয়ে দিল ও। কাগজ তিনটি অবশ্য ওর হাতেই রইল। ভ্রূ-কুঁচকে কি যেন ভাবতে লাগল দরজার দিকে তাকিয়ে।

শৈবাল একটু অসহিষ্ণুভাবেই ঘনঘন ওর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলতে লাগল।

কি ভাবছ ?

এই ধরনের কাগজ আগে যেন কোথায় দেখেছি।

আগে দেখেছ ?

হুঁ। কিন্তু ভেবেও মনে করতে পারছি না। তুমি এই সম্পর্কে কিছু বলতে পার ?

না, ভাই। এই ধরনের কাগজ আমি আগে কখনো দেখিনি।

এখানে আর কিছু করার নেই। চল, ফেরা যাক।

দরজায় তালা লাগিয়ে দুজনে কৈলাসপতির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

বাসব চাবি তাঁর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল, ত্রিলোক লেখাপড়া জানত কি ?

সামান্য কিছু জানত।

দেখুন তো, এই লেখাটা তার কিনা ?

বাসব একখানি অর্ধ-সমাপ্ত চিঠি এগিয়ে ধরল।

কৈলাসপতি নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, তার হাতের লেখা বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু একি—

কি হল ?

দিবাকরের সম্পর্কে ঠাকুরসাহাব একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। এতেও সেই ধরনের কিছু লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

তাই নাকি ! সে চিঠিখানা আপনি দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ। দিবাকর মারা যাবার পর উনি আমাকে দেখিয়েছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে বাসব বলল, ঠাকুরসাহাব কি বেরিয়েছেন ?

না। এখন অন্দরে আছেন।

তাঁকে খবর পাঠান, আমি এখুনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিছু প্রশ্ন করার আছে।

আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

কৈলাসপতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছু বুঝলে ডাক্তার ?

কিসের ?

অর্ধ-সমাপ্ত চিঠিগুলোর কথা বলছিলাম।

ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। তুমি কোন সমাধানে আসতে পেরেছ নাকি ?

একটা অনুমান খাড়া করতে পেরেছি। মনে হয়, এই অনুমান বাস্তবের কাছ ঘেঁষেই আছে। ঠাকুরসাহাবের মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস ত্রিলোকের না থাকাই স্বাভাবিক। নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে দিবাকর মেলামেশা করছে, এ-কথা সে চিঠিতে তাঁকে জানাবে, এ-কথা স্থির করে নিজেই লিখতে বসল। বার তিনেক চিঠি খসড়া করতে গিয়ে সে অনুভব করল, তার বিদ্যায় কুলোবে না। তখন সে অন্য কাউকে দিয়ে চিঠিখানা লিখিয়ে পাঠিয়ে দিল।

অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে, তুমি বুঝলে কিভাবে ?

ঠাকুরসাহাব বললেন না, ভাষা অত্যন্ত ঝরঝরে। হাতের লেখা ভাল। ত্রিলোকের হাতের লেখা যে কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, তার প্রমাণ তো আমরা

পেয়েছি। এখন তলিয়ে দেখতে হবে, সত্যিই কি দিবাকর নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, না ত্রিলোক নিজের কোন বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে প্রভুকে জানিয়েছিল ওই কথা।

কৈলাসপতি এই সময় ফিরে এলেন।

চলুন।

ওরা দুজন তাঁর পিছু পিছু অনেক বারান্দা, অনেক প্যাসেজ মাড়িয়ে অন্দরে প্রবেশ করল। কৈলাসপতি প্রাচীন কর্মচারি। সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি। তিনি ওদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুরসাহাব ওখানেই ছিলেন। শুধু তিনি নন, শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে হেমাবতীও সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

বাসব ও শৈবাল দুইজনেই অনুভব করল, অপূর্ব সুন্দরী এই নারীকে বারবার দেখলেও যেন মন ভরে না।

আমার স্ত্রী আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

বাসব বসতে বসতে বলল, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ও'কে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। অবশ্য বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। আমার গুটিকয়েক মাত্র প্রশ্ন আছে।

মৃদু হেসে ঠাকুরসাহাব বললেন, উনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হচ্ছেন না। আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করাই আমাদের কর্তব্য।

কৈলাসপতি চলে গেলেন।

বাসব হেমাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, ত্রিলোকের হত্যাকারীর মুখ আপনি দেখতে পাননি, আমি শুনেছি। তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?

হেমাবতীর মনের মধ্যে কিছুটা আড়ষ্টতা আসাই স্বাভাবিক। কোন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তার এই প্রথম। অথচ না বলেও উপায় নেই। অসীম বলে এবার নিজের মনকে সংযত করল সে।

গাছপালার দরুণ জায়গাটা ছায়ায় ভরা ছিল। ভাল দেখতে পাইনি। লোকটাকে লম্বা বলে মনে হয়েছিল। মোটা নয়। গায়ে ওভারকোট ছিল।

ওদের কথাবার্তায় আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, দিবাকরবাবু নয়, ত্রিলোকই গয়নার বাক্সটা সরিয়েছিল। একজন চাকরের পক্ষে তা কিভাবে সম্ভব হল বলুন তো?

আলমারির চাবি আমার কাছেই ছিল। তবে সাধারণ তালা লাগানো থাকে তো। ডুপ্লিকেট সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

এ-রকম ব্যবস্থায় দামী জিনিসপত্র রাখা হয় কেন?

এবার উত্তর দিলেন ঠাকুরসাহাব।

সুরক্ষিত বাড়ি, চাকরটাও বিশ্বাসী, এই আর কি। তাছাড়া আজ পর্যন্ত চুরির ঘটনা না ঘটায় আমরা সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি।

আপনার স্ত্রীর ঘরে কি সব চাকরদেরই যাতায়াত আছে?

না। ত্রিলোকের কথা ছিল স্বতন্ত্র। সে আমার খাস-চাকর ছিল বলে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল।

সেদিন—অর্থাৎ দিবাকরবাবু যেদিন মারা যান, সেই সন্ধ্যায় আপনি কি নিজের ঘরে ছিলেন না?

হেমাবতী বুঝতে পারল, প্রশ্ন এবার তাকেই করা হয়েছে। এখন আড়ষ্টতা অনেক কেটে গেছে। ক্রমেই সহজ করে আনছে নিজেকে।

সেদিন বলে নয়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় রান্নার জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থাকি।

হুঁ। এবার দিবাকরবাবু সম্পর্কে কিছু বলুন।

এই কথার কি উত্তর দেবে হেমাবতী ভেবে পেল না।

ঠাকুরসাহাব বললেন, দিবাকর সম্পর্কে আপনি কি জানতে চাইছেন, ও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি।

আমার প্রশ্ন হল, ইদানিং দিবাকরবাবুর হাবভাব কেমন ছিল, এমন কিছু বলেছিলেন কিনা, যা বেখাপ্পা লেগেছিল শুনতে।

মিনিট কয়েক চিন্তা করে হেমাবতী যা বলল তার সারমর্ম হল, ইদানিং নাকি দিবাকরকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাত। বাড়িতে থাকত না বেশিক্ষণ। কোথায় যায় প্রশ্ন করা হলে বলেছিল, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। উড়ো চিঠিটার কথা শুনে সে নাগিনা সিংয়ের সঙ্গে মেলামেশার কথা অবশ্য অস্বীকার করেছিল। তবে মনে হচ্ছিল, বেশ ঘাবড়ে গেছে। পরের দিন তাকে বিশেষ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কোন সন্দেহজনক কথা হেমাবতী অন্তত তার মুখ থেকে শোনেনি। ত্রিলোক ও তার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কিনা সে কথা ওর পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

বাসব চিন্তিত মুখে বলল, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। মনে হয়, কিছু কাজের কথা আপনি আমাকে শুনিয়েছেন। ঠাকুরসাহাব, দিবাকরবাবুর ঘরে এবার আমাদের নিয়ে চলুন। ও-ঘরখানা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

আসুন—

ঠাকুরসাহাব ওদের দিবাকরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

এ বাড়ির অধিকাংশ ঘরের মত এ-ঘরখানিও বড়। প্রয়োজনীয় আসবাব সমস্তই আছে। খাটের তলায় বড় সাইজের ফাইবারের সুটকেশ ছিল। বাসব টেনে বার করল। চাবি লাগানো না থাকায় খুলতে অসুবিধা হল না। জামা-কাপড় বা কাগজপত্র কিছুই নেই তার মধ্যে।

তবে সম্পূর্ণ যে খালি, তাও নয়। হাতখানেক লম্বা দুটো কাঠের টুকরো রয়েছে। সোজা বা চাঁচা-ছোলা নয়। দেখে মনে হয় গাছের ছোট ডাল। একেবারে শুকনো নয়, এখনো কিছুটা সরস রয়েছে। মনে হয়, দিন দশেকের মধ্যেই ভেঙে নেওয়া হয়েছে। ভ্রু-কুঁচকে বাসব টুকরো দুটো নাড়াচাড়া করল। তারপর নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিল।

ঠাকুরসাহাব বিস্মিত গলায় বললেন, গাছের ডাল সুটকেশের মধ্যে পুরে রেখেছিল কেন ?

আমরাও অবাক হচ্ছি বটে, তবে বিনা কারণে যে রাখা হয়নি, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। কোন্ গাছের ডাল বলুন তো ?

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ঠাকুরসাহাব বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার, তুমি দেখ তো।

দেখে শুনে শৈবাল বলল, পরিচিত কোন গাছের ডাল যে নয়, এইটুকু বলতে পারি।

বাসব হাসতে হাসতে বলল, একটা কথার মত কথা বলেছ। পরিচিত কোন গাছের ডাল যে নয়, তা তো আমিও বুঝতে পেরেছি। শুঁকে দেখ তো, কোন গন্ধ পাও কিনা।

শুঁকে নিয়ে বলল, বেশ ভাল গন্ধ। গন্ধটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু চিনতে পারছি না।

আমারও ওই এক অবস্থা। ঠাকুরসাহাব, আপনি একবার শুঁকে দেখুন তো বুঝতে পারেন কিনা ?

ঠাকুরসাহাব শুঁকে নিয়েই বললেন, আমার আগেই শুঁকে দেখা উচিত ছিল। চন্দন কাঠ। ওপরের ভাগ মসৃণ করা নেই বলে আমরা চিনে উঠতে পারিনি।

এ অঞ্চলে চন্দন গাছ আছে নাকি ?

আছে বলে তো শুনিনি।

বাসব সুটকেশের মধ্যেই ডাল দুটি রেখে দিয়ে আলমারির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। বড় সাইজের দামী কাঠের সেকেলে আলমারি। এখনো পালিশ বিবর্ণ হয়নি। চাবি-বন্ধ রয়েছে। এর চাবি নিশ্চয় দিবাকরের পকেটে ছিল, এখন আছে পুলিশের হেফাজতে। ঠাকুরসাহাব বড় একটা চাবির গোছা আনালেন। মনে হল, সেটায় শ'দুয়েকের বেশি চাবি আছে।

শেষ পর্যন্ত একটা চাবি লেগে গেল।

মোট ছ'টি তাক আছে আলমারিতে। ওপরের দুটো মাত্র তাকে কাপড়-চোপড় রাখা আছে। বাকিগুলো সম্পূর্ণ খালি। বাসব খুঁটিয়ে তাক দুটো পরীক্ষা করতে লাগল। কাপড়-চোপড় ছাড়া কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রও সেখানে আছে। বাসব যখন বেশ হতাশ হয়ে এসেছে, তখনই ধুতির ভাঁজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এক চিলতে কাগজ পাক খেতে খেতে মেঝেয় পড়ল।

কাগজের টুকরোটা বাসব ব্যগ্রভাবে তুলে নিল। শৈবালও ঝুঁকে পড়ল সেই দিকে। আহামরি কিছু নয়। লেখা আছে 'পারফিউমারি সিণ্ডিকেট'। নিচে উল্লেখ রয়েছে কলকাতার তারাতলা রোডের একটা নম্বর। বাসব ঠিকানা লেখা কাগজখানা পকেটস্থ করে ঠাকুরসাহাবের দিকে মুখ ফেরাল।

চলুন যাওয়া যাক—

আলমারি বন্ধ করে সকলে ঘরের বাইরে এল।

আচ্ছা, দিবাকর বাইরে কোথাও যেতে চান—এমন কোন কথা আপনাকে বলেছিলেন কি?

বাইরে—!

হ্যাঁ। রাঁচি ফিরে যাবেন বা অন্য কোথাও যেতে চান—এই ধরনের কিছু?

একটু ভেবে ঠাকুরসাহাব বললেন, যতদূর মনে পড়ছে, খুন হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে বলেছিল, দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা যেতে চায়।

কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কোন প্রশ্ন করেছিলেন কি?

না।

আর কোন কথা হল না। বাসব ও শৈবাল অতিথিশালায় ফিরে গেল।

সঙ্গে খান পাঁচেক পত্রিকা আনা হয়েছিল। তারই একখানা নিয়ে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় মন বসাবার চেষ্টা করল শৈবাল। কিন্তু গল্পের লাইন তার মনকে ধরে রাখতে পারল না। নানা চিন্তা মনের মধ্যে জট পাকাতে লাগল। মিনিট দশেক পরে পত্রিকা ফেলে সোজা হয়ে বসে দেখল, বাসব জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখের সামনে ধোঁয়া-জাল বিস্তার হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

কি ভাবছ?

ভাবছি—যা কিছু দেখলাম, যা কিছু শুনলাম, সমস্ত একই সুরে বাঁধা কিনা।

অর্থাৎ—?

মূল ব্যাপারের সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঘটনাগুলোর কোন সম্পর্ক আছে, না নেই। মূল ব্যাপারটা কি, তার সন্ধান অবশ্য করা দরকার। অকারণে নিশ্চয়ই দিবাকর খুন হয়নি। কাজেই সেই মোটিভের নাগাল আমাদের পেতে হবে।

আর ত্রিলোক?

কেন, হত্যাকারী তো বলছে তাকে কেন সরে যেতে হবে পৃথিবী থেকে।

কখন আবার বলল সেকথা?

জানলার কাছ থেকে সরে এসে বাসব বলল, তুমি আজকাল মোটেই কান খোলা রাখ না ডাক্তার। হত্যাকারী ও ত্রিলোকের মধ্যে কি কথা হয়েছে, তা শুনেছেন দুজন। তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা ঠাকুরসাহাবের মুখে শুনেছি। হত্যাকারী এক সময় বলেছিল, 'তোমার মত সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না'। ত্রিলোককে খুন করার ওই হল মোটিভ।

চিন্তিত গলায় শৈবাল বলল, ত্রিলোকের চোখের সামনে এমন কিছু ঘটেছিল, যা পরে প্রকাশ হয়ে পড়লে হত্যাকারী বিপদে পড়তে পারে—তাই তাকে খুন করা হল। এই কথা বলতে চাইছ কি?

ঠিক তাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিলোক এমন কি জেনে ফেলেছিল বা দেখে ফেলেছিল, যার জন্যে সে বেঁচে থাকার অধিকার হারালো?

তুমি কিছু আঁচ করতে পারছ?

আমার মনে হয়, তার সামনেই দিবাকরকে খুন করা হয়েছে। ত্রিলোক অপরাধীদের দলেরই একজন ছিল। এবার দিবাকরের কথায় আসা যাক। সে বনে-জঙ্গলে কেন ঘুরে বেড়াত বলতে পার ডাক্তার?

সে শহরের ছেলে। এখানে এসে কাছাকাছি জঙ্গল পেয়ে যাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ পেত বোধহয়।

বাঘের উপদ্রব চলেছে পুরোদমে। একজন শহরের ছেলে সেকথা জেনেও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে--একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল? আমার মত সেও বোধহয় আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল—বাঘ-টাঘ কিছু নয়, একটা কারসাজি মাত্র। তাই সে স্বচ্ছন্দে জঙ্গলে যেতে পারত—

তাই বলে সে জঙ্গলে বেড়াতে যেত?

একদিন অন্তত গিয়ে সে চন্দন কাঠের ডাল দুটো ওখান থেকে সংগ্রহ করেছিল—

ঠাকুরসাহাব তো বললেন এখানে চন্দন গাছ নেই!

তা বললেন বটে। তবে ডাল দুটো যে এখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখনি, ও দুটো এখনো কাঁচা রয়েছে!

হঠাৎ বাসবের চোখ জ্বলে উঠল।

তাই তো—কি আশ্চর্য!

কি হল?

একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বাসব।

ডাক্তার—

বল।

ঝা-জীকে ভালভাবে জেরা করা দরকার। ও-ভারটা আমি তোমাকে দিতে চাই। সকালেই তুমি চলে যাবে। কি কি প্রশ্ন করতে হবে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তোমাকে জানিয়ে রাখব।

আর তুমি?

আমি সকালে যে ট্রেন পাব, তাতেই সদরে চলে যাব। এস. পি-র সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তাছাড়া আরো কাজ আছে।

ফিরবে কখন?

বিকেলের আগেই।

কলাসপতি একজন লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। সে শৈবালকে সঙ্গে করে ঝা-জীর বাড়ি নিয়ে গেল। এত সকালে তানির বেরিয়ে পড়ার কথা নয়। স বাড়িতেই ছিল। বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল শৈবালকে দেখে। এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি শৈবাল সেটা সরল ভাবেই বলল। তাকে বসিয়ে তানি দ্রুতপায়ে চলে গেল ঝা-জীকে এখানে ডেকে আনতে।

কিছুটা ভীতভাবেই গোলকনাথ ঝা এলেন।

তানির মুখ থেকে তিনি আগেই শুনেছিলেন, কলকাতা থেকে গোয়েন্দারা এসেছে। এমন কি তার সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন করেছে তারা তানির কাছে। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে নাকি দারুণ ঝামেলায় পড়তে হবে। স্থানীয় দারোগাই পাত্তা পাচ্ছেন না। আগত গোয়েন্দাদের কারবার পুলিশের বড়-কর্তাদের সঙ্গে। শুধু তানি নয়, আরো কয়েকজনের মুখ থেকে তিনি এই ধরনের কথা শুনেছেন।

শৈবাল বলল, আমি কেন এসেছি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করব, আশা করি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।

খুন সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

সে বিচার অবশ্য পরে হবে। প্রথমেই একটা কথা জানিয়ে রাখি, চোর বা ডাকাত যারাই হোক, আপনার ঘরদোর তছনছ করে দিয়ে গেছে, আপনাকে রেখে গেছে হাত-পা বেঁধে—এত বড় কাণ্ড ঘটল, অথচ আপনি পুলিশকে কোন কথা জানালেন না! ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

মানে···পুলিশকে জানাইনি—তারা আর এর কি বিহিত করতে পারবে—

তা নয়। বিশেষ কোন বিষয়কে আপনি ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ এসে পাছে সমস্ত জেনে ফেলে, এই ভয় আপনার ছিল।

না···মানে···

শুনুন ঝা-জী, আপনি আমাকে মন খুলে সমস্ত কথা বলুন। নইলে আমিই আপনাকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারি। সদর থেকে পুলিশ আসবে আপনি তখন ভীষণ গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন।

শুকনো মুখে ঝা বললেন, বলুন, কি জানতে চান?

ত্রিলোকের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

বছর দুয়েকের হবে।

কি সূত্রে আলাপ হয়েছিল?

আমি বন্ধকী কারবার করি। কারোর চিঠি লিখে দেওয়া, মনিঅর্ডার ফর্ম ভরে দেওয়া—এসব কাজও করে থাকি। দেশে ভাইকে টাকা পাঠাবার জন্য ফর্ম ভরাতে প্রথম আমার কাছে এসেছিল সে। তারপর থেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেছে।

খুন হওয়ার দুপুরেও সে এসেছিল আপনার কাছে। কি প্রয়োজনে সেদিন এসেছিল বলুন তো ?

তার ভাইকে এখানে আসবার জন্য আমাকে দিয়ে তার করিয়েছিল। ভাই উপস্থিত না হওয়ায় কিছুটা উৎকণ্ঠা নিয়ে এসেছিল।

সম্প্রতি আপনি তাকে কোন চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ?

ঝা চুপ করে রইলেন।

এই সময় তানি এক কাপ চা নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

মৃদু হেসে শৈবাল চায়ের কাপ হাতে নিল।

চুপ করে থাকবেন না। এই প্রশ্নের উত্তর আমার ভীষণ দরকার।

চিঠি···তা···

বলুন ? ঠাকুরসাহাব একটা উড়ো চিঠি পেয়েছেন। আপনি মন খুলে সমস্ত না বললে, সেই হাতের লেখার সঙ্গে আপনার হাতের লেখা মেলে কিনা পুলিশ কিন্তু পরীক্ষা করে দেখবে।

এবার ঝা-জী বেশ ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, ঠাকুরসাহাবের ভাল হবে ভেবেই আমি চিঠিটা লিখেছিলাম। ত্রিলোক বলেছিল, দেবাকরবাবু ঠাকুরসাহাবের মানসম্মান নষ্ট করে দিচ্ছেন—নাগিনা সিংয়ের মত শত্রুর সঙ্গে মেলামেশা করছেন। মালিককে মুখে বলার সাহস তার নেই। চিঠি লিখে সাবধান করে দিতে চায়। তাই—

বিনা পারিশ্রমিকে চিঠিখানা লেখেননি বোধহয় ?

আমাকে দশটা টাকা দিয়েছিল। তখন বুঝতে পারিনি, পরে এই নিয়ে গোলমাল হতে পারে।

শৈবাল পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল, এবার আপনার বাড়িতে চোর ঢোকার কথায় আসা যাক। আপনি পুলিশে খবর দেননি কেন ?

পুলিশ এসে কি করবে, বলুন ?

তদন্ত করবে। চোরকে ধরে ফেলতেও পারে। সেদিন কি কি জিনিস চুরি হয়েছিল ?

কিছুই না।

আমিও শুনেছি সেকথা। চোর সমস্ত হাঁতড়েছে, কিন্তু কিছু নিয়ে যায়নি ! এর মানে কি ?

কি করে বলব ?

আমরা কিন্তু এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় এসেছি। চোর কোন বিশেষ জিনিস খুঁজতে এখানে এসেছিল। পুলিশ সেই বিশেষ জিনিস দেখতে পেয়ে যাক, তা আপনি চাননি বলেই থানায় খবর পাঠাননি।

বিশ্বাস করুন, তেমন কোন ব্যাপারই নয়। পুলিশে খবর দেওয়া মানেই নানা ঝামেলা ঘাড় পেতে নেওয়া। শুধু এই কারণেই ও-পথ মাড়াইনি।

আপনার কথার ওপর বিশ্বাস রাখার কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যা হোক, কাল সকালেই পুলিশ এসে এ-বাড়ি সার্চ করবে। তৈরি থাকবেন।

কথা শেষ করেই শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল তানি। ওকে দেখে এগিয়ে এল।

চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। আপনি কাজে বেরুচ্ছেন নাকি ?

মাথা নিচু করে তানি বলল, আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

ওদিকে—

বাসব যখন স্টেশনে পেঁছিল, তখন প্ল্যাটফর্মে তেমন যাত্রি সমাগম হয়নি। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল, টাইম টেবিলের সময়ানুসারে ট্রেন আসতে এখনও কুড়ি মিনিট দেরি। পাইপ ধরিয়ে মন্থর পায়ে ও স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে এগোল। টিকিট আগেই কাটা হয়ে গেছে।

শ্রীকান্ত দত্ত তখন ফোনে আগের বা পরের কোন স্টেশনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেও ফোনে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বাসব বেশি দূর না এগিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। উনি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মৃদু হেসে ও নমস্কার জানাল। তারপর পরিচয় দিল নিজের।

শ্রীকান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কি সৌভাগ্য! বসুন—বসুন। কাল সোমবাবুর বাংলোয় গিয়েছিলেন শুনলাম। আমি খবর পেলেই উপস্থিত হতাম।

তদন্তের ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন কিন্তু সে কারণে আসিনি মাস্টারমশাই। মুঙ্গেরে একটু কাজ আছে। ট্রেন ধরতে এসেছি।

ট্রেন ধরতে ? তাহলে কম করেও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

গাড়ি লেট নাকি ?

গয়া প্যাসেঞ্জার রাইট টাইমে বড় একটা আসে না। কত লেটে আসছে তাই তো কিউলের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলাম।

বেশ ঝামেলায় পড়ে গেলাম দেখছি। আমি তো দুপুরে ফিরে আসব ভেবেছিলাম।

কি করবেন, যস্মিন দেশে যদাচার। এধারের ট্রেনের এই রকমই মতিগতি। মাঝ থেকে আমার লাভ। আপনাকে কিছুক্ষণ কাছে পাওয়া যাবে। চা আনতে বলি ?

বলুন।

শ্রীকান্ত একজন পোর্টারকে ডেকে চায়ের আদেশ দিলেন। টেবিলের ওপর

অনেক কাগজপত্র ছড়ানো ছিল। সেগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

মাস্টারমশাই, এখানে কতদিন ধরে আপনি আছেন ?

দুঃখের কাহিনী আর কি বলব ! পাঁচ বছর ধরে এই ওঁচা জায়গায় পড়ে আছি। এত তদবির করছি, কিন্তু ওপরওয়ালা বদলির কথা কানেই তুলছে না।

ফ্যামিলি নিয়েই এখানে আছেন বোধহয় ?

এদিক দিয়ে আমায় ভাগ্যবান বলতে পারেন। ওসব বালাই নেই। একা মানুষ। খাইদাই আর কাঁসি বাজাই।

বাসব নড়েচড়ে বসে বলল, এবার একটু কাজের কথা হোক। আপনিও তো সুদর্শন অরোরার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ওখান থেকে ফেরার পথের অভিজ্ঞতা কিছু বলুন।

আমার জীবনের সে এক ভয়ঙ্কর রাত। সিরাজ মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে সোমবাবু আগে বিদায় নিলেন। তারপর আমি, দারোগাসাহেব আর ডাক্তার ঘোষাল বেরোলাম। কিছু দূর যেতে না যেতেই বৃষ্টি এসে গেল। তারপরই রক্ত জল-করা সেই ডাক! ফুল স্পিডে জিপ ছুটিয়ে কোনরকমে প্রাণটুকু রক্ষা করতে পেরেছিলাম বলতে পারেন।

জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছিলেন নাকি ?

না। তাকে দেখার বাসনাও আমাদের ছিল না। ডাক শুনেই তো আধ-মরা হয়ে গিয়েছিলাম।

চা এসে পড়ল।

শ্রীকান্ত পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে বললেন, রামভরোসা, তরিতরকারি কিনে কোয়ার্টারে চলে যা। বেশি ঝাল-টাল যেন না হয়। আজ বাবা একটু মন দিয়ে রাঁধিস!

রামভরোসা টাকা নিয়ে চলে গেল।

বাসব বলল, ও আপনার রান্নাবান্না করে দেয় বুঝি ?

হ্যাঁ, রামভরোসাই আমার ভরসা।

আচ্ছা মাস্টারমশাই, দিবাকরবাবুকে আপনি চিনতেন ?

স্টেশনে কয়েকবার এসেছিলেন ভদ্রলোক। সামান্য আলাপ ছিল।

আর ত্রিলোককে ?

তাকে আমি কখনো দেখিনি। ঠাকুরসাহাবের হাবেলিতে তো আমার যাওয়া-আসা নেই—

এই খুন দুটো সম্পর্কে আপনার কি অভিমত মাস্টারমশাই ?

রহস্যজনক ঘটনা তাতে আর সন্দেহ কি। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারের সঙ্গে নাগিনা সিংয়ের কোন সম্পর্ক আছে। তাঁর নাম শুনেছেন তো ?

তা শুনেছি। কিন্তু—

ঠাকুরসাহাব আর নাগিনা সিংয়ের সম্পর্ক অহি-নকুলের। খুন হয়ে যাওয়া দুজন ঠাকুরসাহাবের নিজের লোক বলেই আমার এই সন্দেহ হচ্ছে।

হুঁ। আচ্ছা, সেমাপুর থেকে মুঙ্গেরে যাবার মোটরের কোন পথ আছে ?

না। কিউল হয়ে অবশ্য পাটনা যাবার পথ আছে।

বাসবের মনে পড়ে গেল, কিউল থেকে বাই কার এখানে এসেছিল। পথ অবশ্য সঙ্কীর্ণ, মার্ক টু বা ওই জাতীয় গাড়ি পথ দিয়ে কোনরকমে আসতে পারে। ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল প্রলয়, তার পেছনে সিরাজ মল্লিক আর সুদর্শন অরোরা।

একি, মিস্টার ব্যানার্জী—!

মুঙ্গের যাবার ইচ্ছে আছে। ট্রেন কখন আসে দেখুন।

বাসবের সঙ্গে দুজনের আলাপ করিয়ে দিল প্রলয়। জানা গেল, যদিও সিরাজ মল্লিক এখন ভাল আছে, তবুও সদর হাসপাতালে চলেছে চেক-আপের জন্য। সুদর্শন অরোরা মুঙ্গেরে যাচ্ছেন ব্যবসায়িক কাজে।

বাসব বলল, জটিল এক তদন্ত হাতে নিয়ে এখানে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল। দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হল।

অরোরা বলল, আপনাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত আছি। ঠাকুরসাহাব আপনাকে এখানে জানিয়ে ভালই করেছেন। আমাদের দারোগা শুধু আকাশে কেল্লা বানাতে ওস্তাদ, হত্যাকারী ধরা তাঁর কর্ম নয় !

এতটা আস্থা আমার ওপর রাখবেন না। তবে এ সমস্যার কূলে যাতে পৌঁছনো যায়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমি করব—এ নিশ্চয়তা দিতে পারি। তবে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল, আপনাদের স্পষ্ট কথার ওপরই কিন্তু সমস্ত কিছু নির্ভর করছে।

প্রলয় বলল, আমার তো মনে হয় যে যা জানেন পরিষ্কার করেই বলবেন। আমি অন্তত কোন কথা লুকোইনি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে টান দিতে দিতে বলল, মাস্টারমশাই, একটা নিরিবিলি জায়গার সন্ধান দিতে পারেন ?

আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীকান্ত।

নিরিবিলি জায়গা !

হ্যাঁ। মিস্টার মল্লিক আর সর্দার অরোরার সঙ্গে আমি আলাদা আলাদা ভাবে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।

তাই বলুন। নিরিবিলি জায়গার অভাব কি ? মাল খালাস করার শেডে এখন কেউ নেই। ওখানে গিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন।

বাসব অরোরাকে সঙ্গে নিয়ে শেডের দিকে চলে গেল। মাল খালাস করা বা মাল এখান থেকে বাইরে পাঠানোর জায়গাটা সত্যি এখন সম্পূর্ণ নির্জন। লাইনের ওপর দুটো ওয়াগন দাঁড় করানো রয়েছে। ওয়াগনের পাল্লা খোলা।

পরে ও-দুটোতে কিছু ভরা হবে বোধহয়। গোটা কয়েক খালি প্যাকিং বাক্স এধার-ওধারে পড়েছিল। দুটো বেছে নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে ওরা বসল।

আমি কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্ন করতে চাই—

বেশ তো, করুন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন কেন—যখন জানতেন বাঘের উপদ্রব হচ্ছে?

খুবই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। বলতে গেলে আমারই জন্যে বি. ডি. ও. সাহেব আর সিরাজ মল্লিক সেদিন মরতে মরতে বেঁচেছেন। কিন্তু কি জানেন, আমন্ত্রণ জানাবার সময় বাঘের ব্যাপারটা আমার একেবারেই মনে আসেনি।

আপনি বাঘটাকে দেখেছেন?

দেখিনি। ডাক শুনেছি।

আপনার তো স্টোন চিপসের ব্যবসা। পাহাড় থেকে পাথর খসিয়ে আনার কি ব্যবস্থা করেন?

ডিনামাইট চার্জ করে চাঙড় খসিয়ে আনা হয়। তারপর লেবাররা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে চিপস তৈরি করে।

ঘনঘন ডিনামাইট চার্জ করতে হয় নিশ্চয়?

হ্যাঁ। দিন দুয়েক কাজ বন্ধ আছে, নইলে আপনি এখানে বসেই আওয়াজ শুনতে পেতেন।

ডিনামাইটের আওয়াজের ফলে জংলী জানোয়ারদের তো ধারে কাছে থাকার কথা নয়! তবু বাঘটা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল কিভাবে?

চিন্তিত গলায় অরোরা বলল, তাই তো! ওই রকম ঘনঘন আওয়াজে বাঘের তো এ তল্লাটে থাকবার কথা নয়। কি আশ্চর্য দেখুন, আমরা কেউই ব্যাপারটাকে এই দিক দিয়ে চিন্তা করিনি।

তাছাড়া দেখুন, বাঘটাকে কেউই দেখেনি। আরো মজার ব্যাপার, ত্রিলোক মারা যাবার পর থেকে তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

আপনার যুক্তিতে ধার আছে। কিন্তু আমি যে কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। ঠাকুরসাহাব শিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। হয়ত মারা পড়ার ভয়ে বাঘটা সত্যিই এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করার দরকার।

বাঘের সঙ্গে খুনের কি কোন সম্পর্ক আছে?

এখন বলতে পারি না। আসল কথা হল, সমস্ত দিক আমাদের বাজিয়ে দেখতে হয়। দিবাকরবাবুর সংগে আলাপ ছিল নাকি?

মুখ-চেনা ছিল। এই স্টেশনেই দেখা হয়েছে আমাদের।

ত্রিলোককে চিনতেন?

না, তাকে আমি কোনদিন দেখিনি।

আচ্ছা, দিবাকরবাবুর সংগে কার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল বলতে পারেন?

ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কথা বলতে পারি না। তবে—

বলুন?

নাগিনা সিংয়ের নাম শুনেছেন কিনা জানি না। ঠাকুরসাহাবের শত্রু এবং তাঁরই মত পয়সাওয়ালা। ওই নাগিনা সিংয়ের সংগে দিবাকরবাবুকে একদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে দেখেছিলাম মুঙ্গেরে। হোটেলে খানাপিনা চলছিল।

আপনাকে ওরা দেখতে পেয়েছিল?

বলতে পারব না।

আপনাকে আর আটকে রাখব না। অনুগ্রহ করে মল্লিককে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

সুদর্শন তারোরা চলে গেল।

বাসব নতুন করে পাইপ সাজিয়ে ধরাল। তাকাতে লাগল এধার-ওধার। টানা শেডের লাগোয়া লম্বা ধরনের গোডাউন। ছাদ এবং দেওয়াল—দুই-ই টিনের। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গোডাউনের দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা অল্প একটু দেখা যায়।

এই সময় সিরাজ মল্লিক এসে পড়ল।

প্যাকিং বাক্সটা দেখিয়ে বাসব বলল, দামী চেয়ারটায় বসুন।

মৃদু হেসে মল্লিক বসল।

দিবাকরবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল নাকি?

সামান্যই। ঠাকুরসাহাবের কাজ নিয়ে আমার কাছে কয়েকবার এসেছিলেন। তখনই যা দু-চার কথা হত।

ভদ্রলোককে শেষ কবে দেখেছিলেন?

মনে মনে হিসাব করে মল্লিক বলল, পাঁচুই নভেম্বর। সেদিন রবিবার ছিল। মুংগেরে গিয়েছিলাম বলেই তারিখটা মনে পড়ল।

কি কথাবার্তা হয়েছিল?

কথাবার্তা আর কই হল। উনি সেদিন আমায় এড়িয়ে গেলেন।

কি রকম?

আমি কেল্লার বড় গেটটা দিয়ে বেরচ্ছি, দেখলাম কিছুটা আগে চলেছেন দিবাকরবাবু। নাম ধরে ডাকলাম। বেশ বুঝতে পারলাম শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু সাড়া দিলেন না। চলন্ত একটা রিক্সা থামিয়ে তাতে চেপে চলে গেলেন।

তারপর?

কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁকে দেখলাম। সার্ট কিনতে 'সালামান ড্রেসেস-এ' ঢুকেছিলাম। রাস্তার অপর পারেই 'বিহার রেডিও স্টোর'। হঠাৎ দেখি, রেডিওর দোকান থেকে দিবাকরবাবু বেরিয়ে আসছেন। এবার অবশ্য আমি

ার তাঁকে ডাকলাম না।

তাঁর হাতে কি কিছু ছিল?

ছোট একটা মোড়ক ছিল।

হুঁ। ত্রিলোককে চিনতেন?

না।

কিভাবে আহত হয়েছিলেন, তার বিবরণ আমি মিস্টার সোমের কাছে পয়েছি। ও বিষয়ে আর প্রশ্ন করব না। বাঘের ডাকটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমবার ডাক শুনেই আমি নার্ভাস হয়ে াড়েছিলাম। খোলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি—বুঝতেই পারছেন অবস্থা। দ্বতীয়বার ডেকে উঠতেই আর নিজেকে সামলাতে পারিনি।

খুব কাছাকাছিই কি ছিল জন্তুটা?

হয়ত কাছেই ছিল। গর্জনে চারধার গমগম করে উঠেছিল।

খুন দুটো সম্পর্কে আপনি কিছু ভেবেছেন?

ভাবিনি বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। তবে কোন কূলকিনারা পাইনি। মন রহস্যপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করার সুযোগ আমার আগে হয়নি।

আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। চলুন, ওখানে যাওয়া যাক। ট্রেনের ময় বোধহয় হয়ে এল।

বাসব ও মল্লিক স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে এগোল।

বাসব যখন মীর্জা হাবেলিতে ফিরল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

শৈবাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। দুপুরে ফিরে আসবে বলে সেই কান সাত-সকালে বেরিয়েছে। তারপর এত সময় গড়িয়ে গেল, পাত্তা নেই! াকুরসাহাবও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। খোঁজ নিয়েছেন কয়েকবার।

কিহে, তোমার এত দেরি হল?

বাসব ক্লান্তভাবে বসে পড়ে বলল, আর বল কেন, ট্রেনের মতিগতিতে মুঙ্গেরে পঁছতেই তো তিন ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। তারপর বাকি সময়টা গেল াজ সারতে।

কিছু লাভ হল?

ষোল আনা। অবশ্য আমাদের পুরনো বন্ধু মেহরা না থাকলে বেশ াসুবিধায় পড়ে যেতাম।

মিস্টার মেহরা এখন মুঙ্গেরের এস. পি. নাকি? ভালই হল। অনেক ুবিধা তুমি তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

ও-কথা থাক। সকালে কি করে এলে বল?

ঝা'র সঙ্গে কি কথা হয়েছে শৈবাল বলল।

বাসব মৃদু হেসে বলল, তুমি জেরা করার মাস্টার হয়ে উঠেছ দেখছি।

তোমার উন্নতিতে খুশি হলাম ডাক্তার। সেই লোকটা কোথায় ?

কোন্ লোকটা ?

এখানকার একজন দারোয়ান তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল না—

তোমার কথা মত তাকে পাহারায় রেখে এসেছি।

এবার আমাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়া দরকার।

দরজার ওপাশেই একজন চাকরকে পাওয়া গেল। খাবার এখানে নিয়ে আসবার কথা তাকে বলে দেওয়া হল। ওরা এখানে আসবার পর থেকেই এই ঘরে বসেই খাওয়া-দাওয়া সারছে।

শৈবাল বলল, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি অনেক কথা চেপে যাচ্ছ।

সবই তুমি জানতে পারবে। আজ দুপুরে মুঙ্গেরে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছি। তবু হত্যাকারী এখনও তিমিরেই রয়ে গেছে।

কোন আঁচ পাওনি ?

মোটিভের আঁচ একটু পেয়েছি।

কি রকম ?

এখন নয়, কাল এ প্রশ্নের উত্তর দেব। খাবার আসবার আগেই নিজেদের গরম কাপড়ে মুড়ে ফেলা যাক। নইলে বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে গ্রেটকোট তুলে নিল।

রিস্টওয়াচের রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা জানিয়ে দিচ্ছে, ন'টা বাজতে এখনও মিনিট পনের বাকি আছে। অথচ চারধারের নিঝুম নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করলে মনে হয় রাত এখন অনেক গভীর। গ্রামের মানুষ সন্ধ্যার জেরকে শহরের মত রাত বারটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে এখনও শেখেনি। চাঁদ পুবের আকাশে সবেমাত্র উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। তবু ছেয়ে রয়েছে চারধারে গাঢ় অন্ধকার।

টর্চের আলো ফেলে ফেলে কোনরকমে বাসব ও শৈবাল নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পেঁছিল। নতুন জায়গা বলেই অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে ওদের এতটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই আরেকজন এসে উপস্থিত হল। বলা বাহুল্য, তৃতীয় ব্যক্তি ঠাকুরসাহাবের একজন দারোয়ান।

বাসব ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করল, বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়েছে নাকি ?

আজ্ঞে না।

হাত পঞ্চাশ দূরেই একটা বাড়ি। জানালার ফাঁক দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছে বলেই তার অবস্থান বুঝতে পারা যাচ্ছে। নইলে অন্ধকারে একাকার

হয়ে থাকত। সময় এগিয়ে চলল। মশারা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সভ্য-জীবদের ফলার করার সুযোগ আগে বোধহয় তারা পায়নি।

ঘড়ির কাঁটা ক্রমে সাড়ে দশটা অতিক্রম করল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যে জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, তা সফল হবার সম্ভাবনা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। শুকনো পাতার ওপর দ্রুত শব্দ তুলে কি একটা চলে গেল। বোধহয় শেয়াল। মানুষের উপস্থিতি সে বুঝতে পেরেছে।

আরো আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর যেন ভাগ্যক্রমে ধৈর্য পরীক্ষা শেষ হল। অদূরের একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল। দরজা যে খুলে গেছে, তা বুঝতে পারা গেল লম্বা ধরনের আলো বারান্দায় এসে পড়ার দরুণ। একজন বেরিয়ে এসে আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।

তারপর সে বারান্দা থেকে নিচে নামল। হাতে তার আলো নেই, তবু সে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচিত পথ বলেই তা সম্ভব। সে এগোতে এগোতে ওদের সামনে এসে পড়ল। মাত্র কয়েক হাত তফাতে তিনজন লোক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে, কিভাবেই বা বুঝবে?

ঠিক এই সময় টর্চ ঝলসে উঠল।

বাক্সটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আসবার জন্য চলেছেন বুঝি?

এক মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেলেন গোলকনাথ ঝা। তারপরই পাকসাট খেয়ে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আশা ফলবতী হল না। শৈবাল অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলেছে। বৃদ্ধ মানুষ সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপাতে আরম্ভ করেছেন।

বাসব এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে-ধরা মাঝারি সাইজের বাক্সটা নিয়ে নিল। ঝা দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা নিচু করে। ঠিক এই সময় আরেকটা ব্যাপার ঘটল। তীব্র আলো ফেলে কে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল তিনি স্বয়ং ঠাকুরসাহাব। এক হাতে তাঁর হান্টিং টর্চ, অন্য হাতে রাইফেল।

এ কি, আপনি?

আপনারা এই অসময়ে হাবেলি থেকে বেরিয়েছেন শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। যদি কোন বিপদ-টিপদ ঘটে—

বিপদ কিছু ঘটেনি। তবে আপনি লাভবান হয়েছেন। এই নিন—

একটু হেসে বাসব বাক্সটা এগিয়ে ধরল।

কি এটা?

আপনার স্ত্রীর গয়না এর মধ্যেই আছে, আশা করছি।

অভিভূত গলায় ঠাকুরসাহাব বললেন, গয়নাগুলো উদ্ধার করেছেন! আপনি তো নয়কে হয় করে দিলেন। একি, এ লোকটা কে?

এখানকারই লোক। এঁর কাছ থেকেই গয়নার বাক্সটা পাওয়া গেছে।

এবার শৈবালের হাত থেকে নিজেকে কোনরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরসাহাবের পায়ে আছড়ে পড়লেন গোলকনাথ ঝা। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন বোধহয়। কিন্তু কি বলতে চাইছেন, তা এক বর্ণও বুঝতে পারা গেল না।

বাসব বলল, গয়নার বাক্সটা এঁর কাছে পাওয়া গেলেও ইনি চুরি করেন নি, লোভে পড়ে হজম করবার চেষ্টা করছিলেন মাত্র। থানা-পুলিশের ঝামেলায় আর যাবেন না। এঁকে ছেড়ে দিন।

ঠাকুরসাহাব কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন, কিন্তু দুরন্ত এক বাধা তাঁকে মূক করে দিল। বাঘের গম্ভীর গর্জনে চারধার কেঁপে উঠল এই সময়। তারপর উচ্চগ্রামের সেই চিৎকার চলল কয়েক মিনিট ধরে। শৈবালের সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। এ এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞ শিকারী ঠাকুরসাহাব রাইফেল বাগিয়ে ধরে চাপা গলায় বললেন, রক্তের নেশা পাগল করে তুলেছে জন্তুটাকে।

বাসব প্রশ্ন করল, কাছাকাছিই আছে বলে মনে করেন?

খুব বেশি দূরে নেই।

কিন্তু ডাক থেমে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পরও তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। ঠাকুরসাহাব সকলকে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোলেন। এখান থেকে হাবেলির দূরত্ব সিকি মাইল হবে। ঝা-জী ছাড়া পেয়েই প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন নিজের বাড়ির দিকে।

হাবেলি পেঁছিতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ সময় লেগে গেল। আর বাঘের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়নি। দেউড়ি পেরিয়ে ঠাকুরসাহাব বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে নিজের খাসকামরায় প্রবেশ করলেন। গয়নার বাক্সটা রাখা হল টেবিলের ওপর। তারপর রাধিয়াকে ডেকে সংবাদ পাঠানো হল হেমাবতীর কাছে।

এবার বলুন তো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে।

আপনার ত্রিলোকের বোধহয় বহুদিন থেকেই মোটা কিছু সরাবার ইচ্ছে ছিল। আমি অনুমান করছি, হত্যাকারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাজেই দিবাকরের খুন হওয়ার কথা তার অজানা থাকেনি। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নিল। ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে গয়নার বাক্সটা সরিয়ে ফেলল। লোকের মনকে অন্যদিকে মোড় ঘুরোবার জন্যে একটা কানের দুল ফেলে গেল দিবাকরের বিছানার ওপর। যেন অসাবধানতায় ওটা রয়ে গেছে। এই সঙ্গে আপনাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হবে, দিবাকর যখন গয়না নিয়ে পালাচ্ছিল, তখনই খুন হয়েছে। তারপর হত্যাকারী সরে পড়েছে মাল নিয়ে।

বাসব একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করল, যে লোকটিকে ছেড়ে দিতে বললাম, সে হল ঝা। ত্রিলোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শুনলে অবাক

হবেন, ত্রিলোকের কথায় সেই আপনাকে বেনামী চিঠিখানা লিখেছিল। যা হোক, গয়নার বাক্সটা ত্রিলোক তার কাছে রাখতে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠাল। ভাই এলেই মাল অন্যত্র পাচার করে দেবে। কিন্তু বেচারা মারা গেল। ঝা-র তখন পোয়াবারো। বিনা আয়াসেই অনেক টাকার জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। সেই রাত্রেই তার ঘরে চোর ঢুকল। নিশ্চিতভাবে গয়নার সন্ধানেই চোরের আগমন। কিন্তু ব্যর্থতার বোঝা ঘাড়ে নিয়েই তাকে ফিরতে হল। ঝা'র ওপর আমার সন্দেহ হল একটি মাত্র কারণে। এতবড় কাণ্ডর পরও সে পুলিশে খবর দিল না কেন? তার ঘরে কি এমন বস্তু আছে, যা পুলিশ দেখতে পেলে সে বিপদে পড়বে? তাই সে ও-পথ মাড়ায়নি। তবে কি গয়নার বাক্স? কাজেই আমাকে টোপ ফেলতে হল। শৈবাল আজ সকালে নানা কথার পর জানিয়ে এল, কিছু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং আগামীকাল পুলিশ এসে তার ঘর ভালভাবে সার্চ করে দেখবে। ঝা প্রমাদ গুণলো। মাল তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। এবং সকলের চোখ বাঁচাতে গেলে রাতের অন্ধকারই প্রশস্ত। তবুও শৈবাল আপনার দারোয়ানকে পাহারায় রেখে এসেছিল। এরপর কি ঘটেছে, তা আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই হেমাবতী ঘরে প্রবেশ করল। 'গয়নার বাক্সটা খুলে ধরতেই তার চোখে যেন হাজার বাতি জ্বলে উঠল। হারানো জিনিস আবার ফিরে পাওয়া যাবে—এ তো কল্পনার অতীত। দ্রুত হাতে সে সমস্ত মিলিয়ে দেখতে লাগল।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

বাসববাবুকে ধন্যবাদ দাও। উনিই এই অসাধ্য সাধন করেছেন।

হেমাবতীর মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

হত্যাকারী কে আপনি বুঝতে পেরেছেন?

এখনো বুঝতে পারিনি। তবে ক্রমেই আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে। আচ্ছা, আপনি ঠিক জানেন এদিকে চন্দন গাছ নেই?

আমি তো তাই জানি।

হাবেলির কিছু দূর দিয়ে যে পাহাড় চলে গেছে, ওটা কার?

আগে কিছু অংশ আমাদেরই ছিল, এখন সরকারের। তবে পাহাড়ের ওধারের জায়গাটা আমার।

ওখানে কি হয়?

জঙ্গল। কিছু কিছু শাল গাছও আছে। সহজ পথ না থাকায় কেটে আনার উপায় নেই।

ইদানিং ওধারে গেছেন নাকি?

মৃদু হেসে ঠাকুরসাহাব বললেন, ইদানিং কি বলছেন! আমি বোধহয়

বছর বিশেক ওধারে যাইনি। কোন দরকার তো পড়ে না। এধারেই প্রচুর শিকার পাওয়া যায়।

হুঁ। ঠাকুরসাহাব, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন ?

সেদিন—অর্থাৎ সুদর্শন অরোরার ওখানে যাঁরা যাঁরা গেছলেন, প্রত্যেককে আপনিও খাবার নিমন্ত্রণ জানান—

ঠাকুরসাহাব অবাক হলেন। হেমাবতীও।

দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আপনারা অবাক হচ্ছেন বোধহয় ? বিশেষ প্রয়োজনেই কিন্তু আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

কবে সকলকে ডাকতে হবে বলুন ?

পরশু দুপুরে।

বেশ।

এরপর ঠাকুরসাহাব ওদের বিশ্রাম করতে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কারণ রাত ক্রমেই গভীর হচ্ছিল।

ভোরবেলা বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে হাবেলি থেকে বেরিয়ে পড়ল। মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল ওরা পাহাড়ের দিকে। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডায় দুজনের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। জানুয়ারী মাসে না জানি এখানে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়।

পাহাড়ের গায়ের কাছে এসে বাসব বলল, কত উঁচু হবে বলে তোমার মনে হয় ডাক্তার ?

পাঁচ-ছ'শো ফিটের বেশি হবে না।

আমারও তাই মনে হয়। চল, ওঠা যাক।

ওঠা যাক মানে ?

বাঃ, আমাদের ওধারে যেতে হবে না !

শৈবাল আর কিছু বলল না। দুজনে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পর্বতারোহীরা হাজার হাজার ফিট ওঠে কিভাবে ভগবান জানেন ! অনেক ধাক্কা খেয়ে, বহুবার টাল সামলে, বহু সময় নিয়ে যখন ওপরে পেঁছিল, তখন দুজনেই হাঁপাচ্ছে।

এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। তাই ওরা বসে পড়ল।

এখান থেকে সমস্ত জনপদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যেন ছবি। মীর্জা হাবেলির আকার এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। দূরের আকাশ ধোঁয়ায় ভরে আছে। বোধহয় সেমাপুর স্টেশনে এখন এসে দাঁড়িয়েছে কোন ট্রেন। উত্তর দিকে যতদূর চোখ যায়, পাহাড় ঘেঁষে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

মিনিট পনের দুজনে চুপচাপ বসে রইল। তারপর পাইপ ধরিয়ে বাসব বলল,

হত্যাকারী আমাকে খুব বোকা ভেবেছে—

কিভাবে বুঝলে ?

কাল বাঘের ডাক শুনলে না ?

তার মানে ?

পরে বলব। এখন উঠে পড়, ওধারে নামতে হবে।

নামবার সময় কিন্তু ওঠার মত কষ্ট হল না। বেশ দ্রুতই জঙ্গলের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ঝোপঝাড়। বড় বড় গাছও আছে প্রচুর। ওই সমস্ত গাছের গা বেয়ে লতা উঠে গেছে ওপরে। মনে হয় যেন আদিম অরণ্যের মুখোমুখি হয়েছে ওরা।

ডান দিকটা এগোবার পক্ষে কিছুটা সুগম দেখে, ওরা ওই দিক ঘেঁষেই এগলো। চারধারে তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোতে হচ্ছে। বুনো শুয়ার বা অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। মিনিট দশেক লক্ষ্যহীন ভাবে এগোবার পর বাসব থামল। সামনেই একটা দেবদারু গাছ। গাছের ওপাশের জমিতে তেমন ঝোপ নেই। ঘাসও উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়।

দেখছ ?

লোক চলাচল করে বোধহয়।

পায়ের চাপেই ওই সরু রাস্তাটা সৃষ্টি হয়েছে। আমার মন বলছে, আমি যা সন্দেহ করেছি, শেষ পর্যন্ত তাই হয়ত বাস্তবে রূপ নেবে। এখন এই পথ অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এস—

আবার এগনো শুরু করল দুজনে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানে ঝোপঝাপ একেবারেই নেই। প্রাকৃতিক নিয়মে নয়, কেটে ফেলা যে হয়েছে তারই চিহ্ন চারধারে উগ্রভাবে প্রকট। তবে ঝোপঝাড় নেই বলে যে সমস্ত প্রস্তরটা একেবারে ফাঁকা, তা কিন্তু নয়; অজস্র মাঝারি সাইজের গাছ ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক গাছ কেটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গোটা দুয়েক কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এখনো।

কি দেখছ ডাক্তার ?

উত্তেজিত ভাবে শৈবাল বলল, চন্দন গাছ !

কয়েক লক্ষ টাকার চন্দন গাছ। খুনের এই হল মোটিভ।

আমি কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কিছু বুঝতে পারছি না।

ওকথায় কান না দিয়ে বাসব বলল, যদিও ঠাকুরসাহাব বলেছেন, পাহাড় ডিঙিয়ে এপাশে আসার আর কোন পথ নেই, তবু আমার নিশ্চিত ধারণা, তিনি যাই বলুন না কেন—কোন না কোন দিকে পথ একটা আছেই। গোটা তিরিশেক গাছ কাটা হয়েছে মনে হচ্ছে। ওই পথ দিয়েই কাঠ বয়ে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে।

তুমি এখন সেই পথের সন্ধান করবে নাকি ?

মোটেই না। যা আশা করেছিলাম, তা যে দেখতে পেয়েছি এই যথেষ্ট। পাহাড় ডিঙিয়ে আবার আমরা ফিরে যাব। বুঝলে ডাক্তার, দুর্বার লোভ মানুষকে সাপটে ধরলে এমন কোন কুকাজ নেই যা সে করতে পারে না।

তুমি তো ক্রমাগত হেঁয়ালিই করে যাচ্ছ। এদিকে আমার পক্ষে ধৈর্য রাখা দায় হয়ে পড়েছে। খুলে বলবে কি ?

নিশ্চয় বলব—ফেরার পথেই সব বলব তোমাকে। ভাল কথা, আজ দুপুরেই আবার মুঙ্গের যাচ্ছি। মিঃ মেহরার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। তাঁর সহযোগিতা না পেলে শেষরক্ষা করা যাবে না। সন্ধ্যার মুখে ফিরে আসতে পারব আশা করছি। চল, ফেরা যাক।

সেকেলে কায়দায় সাজানো বিরাট হলঘর। দেওয়ালের চারধারে গিল্টি-করা ফ্রেমে অয়েলপেণ্টিং। মীর্জা হাবেলির গতদিনের প্রখ্যাত পুরুষ হলেন এঁরাই। এই ঘরটা অতিথি অভ্যাগতরা না এলে বড় একটা খোলা হয় না। আজ অতিথি সমাগমের এমনি একদিন।

মখমলের তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে ঠাকুরসাহাব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক এগারটার ঘরে। ঘরে তিনি একা নন, শৈবাল এবং সিরাজ মল্লিকও রয়েছে। মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ যখন, তখন অনতিবিলম্বেই অন্যান্য সকলে এসে পড়বেন আশা করা যায়।

বাসব কিন্তু হাবেলিতে নেই।

ঘণ্টা কয়েক আগে জিপ নিয়ে বেরিয়েছে।

প্রলয় ও শ্রীকান্ত দত্ত এলেন। দেউড়ির কাছেই কৈলাসপতি অপেক্ষা করছেন। অতিথিরা এলেই পেঁৗছে দিচ্ছেন হলঘরে। আরো মিনিট কুড়ি পরে একই সঙ্গে এলেন ডাঃ ঘোষাল, সুদর্শন অরোরা ও দারোগা রাজেশ সিনহা। ঠাকুরসাহাবকে একেবারেই পছন্দ করেন না সিনহা। অনিচ্ছার সঙ্গেই এসেছেন।

ক্রমে বারটা বাজল।

ঘন ঘন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছেন ঠাকুরসাহাব।

বাসব দেখা দিল একটা বেজে যাবার কয়েক মিনিট পর। সে একা আসেনি। সঙ্গে এসেছেন মুঙ্গেরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ কুলদীপ মেহরা। বড়কর্তাকে দেখে রাজেশ সিনহা তটস্থ হয়ে উঠলেন। দারোগাপুঙ্গব কল্পনাই করতে পারেননি, এই সময় তিনি এখানে পদার্পণ করবেন।

বাসব বলল, আমার জন্য আপনারা বসে আছেন বুঝতে পারছি। নানা

কারণে দেরি করে ফেললাম। ক্ষমা করবেন।

একটু হেসে মেহরা বললেন, আজ এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে শুনেছি। তবুও অনাহূত ভাবে চলে এলাম।

দ্রুত গলায় বললেন ঠাকুরসাহাব, আপনি এসে পড়ায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা আপনিও সকলের সংগে আহারে বসুন।

আপত্তি নেই। ভালমন্দ খাওয়ার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন তা ছেড়ে দেবার কোন মানে হয় না। আপনারা কি বলেন?

সকলে হাসলেন।

সমস্ত কিছু প্রস্তুতই ছিল। ঠাকুরসাহাব সকলকে নিয়ে আহারের জায়গায় গেলেন। এলাহি আয়োজন। এক একজনের পক্ষে এতগুলি পদ শেষ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। গল্প-গুজবের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ হাতের কাজ এগিয়ে চলল। অবশ্য রাজেশ সিনহা সিঁটিয়ে রইলেন।

আড়াইটে আন্দাজ সময় সকলে আবার ফিরে এলেন হলঘরে। এক একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে হেলে বসলেন। গুরুভোজনের পর শরীরকে একটু বিশ্রাম না দিলেই নয়। পান এসে পড়ল। মিষ্টি মশলা দেওয়া বিখ্যাত সুগন্ধী মুঙ্গেরীয়া পান। বাসব পান খায় না; আগেই পাইপ ধরিয়ে নিয়েছিল সে।

এবার সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আজকে মধ্যাহ্ন-আহারে ঠাকুরসাহাব অবশ্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তবে এটা আমার ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। কারণ আমি আপনাদের সকলকে কিছুক্ষণের জন্য একত্রিত করতে চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম, আপনারা অনুমান করতে পারেন কি? এখানে যে দুটো খুন হয়ে গেছে—স্থানীয় দারোগা তাকে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও, নিঃসন্দেহে রহস্যপূর্ণ ঘটনা। সেই রহস্যের যবনিকা এখন আমি তুলতে চাই। মিস্টার মেহরাকে তাই সঙ্গে করে এখানে আনা।

মেহরা দারোগার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনস্ট্রাকশন থাকা সত্ত্বেও আপনি এঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। এর মানে কি?

আমি স্যার···মানে···ঠিক তা নয় স্যার···

সিনহা খাবি খেতে লাগলেন।

বাসব আরম্ভ করল, আপনারা জানেন, দিবাকরবাবু ও ত্রিলোক খুন হয়েছে। কিন্তু আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে ঠাকুরসাহাবের ডায়নামো মিশ্রি বাঘের হাতে নয়, মানুষের হাতেই মারা পড়েছে। এখন প্রশ্ন জাগবে, এই সমস্ত লোম-হর্ষক হত্যাকাণ্ডের কারণ কি? কারণ সেই আদি ও অকৃত্রিম—অর্থের লালসা। তবু বলব হত্যাকারী এই ধারাবাহিক খুনের নায়ক হতে চায়নি। শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্যই রক্তে হাত রাঙাতে হয়েছিল তাকে। আমার বক্তব্য ক্রমেই আপনাদের কাছে হেঁয়ালির মত লাগছে বুঝতে পারছি। আমি এবার সব কথা পরিষ্কার করেই বলব। তবে ঘটনা কিভাবে দানা বেঁধেছিল বা এগিয়েছিল, তা

আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কাজেই অনুমানের ওপর কিছুটা নির্ভর করতে হবে। দেখে-শুনে মনে হয়, আমার অনুমান বাস্তব থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

গ্রামের পাশ দিয়েই পাহাড় এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আগে পাহাড়ের এই অঞ্চলের অংশ ঠাকুরসাহাবদেরই ছিল। এখন সরকারের। তবে পাহাড়ের অপর পারের জঙ্গল ওঁরই অধিকারে। ওই জঙ্গল নিয়ে কিন্তু ঠাকুরসাহাবের কোন মাথাব্যথা ছিল না। দুর্গম বলেই যে এই অনীহা, তা কিন্তু নয়। আসল কথা হল, সমতলে ওঁর এত আছে যে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পান না। এমন কি বছর কুড়ি ওই জঙ্গলের ধারে-কাছে যাননি। ওখানে কি জন্মাচ্ছে, কি বেড়ে উঠছে, তার কোন খবরই উনি রাখতেন না। একজন কিন্তু ওখানে গিয়ে বিরাট লাভের সম্ভাবনা দেখতে পেল। কৌতূহল নিয়ে অনেকেই ওধারে বেড়াতে যায়, কিন্তু সকলেই তো আর অভিজ্ঞ চোখের অধিকারী হয় না! এই ব্যক্তিটি কিন্তু এক নজরেই বুঝতে পেরেছিল কয়েক লক্ষ টাকার চন্দন গাছ অনাদৃতভাবে বেড়ে চলেছে ওখানে।

ঠাকুরসাহাব অবাক হয়ে গেলেন।

বলেন কি! আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানি না!

আমি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথা বলেছি। অজান্তেই আপনি বাড়তি মোটা টাকার মালিক হয়ে গেলেন।

তারপর কি হল?

হয়ত এমনও হতে পারে, ওই লোকটির সঙ্গে ত্রিলোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেই প্রথম আবিষ্কার করেছিল চন্দনের জঙ্গল। লোভে তার চোখ চকচক করে উঠল। মালিককে সংবাদ দিলে তার তো লাভের সম্ভাবনা নেই। কাজেই সে জানাল ওই লোকটিকে। পাহাড় না ডিঙিয়ে যাতে কাঠ এধারে আনা সম্ভব হয়, সেরকম একটা সহজ পথ আবিষ্কার করা হল অবিলম্বে। তারপরই আরম্ভ হয় গাছ কাটা। এই সঙ্গে লোকটি এই ব্যাপার গোপন রাখার জন্য দারুণ এক পরিকল্পনা খাড়া করল। ইতিমধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটল। চন্দন কাঠের বাজার হল কলকাতা বম্বের মত বড় বড় শহর। কাজেই কাঠ শুধু কাটলেই হবে না, চালানও দিতে হবে। চালানের ব্যাপারে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে, এমন একজনের সঙ্গে হাত মেলাতে হল লোকটিকে। যাই হোক, এই সময় ত্রাসের সৃষ্টি করে বাধা দেখা দিল রঙ্গমঞ্চে।

আপনি কি বলতে চাইছেন মিস্টার ব্যানার্জী?

প্রলয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তর ক্রমশ প্রকাশ্য। দিবাকরবাবু বেকার মানুষ। রাঁচি থেকে এলেন ভগ্নী-পতির বাড়ি। এখানে এসে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই বোধহয় একদিন চন্দন গাছগুলো আবিষ্কার করে ফেলেন। তারপর কিভাবে তিনি ত্রিলোক আর সেই লোকদুটির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়ে পড়লেন বলতে পারব না। তবে তাদের

যে একজন অংশীদার হয়ে উঠলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন ঘনঘন বাঘের আবির্ভাব ঘটছে। জঙ্গলের পথ আর কেউ মাড়াতে সাহস করে না। বেশ নির্বিবাদেই গাছ কাটা চলতে লাগল।

ওরা কিন্তু দিবাকরকে প্রসন্ন মনে নিতে পারেনি। ঠাকুরসাহাবকে উড়ো চিঠি দেওয়া হল। যাতে উনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে রাঁচি পাঠিয়ে দেন। এই কারসাজি কাদের, দিবাকর কিন্তু সহজেই ধরে ফেলল; এবং বোকার মত ভয় দেখাতে গেল—সমস্ত ব্যাপার ফাঁস করে দেবেন বলে। বলা বাহুল্য তখনই তিনি বেঁচে থাবার অধিকার হারালেন। দিবাকরের পরে ত্রিলোককেও পথ থেকে সরানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কারণ এত বড় একজন সাক্ষীকে দিনের পর দিন বয়ে বেড়ানোর ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। অতি লোভী ত্রিলোককেও ছুরি খেয়ে মরতে হল।

শ্রীকান্ত দত্ত বললেন, আপনি যে বললেন ডায়নামো মিস্ত্রি খুন হয়েছে। তাকে খুন করা হল কেন?

মনে হয় সে বেচারা কোনরকমে ওদের কীর্তিকলাপের কথা জানতে পেরেছিল। এই জানাটাই তার পক্ষে কাল হয়েছে।

কিন্তু—ঠাকুরসাহাব বললেন, বিনোদ যে বাঘের আক্রমণে মারা গেছে, তা তো সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ধোঁকার টাটি তো ওখানেই ঠাকুরসাহাব। হত্যাকারীর কৃতিত্বও বলতে পারেন। তবে সকলের চোখ বা কানকে যে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তা তার বোঝা উচিত ছিল। যা হোক, আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য এখুনি এই ঘরের পাশে বাঘকে আমদানী করছি।

তারপর বাসব একটু গলা চড়িয়ে বলল, ডাক্তার, ঠিক আছে তো?

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, আমি রেডি।

কাজ আরম্ভ কর।

শৈবাল যে এতক্ষণ হলে ছিল না, কেউ খেয়াল করেননি। মিনিটখানেক পরেই সকলে স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন, বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকে। হিংস্র জন্তুটা যেন ক্রুদ্ধ ডাক দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, সে অভুক্ত—তার রক্ত চাই।

কয়েকবার তর্জন-গর্জনের পর সে থামল।

সকলেই অসম্ভব বিচলিত। কারোর মুখেই কথা নেই।

কি শুনলেন? রক্তলোলুপ জন্তুটাকে পাশের ঘরে এনে বেঁধে রেখেছি—এটা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ষড়যন্ত্রকারীরা অনেক মাথা খাটিয়ে, আট-ঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিল। তবে অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়ের দরুণ অনেক পদক্ষেপ ভুল পথে চালিত হয়েছে। আমি অসংখ্য তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছি, তবে অপরাধীকে এত বেশি ভুল করতে আগে কখনো দেখিনি।

ডাক্তার, টেপরেকর্ডারটা নিয়ে এ-ঘরে চলে এস।

টেপরেকর্ডার হাতে নিয়ে শৈবাল হলে এল।

সর্দারজী, দেখুন তো যন্ত্রটা চিনতে পারেন কিনা?

তীক্ষ্ণ গলায় সুদর্শন অরোরা বললেন, আমাকে বলছেন?

আপনাকেই বলছি। মুঙ্গেরের 'বিহার রেডিও স্টোর' থেকে এই টেপরেকর্ডার আপনি কিনেছিলেন। ক্যাশমেমোর কপি আমরা দেখেছি। বাঘের ডাক টেপ করেছিলেন কোথায়? কাছাকাছি কি কোথাও সার্কাস হচ্ছে?

কি সমস্ত আজেবাজে বলছেন? আমি তো—

এখনও অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন? এই টেপরেকর্ডার দেখে একবারও মনে হচ্ছে না, আপনার আস্তানা আমরা রেড করেছি। শুধু এটা নয়, প্রচুর চন্দন কাঠের সন্ধানও আমরা সেখানে পেয়েছি। তাই আমার এখানে ফিরতে এত বেলা হয়ে গেল।

এবার সুদর্শন আরো চুপসে গেল।

তবে স্বীকার করতেই হবে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। পরিকল্পনা আপনার মাথা থেকে বেরোলেও রক্তাক্ত ব্যাপারের মধ্য যাননি। দেখে শুনে মনে হয়, পাপ-বোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন সেই অর্থলোলুপ মানুষটি আপনার ইসারায় একের পর এক হত্যাকাণ্ড করে গেছে।

বাসব পকেট থেকে অদ্ভুতদর্শন একটা জিনিস বার করল। লোহার তৈরি আড়াই তিন ইঞ্চি ব্যাসের হবে সেটা। একদিকে চারটে রিং লাগানো। অন্যদিকে একটু বেঁকানো সারি সারি গজাল বসানো রয়েছে।

এটা নিশ্চয় চিনতে পারছেন? এই মারাত্মক অস্ত্র আঙুলে পরে বিনোদের শরীর ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। যাতে পরে প্রমাণিত হয় বাঘের আঁচড়েই এমনটা হয়েছে। যে এ-কাজ করেছে তার শিরায় শিরায় আছে তীব্র পাশব মনোবৃত্তির বীজ। একটু ঘুরিয়ে বললে, এই ধরনের মানুষকে ব্লাডম্যানিয়াক আখ্যা দেওয়া যায়। অথচ আপনারা শুনলে অবাক হবেন, সেই মানুষ অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির। সামান্য অপরাধপ্রবণতা যে তার মধ্যে থাকতে পারে ভাবাই কষ্টকর। ওকি মাস্টারমশাই, উঠছেন কেন? বসুন—বসুন। এ অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গা। তাছাড়া মিস্টার মেহরা হাবেলির চারধার পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

মরিয়া ভঙ্গিতে শ্রীকান্ত বললেন, আমার শরীর খুব খারাপ বোধ হচ্ছে। আমায় এখান থেকে যেতে দিন।

যাবেন বৈকি। আপনার কোয়ার্টার সার্চ করে কি পাওয়া গেছে, তা তো দেখলেন। আপনার প্রিয় পোর্টার রামভরোসাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কেসের সেই হবে বড় সাক্ষী। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি এখান থেকে যাবেন। দারোগাবাবু, গা ঘামিয়ে তদন্ত তো করলেন না। এবার উঠুন। হত্যাকাণ্ড-

গুলির নির্মম নায়ক শ্রীকান্ত দত্তর হাতে বালা পরিয়ে দিন। হ্যাণ্ডকাফ সঙ্গে আছে তো?

নিজের মোটা শরীর নিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজেশ সিনহা। মেহরা পকেট থেকে হ্যাণ্ডকাপ বার করে এগিয়ে ধরলেন তার দিকে। বাসব এতক্ষণ পরে পাইপ ধরাবার অবকাশ পেল।

পরের দিন।

বাসব ও শৈবাল প্রলয়ের অনুরোধে তার বাংলোতে চলে এসেছে। আজই সন্ধ্যার ট্রেনে ওরা কিউল চলে যাবে। তারপর ওখান থেকে ট্রেন ধরবে কলকাতার। ঠাকুরসাহাব বাসবের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। চোখ ঝলসানো অঙ্কের চেক দিয়েছেন সম্মান দক্ষিণা হিসাবে। আরো কয়েকদিন থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন দুজনকে।

বাসব সবিনয়ে সে অনুরোধ এড়িয়ে গেছে। জানিয়েছে, কলকাতায় হয়ত কোন কেস তার জন্য অপেক্ষা করছে। এবং একবেলা প্রলয়ের ওখানে কাটিয়ে না যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনেই ওদের বিদায় দিয়েছেন ঠাকুরসাহাব। বলা বাহুল্য তানি উপস্থিত ছিল। রান্নার দায়িত্ব আজ তারই।

এবার শুভ কাজটা সেরে ফেলুন মশাই। এ সমস্ত ব্যাপার ফেলে রাখলেই নানা কথা হয়।

বাসবের কথা শুনে প্রলয় বলল, সামনের রবিবারেই তানিকে পাকাপাকি ভাবে ঘরে আনতে পারব। আপনারা সে সময় থাকলে কি ভাল যে হত।

বাড়িতে খবর দিয়েছেন?

না। ওঁরা মত দেবেন বলে মনে হয় না। বিয়ের পর—ব্যাপারটা পুরনো হয়ে গেলে মেনে নিতেও পারেন। ওকথা যাক। আপনি আমার একটা কৌতুহল নিরসন করুন। কিভাবে শ্রীকান্ত দত্তকে খুনী বলে চিনতে পারলেন সেকথা বলুন?

খাওয়া-দাওয়ার পর কথা হচ্ছিল।

বাসব একটু হেলে বসে বলল, প্রথমে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম। আলোর সন্ধান দিল তিনটে জিনিস। এক, দিবাকরের সুটকেশে পাওয়া চন্দন কাঠের ডাল। দুই, তারই আলমারিতে পাওয়া 'পারফিউমারি সিণ্ডিকেটে'র ঠিকানা। তিন, ত্রিলোকের বাক্সতে পাওয়া খোপ কাটা কাটা কাগজ, যাতে সে চিঠি লেখবার চেষ্টা করেছিল। এই ধরনের কাগজ কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিলাম না। সেদিন মুঙ্গের যাবার পথে স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকেই লক্ষ্য করলাম ওই ধরনের কাগজের খাতা খোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর রয়েছে। অর্থাৎ রেলের কাজেই ওই কাগজ ব্যবহার হয়। তবে কি মাস্টারমশাইয়ের কাছে ত্রিলোকের যাওয়া-আসা ছিল? প্রশ্ন করাতে কিন্তু বললেন, ত্রিলোককে তিনি

মোটেই চেনেন না। ওধারের শেডে অরোরাকে প্রশ্ন শেষ করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গোডাউনের মধ্যে উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম, তার মধ্যে প্রচুর কাঠ রয়েছে। আপনি বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবেন, বুক-করা কাঠ শেডের তলাতেই পড়ে থাকে। মালগাড়ি এলে তাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে এই সমস্ত কাঠ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে কেন? খুব দামী কি? না, সকলের চোখের আড়ালে রাখাই এর হল উদ্দেশ্য? নানা সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে মুঙ্গের পেঁছিলাম। ইতিমধ্যে দিবাকরের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু সংবাদ মল্লিক আমাকে পরিবেশন করেছিলেন।

এস. পি. মেহরা আমাদের পরিচিত ব্যক্তি, তাঁর সাহায্যে লালবাজারে ট্রাঙ্কবলে যোগাযোগ করলাম। পারফিউমারি সিণ্ডিকেটে গিয়ে অনুসন্ধান করতে বললাম, সেখানে দিবাকর সিং নামে কেউ চিঠি লিখেছে কিনা? লিখে থাকলে, চিঠির বিষয়বস্তু কি? তারপর আমরা গেলাম বিহার রেডিও স্টোরে। দোকানের মালিক পুলিশ দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। তারিখের উল্লেখ করতেই ক্যাশমেমো দেখে জানা গেল, দিবাকর এখান থেকে টেপরেকর্ডারের যন্ত্রাংশ কিনেছিল। এবং প্রসঙ্গক্রমে এও জানা গেল, কিছুদিন আগে স্টোন-চিপসের কারবারি সর্দারজী এখান থেকে একটা টেপরেকর্ডার কিনেছে। বাঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার সন্দেহ আগেই হয়েছিল। এখন নিশ্চিত হলাম, টেপ-করা বাঘের গর্জন মাইকের সাহায্যে হাওয়ায় ছাড়া হয়। তবে কি সুদর্শন অরোরাই হত্যাকারী?

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করল, সেদিন ক্যালকাটা পুলিশ অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়েছিল। চার ঘণ্টার মধ্যে উত্তর পেলাম। জানা গেল, পারফিউমারি সিণ্ডিকেট চন্দন তেলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী। দিবাকর সিং লিখেছিল, সে প্রচুর চন্দন কাঠ সাপ্লাই করতে পারে। কি রেট পাওয়া যাবে ইত্যাদি। ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, মুঙ্গেরের পোস্টবক্স নম্বর দিয়ে। রেল কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে মাস্টারমশাই সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বলে এলাম মেহরাকে। পরের দিন আমি আর ডাক্তার আবিষ্কার করলাম চন্দন গাছের জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অরোরা পাহাড় নিয়ে কারবার করে তার পক্ষে ঘুরতে ঘুরতে এধারে এসে পড়া অসম্ভব নয়। তখনই সে এই লুকনো সম্পদ লক্ষ্য করেছে। লোভকে জয় করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার পক্ষেও হয়নি। এখান থেকে কিউলের দিকে যাবার যে একটি মাত্র সড়ক পথ আছে, তা অত্যন্ত সরু। ট্রাক যাওয়া-আসা করার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। একথা আমি আগেই শুনেছিলাম। কাজেই মাল বাইরে পাঠাবার একমাত্র উপায় হল মালগাড়ি। সুতরাং মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে অরোরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠতে বাধ্য। তাহলে গোডাউনের মধ্যে যা রয়েছে, তা অন্য কোন কাঠ নয়, চন্দন।

আবার মুঙ্গেরে গেলাম। মেহরা জানালেন, রেলের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে, মাস্টারমশাই একজন কীর্তিমান ব্যক্তি। সরকারী টাকা বহুবার নয়-ছয় করেছেন। কিন্তু ভাগ্যবলে রেহাই পেয়েছেন প্রতিবার। ঘুষ নেবার ব্যাপারে যে পারদর্শিতা তিনি দেখিয়েছেন, তার জুড়ি মেলা ভার। এমন কি এক গ্যাংম্যানকে মাথায় হাতুড়ি বসিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। তার বউয়ের সঙ্গে নাকি তাঁর সন্দেহজনক সম্পর্ক ছিল। এখানেও প্রমাণের অভাব। পুলিশ তাঁর টিকি ছুঁতে পারল না। কর্তৃপক্ষ তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাকে এই ছোট স্টেশনে নির্বাসন দিয়েছেন। এবার আমি ফাইনাল প্রোগ্রাম ছকে ফেললাম। দুজনের আস্তানা এবার সার্চ না করলেই নয়। মিস্টার মেহরার সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থা হল। আমার কথামত ঠাকুরসাহাব আপনাদের আমন্ত্রণ জানালেন। স্টেশনের ওধারে যে আমবাগান আছে, তার ভেতরে কিছু সাদা পোশাকে পুলিশ, মিস্টার মেহরা ও আমি লুকিয়ে রইলাম। মাস্টারমশাই মীর্জা হাবেলির উদ্দেশে রওনা হবার পর আমরা তাঁর কোয়ার্টার রেড করলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধানের পর বেরিয়ে পড়ল একটা রক্তমাখা কোট। রামভরোসাকে গ্রেপ্তার করা হল। তার ওপর পুলিশী চাপ পড়তেই সে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে অনেক কথা স্বীকার করে ফেলল। অর্থাৎ মাস্টারমশাই যে খুনের সঙ্গে জড়িত, সেকথাও ও জানে। তার জন্য নিয়মিত টাকা পায়। আসল কথা কি জানেন, অপরাধ করতে করতে মানুষের ভয় কেটে যায়। অসম্ভব বেপরোয়া হয়ে পড়ে। তাই যতটা সতর্ক মাস্টারমশাইয়ের হওয়া উচিত ছিল, ততটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেননি। এরপর আমরা সুদর্শন অরোরার আস্তানায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম। আমার কি মনে হয় জানেন, বিরক্তিকর চরিত্রদের যখন সরানো হবে স্থির করা হল, তখন অতি বুদ্ধিমান অরোরা বিশেষ কোন উপায়ে এই কাজের জন্য মাস্টারমশাইকে উত্তেজিত করেছিল। টাকার নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন তিনি—তাছাড়া খুন করার ভয় তাঁর আগেই ভেঙে গিয়েছিল, তাই সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। আরেকটা জিনিস তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিল। ত্রিলোক যেখানে খুন হয়, সেখানে একটা ডট পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাতে মুঙ্গেরের একটা ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকানের চাপ ছিল। ওই দোকানে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, সেমাপুরের কাউকে ডট পেন্সিল প্রেজেন্ট করেছে কিনা। উত্তর পেলাম, স্টেশন-মাস্টারকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। আর কিছু বলার নেই আমার। বাকি কথা তো আপনি আগেই শুনেছেন।

নিজের দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে বাসব হাই তুলল।

অভিভূত গলায় প্রলয় বলল, আপনার প্রশংসা এক মুখে করা যায় না। এত জটিল ব্যাপার এমন দক্ষতার সঙ্গে সামলানো একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব।

হেসে শৈবাল বলল, লোকটার মাথা আর চিবিয়ে খেও না।

তোমার হিংসে হচ্ছে ডাক্তার? কিন্তু আর নয়, বেলা পড়ে এল। এবার আমাদের উঠতে হবে।

এখুনি—?

ট্রেনের সময় হয়ে এল। আপনার ভাবি স্ত্রীকে একবার ডেকে আনুন, যাবার আগে দু-চারটে কথা বলে যাই।

প্রলয় তানিকে ডেকে আনতে পাশের ঘরের দিকে এগলো।

ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ

ওভালটিন কালারের টেরিলিনের টুকরোটা।

আধ ইঞ্চিটাক লম্বা, সেই অনুপাতেই চওড়া টুকরোটা বাসব একাগ্র মনে নিরীক্ষণ করছিল। এই দামী কাপড়ের অংশটা কোন সার্ট বা বুশ কোটের যে ছেঁড়া অংশ, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বাসব টেরিলিনের টুকরোটা পকেটে রেখে দিয়ে মুখ তুলল। হাত চারেকের মধ্যেই পড়ে রয়েছে মৃতদেহটা।

চাপ চাপ রক্তের মাঝে আড়াআড়ি পড়ে থাকা দেহটা বীভৎস দেখাচ্ছে। পাঁজরার একটু নিচে এখনও গেঁথে রয়েছে ছোরাখানা। তার সুন্দর কারুকার্য করা বাঁটটা জেগে রয়েছে ওপরে। ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতই নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

শুধু থেকে থেকে একটা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ নিস্তব্ধতায় আঘাত হানছে। কাঁদছেন রাত্রি। রাত্রি গুপ্তা।

বাসব পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিল। সিগারেট ধরাল তারপর।

স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর বিরাজ সোম নিজের কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছেন। মৃতদেহ এবং ঘটনাস্থলের ছবি নেওয়া হয়েছে কয়েকটা। ফিঙ্গার-প্রিন্টের ব্যর্থ অনুসন্ধান করে এখন তিনি বারান্দায় গেছেন বাড়ির সকলকে বাজিয়ে দেখবার জন্য।

বাসব ঘরের বাইরে এল।

বিরাজ সোম তখন বাড়ির পুরনো চাকর বলাইকে প্রশ্ন করছেন। শৈবাল একধারে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কি বললে? দুর্ঘটনার আগের দিন? তখন রাত্রি ক'টা হবে?

আজ্ঞে বাবু, তা কি করে বলব! আচমকা ঘুম ভেঙে গেল একটা আওয়াজে বিছানায় উঠে বসে দেখলুম বারান্দায় আলো জ্বলছে—

তারপর তুমি বিছানায় বসে বসেই বোধহয় সেই আলোর শোভা দেখতে থাকলে?—ঝাঁজাল কণ্ঠে বিরাজ সোমের প্রশ্ন।

আজ্ঞে না বাবু! আমি ঘরের বাইরে এলুম তাড়াতাড়ি, আলোটাও নিভে গেল।

দুর্ঘটনার রাত্রে তুমি—

আজ্ঞে আমি বাড়ি ছিলুম না। ছুটি নিয়েছিলুম।

শৈবাল বাসবের কাছে এগিয়ে এল। ও তখন বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে কি চিন্তা করছিল।

কি রকম বুঝলে?

বাসব ওর দিকে তাকিয়ে বলল, বিরাজবাবুর ব্যূহ ভেদ করে বোঝার আর সুযোগ পেলাম কই?

শৈবাল হাসল।

তবে ডাক্তার—বাসব আবার বলল, একেবারেই যে কিছু চোখে পড়েনি, তা নয়। যেমন এই কাপড়ের টুকরোটা—

বাসব পকেট থেকে কাপড়ের টুকরোখানা বার করল।

শৈবাল এক নজর দেখে নিয়েই বলল, এ তো টেরিলিনের টুকরো দেখছি!

এক্‌জ্যাক্টলি। আজকাল সৌখিন সমাজে এই দামী কাপড়ের বিশেষ আদর দেখা যাচ্ছে। আমি টুকরোটা পেয়েছি ওই ঘরের হ্যাণ্ডেলে!

তুমি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, ওই ঘরের দরজাগুলোর হ্যাণ্ডেল কি রকম অদ্ভুতদর্শন। কিছু আটকালে না ছিঁড়ে উপায় থাকে না। আমার মনে হয়, কাল রাত্রে হত্যার পর কেউ···অবশ্য হত্যাকারীও হতে পারে, দ্রুতপদে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় জামার কিছু অংশ হ্যাণ্ডেলে আটকে ছিঁড়ে রয়ে যায়।

শৈবাল বলল, বুঝলাম সবই। কিন্তু তোমার এই অনুমানে কি লাভ হল, সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না আদপেই।

লাভ-লোকসানের হিসেবটা অবশ্য এখন আমি তোমায় দেব না। দু-একদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ও কথা থাক, চল, মিসেস গুপ্তাকে এখন সান্ত্বনা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

রাত্রি গুপ্তার সঙ্গে বাসবের আলাপ বেশ কয়েকদিনের। আলাপের সূত্রপাতটাও সম্পূর্ণ নাটকীয়। বাসব অবশ্য সেদিন অনুমান করতে পারেনি, এই নাটকীয় আলাপের পরিণতি গড়াবে আজকের এই রক্তাক্ত পরিবেশে।

যদিও খুবই ঘোরাল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েই রাত্রি গুপ্তা দিনকয়েক আগে বাসবের কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আলাপের সূত্রপাত ওখানেই। বাসবের পরিষ্কার মনে আছে—সেদিনও—

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ক্রমেই জমাট বাঁধছে। হাওয়ার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে ওই সঙ্গে।

বৃষ্টি নামবে।

ক্যামেল উলের র‍্যাগটা আরো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শৈবাল বলল, এ রকম শীত অনেকদিন কলকাতায় পড়েনি, কি বল?

বাসব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে উত্তর দিল, হুঁ। বছরের পর বছর ধরে কলকাতায় শীত যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির বসবার ঘরে দুটো সোফায় বসে ওদের কথা হচ্ছে। শৈবাল কয়েকদিন ধরে এ বাড়িতেই আছে। সোমা বাপের বাড়ি যাওয়ায়, হাওয়া বদলের মত শৈবালের এই বাড়ি বদল। বাসবের অনুরোধে ও এখন এ বাড়িতেই থাকবে বেশ কয়েকদিন।

কিন্তু যাই বল ডাক্তার—বাসব আবার বলে, শীতকালটা কিন্তু বেশ! সব

রকম মানুষের পক্ষেই বেশ উপাদেয় ঋতু।

বেশ হলেও, ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে গরমকালের চেয়ে মানুষ শীতকালেই বেশি রোগে পড়ে।

তা হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে সময়টা অত্যন্ত ভাল। আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ছাড়াও এই সময়ে মানুষের মনে কর্মপ্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে। এমন কি অপরাধীরাও গরমকালের চেয়ে শীতকালেই বেশি অপরাধ করে।

অর্থাৎ?

শেষবারের মত টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলতে ফেলতে বাসব বলল, সেদিন ফ্রি প্রেস ক্রিমিনাল পড়ছিলাম—তাঁরা সমগ্র বিশ্বের অপরাধের একটা হিসেব খাড়া করেছেন। তুলনামূলক ভাবে তাতে দেখানো হয়েছে, ১৮৬২ সাল থেকে ১৯৫৯ অবধি পৃথিবীতে যত খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি হয়েছে, তা প্রায় সমস্তই শীতকালে। অপরাধীদের শীতকালের ওপর দুর্বলতার জন্যেই যে এরকমটা হয়েছে, তা নয়। এর কারণ হল—

শৈবাল বাধা দিল, থাক, বিস্তৃতভাবে আর তোমাকে সমস্ত প্রবন্ধটা বলতে হবে না। আমি প্র্যাকটিকাল লোক—কার্যক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ কিছু প্রমাণ পাচ্ছি না।

বাসব হেসে ফেলল।

বেশ কিছুদিন সম্পূর্ণ বেকার বসে রয়েছে বাসব। হাতে কোন কেস নেই। শৈবালের ইসারা সেই ধার ঘেঁষেই গেছে।

তুমি ঠিকই বলেছ ডাক্তার। তবে একদিকে এটা সুলক্ষণ। দেশে অপরাধের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই লোকে আমাকে আর ডাকছে না।

শৈবাল হেসে বলল, তোমার ব্যবসার তাহলে কি হবে?

ফেল পড়বে। তারপর আমি একটা বিড়ির দোকান করব। এ আমার অনেক দিনের পরিকল্পনা। দেখেছি, সাধারণ লোকের বিড়ির প্রতি বেশ টান আছে। ও ব্যবসা ফেল পড়বার নয়।

উচ্চহাস্যে নিজের কথা শেষ করল বাসব। কিন্তু হাসির রেশ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর্তরব তুলে কলিংবেল বেজে উঠল।

থেমে থেমে কয়েকবারই চলল যন্ত্রের ঝঙ্কার। বাহাদুর দ্রুত ভেতর দিক থেকে ছুটে এল দরজা খুলে দিতে।

শৈবাল বলল, এই শীতের সকালে আবার কে এল?

বাসব সোজা হয়ে বসে বলল, বোধহয় বিড়ির দোকানটা উপস্থিত আমায় আর করতে হচ্ছে না।

পরমুহূর্তে বাহাদুরের পেছনে পেছনে একটি সুন্দরী মহিলাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। বয়স চব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে। পরণে কাশ্মিরী প্রিন্টের শাড়ির ওপর পিকক্ ব্লু কালারের দামী ব্লেজারের ওভারকোট।

মাথার রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো। সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন। মুখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বসুন।

ভদ্রমহিলা একটা সোফায় বসে পড়ে দ্রুত কণ্ঠে বললেন, বিপদে পড়েই আমাকে এখানে আসতে হল। আমি বাসববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমিই—বলুন ?

কথাটা খুবই গোপনীয়…মানে…

ভদ্রমহিলা শৈবালের দিকে তাকালেন।

বাসব বলল, আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু শৈবাল রায়। আপনি এঁর সামনে সমস্ত কিছু স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। তবে প্রথমে আপনার নামটা জানতে পারলেই আমাদের সুবিধা হয়।

রাত্রি গুপ্তা।

এরপর মিসেস গুপ্তা সবিস্তারে নিজের বক্তব্য বলে গেলেন। বেশ নাটকীয়-ভাবেই সমস্ত বর্ণনা করলেন তিনি। একটা গল্পের মতই তাঁর বর্ণনার কাঠামোটা। বাসবকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে তিনি অনেক আগাম থেকেই নিজের কাহিনীর জের টানলেন—

কলেজ থেকে সবে ফিরেছে রাত্রি। বেলা তখন চারটে। অবশ্য বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা তার কানে এসেছে। অনুপই ওকে সংবাদটা জানিয়েছে প্রথমে।

দিদি, তোর বিয়ে—

বিয়ে, ! খুব ফাজিল হয়েছিস, না ?—ছোট ভাইকে ধমকে ওঠে রাত্রি।

ও, বিশ্বাস হল না বুঝি ? সত্যি বলছি, এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগে দামী মোটরে চড়ে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনিই তো বাবার সঙ্গে কথা বলে তোমার বিয়েটা তাঁর ভাইপোর সঙ্গে ঠিক করে গেলেন।

রাত্রির ভ্রু-কুঁচকে উঠল। ও আর একটা কথাও না বলে রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে কাপড় বদলাতে বদলাতে ও অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কই, কেউ তো তাকে দেখতে আসেনি ! তাকে না দেখেই পাত্রপক্ষ পাত্রী নির্বাচন করে ফেললেন ! এ-রকম ভাবে বিয়ের ব্যবস্থা আজকাল বাংলাদেশে আছে নাকি ? তবে—

ওর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল—মা এলেন ঘরে।

কোন ভূমিকা না করেই তিনি রাত্রির বিয়ের সংবাদ দিলেন। ছেলেটি খুবই ভাল। বিত্তশালী এবং বিদ্বান। তোকে এক গানের জলসায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ছেলের কাকা। তিনিই খোঁজ-খবর করে আগে একদিন এসেছিলেন নিজের ভাইপোর সম্বন্ধ নিয়ে। আজ কথাটা পাকাপাকি

করে গেলেন।

কিন্তু বলি-বলি করেও নিজের আপত্তিটা মায়ের সামনে তুলে ধরতে পারল না রাত্রি। ওর ভীরু মন সঙ্কোচের বেড়ায় তাকে আটকে রাখল।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গেল রাত্রি। কি হবে? ও আর শোভন যে ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছে, তা কি এইভাবেই মুছে যাবে?

সমস্ত কিছু শোনার পর শোভন কিছুক্ষণ নীরব রইল; তারপর বলল, তোমার বাবা যা করছেন, তোমার ভালর জন্যেই করছেন রাত্রি।

কিন্তু···না, না, এরকম ভাল আমি চাই না।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। হাজার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটল না রাত্রির। এক বর্ষণ-শ্রান্ত সন্ধ্যায় ওর বিয়ে হয়ে গেল রবীন গুপ্তর সঙ্গে।

তারপর—

তারপর গড়িয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। কাজ-পাগল স্বামী নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। কার্যসূত্রে কলকাতার বাইরে দূর-দূর শহরে তাঁর যাতায়াত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রাত্রি। সকলের চোখ বাঁচিয়ে শোভন এসেছে তার কাছে—প্রায়ই এসেছে।

এইভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ—

মাসখানেক আগে একদিন হঠাৎ রাত্রির চোখে পড়ল বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে।

রাত্রি প্রথমে গা করেনি। ভেবেছে এমনি হয়ত।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওর ভুল ভেঙে গেল। ও লক্ষ্য করল, ওই লোকটি যে শুধু বাড়ির সামনেই দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে, তা নয়; ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে সর্বদা।

রাত্রির ভয় হল। কে এই লোকটা? কেনই বা লোকটা তার পেছনে এইভাবে লেগে রয়েছে?

শোভনের সঙ্গে পরামর্শ করল ও। শোভনও কোন হদিস খুঁজে পেল না এই প্রহেলিকার।

এদিকে পর পর দুটো বেনামা চিঠি এসেছে তাকে রাত্রির নামে। শোভনের সঙ্গে অসঙ্গত ভাবে মেলামেশা করার উল্লেখ রয়েছে তাতে। ভয় দেখানো হয়েছে, এখনো নিজেকে সংযত না করলে স্বামীর গোচর করা হবে সমস্ত কথা।

ভেঙে পড়েছে রাত্রি। একটা দুরন্ত ভয়, একটা আতঙ্ক যেন ওর মনের মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। কে ওই লোকটা—আর চিঠিই বা দিচ্ছে কে?

চিন্তা-কাতর মন নিয়ে কয়েক রাত্রি স্রেফ পায়চারি করে কাটিয়েছে রাত্রি। না, না, স্বামীর কাছে এ পরিস্থিতি সরল হোক, এটা সে চায় না। কোন স্ত্রীরই

তা কাম্য নয়।

তাই আজ ও সোজা চলে এসেছে বাসবের কাছে। বাসবের নাম ও শুনেছিল। টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানাটা সংগ্রহ করা ওর পক্ষে খুব কঠিন হয়নি।

নিজের কাহিনী শেষ করলেন রাত্রি গুপ্তা।

বাসব সহজভাবে প্রশ্ন করল, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?

আপনি আমায় ওই লোকটির হাত থেকে বাঁচান বাসববাবু। আমি আর এইভাবে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে পারছি না।

বাসব একটু থেমে বলল, বেশ, আমি আপনার কেসটা টেকআপ করলাম। কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমার চাই, অর্থাৎ আপনাকে আমি যখন যা প্রশ্ন করব, তার উত্তরগুলো আপনি আমায় সঠিকভাবে দেবেন।

আমি সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব।

এই সময় বাহাদুর তিন কাপ কফি দিয়ে গেল।

বাসব একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, আপনি যখন আজ সকালে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার কাছে আসেন, তখনো কি লোকটি আপনাকে অনুসরণ করছিল?

হ্যাঁ। আমার মনে হয়, এখনো সে এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার, তুমি একবার বাইরের দিক থেকে ঘুরে এস তো! সাক্ষাৎ পাও কিনা দেখে এস।

শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসব আবার প্রশ্ন করল, আপনার স্বামী এখন কোথায়?

মাস দুয়েক হল ওয়ালটেয়ারে আছেন। আগামী সোমবারে কলকাতায় ফেরার কথা আছে।

কিসের ব্যবসা করেন তিনি?

একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানি আছে তাঁর।

ওয়েল মিসেস গুপ্তা—প্লিজ, ডোণ্ট মাইণ্ড! শোভনবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা এখন কি ধরনের?

একটু চুপ করে থেকে রাত্রি গুপ্তা উত্তর দিলেন, বন্ধুর মত উনি আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

শৈবাল ফিরে এল এই সময়। বাসব বলল, কি হল ডাক্তার?

লোকটি বাড়ির সামনেকার ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে!

রাত্রি গুপ্তা আর্তকণ্ঠে বললেন, দেখলেন তো! আবার এ-বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ও আমায় অনুসরণ করবে।

আপনি কুমারী জীবনে এ লোকটিকে কখনো দেখেছেন?

না।

আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। দেখি, কতদূর কি করা যায়। ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

মিসেস গুপ্তা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে স্বামীর নামাঙ্কিত একটা কার্ড বার করে বাসবের হাতে দিলেন। আইভরি কার্ড। বাসব দুটো আঙুল দিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আরেকটা কথা, যে উড়ো চিঠিগুলো আপনি পাচ্ছেন, তার এক-আধখানা আমার দরকার হবে।

আমার কাছে তো উপস্থিত নেই, পরে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। তাহলে আজ আমি উঠি।

আপনি বিশেষ চিন্তিত হবেন না। যতদূর অনুমান করছি, উপস্থিত আপনার ভয়ের কিছু নেই।

এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন মিসেস গুপ্তা।

বেলা তখন তিনটে। বাসব একাই বেড়িয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। মোড়ের মাথায় এসেই একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল ও, তারপর রাত্রি গুপ্তার দেওয়া কার্ডের ঠিকানায় পেঁছিতে ওর বিশেষ অসুবিধা হল না। অবশ্য বাসব ঠিক বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল না। বেশ কিছু এ-ধারেই নেমে পড়ল।

চমৎকার তেতলা বাড়িখানা রবীন গুপ্তের। আধুনিক স্থাপত্যের চরম নিদর্শন স্বরূপ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাসব কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল। বাড়িটির ঠিক সামনে রাস্তায় এপ্রান্তে একজন দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় কুয়াশা রচনা করছে। ইনিই তাহলে তিনি।

রাস্তায় বিশেষ লোক চলাচল ছিল না। বাসব নিজেকে যতদূর সম্ভব গোপন করে লোকটির দিকে তাকাল। বেশ লম্বা, চওড়াও সেই অনুসারে। গায়ের রঙ কালো। বিশেষত্বহীন মুখশ্রী। পরণে ডেক্রনের ট্রাউজার আর সাদা সার্ট।

সময় কেটে চলল।

লোকটির সিগারেট শেষ হয়ে গেছে তখন। সে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে রবীন গুপ্তর বাড়িটির দিকে তাকিয়ে। বাসবও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইভাবে। আরো আধ ঘণ্টা কাটল।

লোকটি পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল একবার, তারপর বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। বাসব দূরত্ব ও গোপনতা বজায় রেখে অনুসরণ করল ওকে।

বড় রাস্তায় এসেই লোকটি টালিগঞ্জগামী একটা ট্রামে চেপে বসল। বাসবও উঠল তাতে। হাজরার মোড়ে গিয়ে লোকটি নামল ট্রাম থেকে। বাসবও

নামল।

চেৎলাগামী তেত্রিশ নম্বর বাসটি এই সময়ে এসে দাঁড়াল। লোকটি চড়ে পড়ল তাতে। বাসবও অনুসরণ করল তাকে। চেৎলা বাজারে বাস থেকে নামল লোকটি। তারপর দুর্গাপুর ব্রীজের দিকে এগিয়ে চলল। বাসব অন্যান্য লোকের সঙ্গে গা মিশিয়ে লোকটির পেছনে পেছনে চলল।

ব্রীজ পার হয়েই দ্রুত এগিয়ে চলল লোকটি। বাসবও নিজের গতি দ্রুত করল। কিন্তু ওকি···কোথায় গেল সে? সামনে আর দেখা যাচ্ছে না লোকটিকে। নিশ্চয়ই কোন গলির মধ্যে ঢুকে গেছে।

বাসব আন্দাজ মত একটা গলির মধ্যে গিয়ে ঢুবল। এতখানি পরিশ্রম তার ব্যর্থ হল নাকি! লোকটির চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

বাসবের কপালের ভাঁজে ভাঁজে চিন্তার রেখা দেখা গেল। মন্থর পদে ও গলি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়াল। এই সময়ে কে যেন বলে উঠল, সিগারেট প্লিজ—

বাসব মুখ ফিরিয়ে দেখল, তারই হাত পাঁচেক পেছনে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার আধ-খোলা সিগারেট কেস। ও নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল—

আপনি আমায় অনুসরণ করছেন—লোকটি আবার বলল, তা আমি প্রথম থেকেই জানি।

বাসব নিজেকে ফিরে পেয়েছে এতক্ষণে। ও সহজ কণ্ঠে বলল, বুঝতে যখন পেরেছেন, তখন অবশ্য আর লুকিয়ে-ছাপিয়ে লাভ নেই। মিসেস গুপ্তার পক্ষ থেকেই আমি জানতে চাইছি, কেন আপনি তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করে বেড়াচ্ছেন?

এর অবশ্য একটা সঙ্গত কারণ আছে। তবে আপনাকে তা বলতে আমি বাধ্য নই।

আইনের চোখে আপনি অপরাধ করছেন, এ-কথা ভুলে যাবেন না।

অপরাধ! হাসল লোকটি, বেশ তো। আইনের সাহায্যে আমাকে যদি নিবৃত্ত করতে পারেন তো করুন!

বাসব লোকটির কথাবার্তায় অবাক না হয়ে পারে না।

কি করণীয় তার এখন? লোকটির অজান্তে তার আস্তানা দেখে যাওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য, কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েই সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল।

বাসবকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি আবার বলল, আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করুন, আমি চললাম। আমার সময়ের দাম আছে।

লোকটি আর দাঁড়াল না। দ্রুত অদৃশ্য হল একটি বন্ধ দোকান ঘরের পাশ দিয়ে। বাসব অবশ্য তাকে আর অনুসরণ করবার চেষ্টা করল না। মন্থর পদে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে ফিরে চলল।

পরের দিন ভোরে। শৈবাল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, কালকের অভিযানের কি হল? রাত্রে তো কিছু উচ্চবাচ্য করলে না—

কি আর বলব বল! বাসব বাবাজীর চরম পরাজয় ঘটেছে।

এরপর কালকের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বাসব।

সমস্ত শুনে শৈবাল বলল, আচ্ছা ঘোড়েল লোক যা হোক।

আমি কেবল ভাবছি, কি স্বার্থ তার একটি মহিলার পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ানোয়?

এই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দ তুলে। বাসব রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—

অপরপ্রান্ত থেকে রাত্রি গুপ্তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে…হ্যালো… মিস্টার ব্যানার্জী? আমি মিসেস গুপ্তা…তাড়াতাড়ি চলে আসুন এ-বাড়িতে একবার…একটা খুন হয়েছে…

খুন!

হ্যাঁ। যে লোকটা ফলো করেছিল, সে-ই খুন হয়েছে আমাদের লাইব্রেরি ঘরে।

আমি এখুনি আসছি। আপনি পুলিশকে এখনো একথা জানাননি বোধহয়…স্থানীয় থানায় রিং করুন…কুইক…

বাসব রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই বিস্মিত শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘটনার বিচিত্র গতি ডাক্তার। সন্দেহজনক সেই লোকটাই খুন হয়েছে শুনছি।

ওরা মিনিট পনেরর মধ্যেই রবীন গুপ্তর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। পুলিশ অবশ্য ওদের আগেই সেখানে হাজির হয়েছিল।

লাইব্রেরি ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে মৃতদেহটা। মৃতের পরণে এখনো সেই ডেক্রন ট্রাউজার আর সাদা সার্ট।

বাসব ইন্সপেক্টার বিরাজ সোমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়ল।

কি হে, দাঁড়িয়ে পড়ে কি এত চিন্তা করতে লাগলে?

শৈবালের কণ্ঠস্বরে চটকা ভাঙল বাসবের। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল ও। মৃদু হেসে বলল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চল—

কয়েক পা এগিয়েই বিরাজ সোমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। তিনি দ্রুতকণ্ঠে বাসবকে বললেন, শুনলাম, মিসেস গুপ্তা নাকি আপনার ক্লায়েণ্ট! বেশ, আপনার যা দেখে-টেখে নেবার নিন, আমি না হয় তারপরে ঘরে চাবি দেব।

বিরাজ সোমের শ্লেষটা প্রায় হজম করেই বাসব উত্তর দিল, আপনি যখন রয়েছেন, তখন অবশ্য আমার দেখা-না-দেখা একই কথা। তবু—চল ডাক্তার।

বেশ বড় লাইব্রেরি ঘরখানা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা। দেওয়ালের সঙ্গে আলমারিগুলো ফিক্সড করা। তাকে তাকে বইয়ের সারি। ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলকে কেন্দ্র করে সারি সারি চেয়ার।

বাসব আরেকবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। মৃত্যুর মতই নিথর, নিস্তব্ধ ঘরখানা। মৃতদেহটা তখনো পড়ে রয়েছে মেঝেয়।

বাসব ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অ্যালকোহলের গন্ধ বেরোচ্ছে, আমার মনে হয়—

কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ওর দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর। বাসব এগিয়ে গেল সেদিকে। টেবিলের ওপর কয়েকখানা বই ছড়ানো রয়েছে আর তার মাঝে একটা কার্ডের মত কি পড়ে রয়েছে। বাসব হাতে তুলে নিল সেখানা। চৌকো একটা কার্ড। তার ওপর মোটা কালো হরফে লেখা রয়েছে 'আট' অক্ষরটি।

বাসব সেখানা নিজের পকেটে রেখে দিয়ে, শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল লাইব্রেরি থেকে।

রাত্রি গুপ্তা তখন নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। রবীন গুপ্তের কাকা অসীম গুপ্ত তখন বারান্দার একধারে মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়েছিলেন। বাসব এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। উনি মুখ তুলে তাকালেন।

মৃদু কণ্ঠে বাসব বলল, আপনাকে আমি গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই অসীমবাবু—

ফিকে হেসে তিনি বললেন, বলুন।

আপনি মৃত লোকটিকে চেনেন?

না।

আগে দেখেছেন কখনো?

বারকতক দেখেছি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আপনার মনে সন্দেহ জাগেনি, কেন লোকটা আপনাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে?

না। কারণ ব্যাপারটা এত তলিয়ে আমি দেখিনি।

আপনি কখন জানতে পারলেন এই দুর্ঘটনার কথা?

সকাল প্রায় সাড়ে ছ'টা আন্দাজ সময়ে। বাড়ির পুরনো চাকর বলাই গিয়ে আমায় খবরটা দিলে।

কাল রাত্রে কোনরকম শব্দ-টব্দ পেয়েছিলেন?

না। তাছাড়া শব্দ পাওয়ার কথাও নয়, কারণ আমি থাকি বাড়ির পেছনের ব্লকে। মানে বাড়িটা পার্টিশন করা আর কি। সামনের ব্লকটা ভাইপোর, আর পেছনেরটা আমার।

ও। আপনার ভাইপোকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে? উনি এখন ওয়াল্টেয়ারে

আছেন, না ?

এই খানিক আগে করা হয়েছে। কিন্তু কি বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো ? আমাদের বাড়িতেই এই কাণ্ড।

বাসব ধীরকণ্ঠে বলল, আমিও কম অবাক হচ্ছি না। আচ্ছা মিস্টার গুপ্ত, বাইরে থেকে এই ব্লকে ঢোকবার ক'টা রাস্তা আছে ?

তিনটে…মানে যা দিয়ে ডায়রেক্ট লাইব্রেরি ঘরে আসা যায়।

কোথায়, কোথায়, বলুন কাইণ্ডলি !

একটা পার্লারের সামনেকার দরজা, একটা উঠোনের দিকের দরজা, আর একটা এই বারান্দারই শেষদিকের দরজা। অবশ্য ও-দরজাটা সব সময় বাইরের দিক থেকে তালা দেওয়াই থাকে।

বাইরের দিক থেকে—অর্থাৎ রাস্তার দিক থেকে…কেন ?

কারণ দরজাটার ঠিক এধারেই মিটারবোর্ডটা আছে। তাই মিটার রিডারের সুবিধের জন্যে ওই ধার দিয়ে লাগানো। যে মিটার রিড করার সময় তালা খুলে ভেতরে আসে, সে-ই আবার কাজ শেষ করে তালা বন্ধ করে চলে যায়।

অদ্ভুত ব্যবস্থা তো ! আপনি কি করেন অসীমবাবু ?

শৈবাল এতক্ষণ খুঁটিয়ে দেখছিল অসীম গুপ্তকে। গৌরবর্ণ, মোটাসোটা চেহারা, শান্তসৌম্য মুখের ভাব। কাঁচাপাকা একমাথা চুল।

অসীম গুপ্ত বললেন, হুণ্ডির কারবার করি। অকৃতদার, একলা মানুষ —চলে যায় ভালভাবেই।

ধন্যবাদ মিস্টার গুপ্ত, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। এখন একবার আমি মিসেস গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বেশ তো। বারান্দার শেষের ওই ঘরখানায় বৌমা আছেন, আপনারা যান।

বাসব আর শৈবাল নির্দিষ্ট ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি গুপ্তা বিছানার ওপর নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছেন। বাসব দরজার কাছ থেকে বলল, ভেতরে আসতে পারি ?

ভেজা চোখে মুখ ফেরালেন মিসেস গুপ্তা। বললেন, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করল ওরা।

কোন ভূমিকা না করেই বাসব আরম্ভ করল : এরকম ভাবে যে হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে যাবে, আমি তা কল্পনাও করিনি। তবে আপনি একটু বেশি মাত্রায় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

আমার ভীষণ ভয় করছে মিস্টার ব্যানার্জী। চিনি না, জানি না, এরকম একটা লোক আমাদের বাড়িতেই খুন হল !

আপনি ভয় পাবেন না। যদিও আমি কেসটা অন্যভাবে টেকআপ করেছিলাম, তবু এ ব্যাপারে যথাসাধ্য করব।

মিনতি ভরা কণ্ঠে রাত্রি গুপ্তা বললেন, আমি পুলিশকে আপনার কথা

বলেছি···প্লিজ, এর একটা নিষ্পত্তি আপনাকে করতেই হবে।

আমি তো আগেই বললাম সেকথা। যাক, এখন কাজ আরম্ভ করা যাক। ওই লোকটির সঙ্গে আপনার কোনদিন কথাবার্তা হয়েছে?

একদিনের জন্যেও না।

কাল ক'টায় আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন?

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার পর।

তখনো কি লোকটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল?

না, সন্ধ্যের পর থেকে বড় একটা ওকে দেখা যেত না।

বাড়ি ফেরার পর আপনি কি কি করলেন মিসেস গুপ্তা?

প্রথমে কাপড় বদলে কিছুক্ষণ রেডিও শুনি। তারপর রাত্রের খাওয়াটা সেরে শুতে যাই দশটার পরে।

শুতে যাওয়ার আগে দরজাগুলো কি আপনিই বন্ধ করেছিলেন?

হ্যাঁ। তাছাড়া উপায়ও ছিল না, কারণ বলাই কাল ছুটি নিয়েছিল।

কাল রাত্রে আপনি তাহলে—

বাসবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাত্রি গুপ্তা বললেন, কাল আমি বাড়িতে একলাই ছিলাম। আমার খুড়শ্বশুর অবশ্য পেছনের ব্লকে ছিলেন। তবে ওই ব্লক থেকে এই ব্লকে আসার কোন দরজা নেই, মাঝখানে পার্টিশন ওয়াল দেওয়া। আমার বেশ ভয়-ভয় করছিল, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর মনে নেই।

আপনার ঘুম ভাঙল বোধহয় ভোরে?

সাতটার পর কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে গিয়ে পার্লারের সামনেকার দরজাটা খুলে দিলাম। বলাই ঢুকল ভেতরে।

তারপর বলাই বোধহয় মৃতদেহটা আবিষ্কার করল?

হ্যাঁ। ও লাইব্রেরি ঘরে ঝাড়ামোছা করতে গিয়েই মৃতদেহটা দেখতে পায়।

আচ্ছা মিসেস গুপ্তা, বারান্দার দরজার তালাটা নাকি বাইরে থেকে দেওয়া মিটার রিডের সুবিধের জন্য। হঠাৎ এরকম ব্যবস্থা আপনারা চালু করলেন কেন?

না করে উপায় ছিল না। দেখছেনই তো আমাদের পরিবারে লোক কত কম। আমরা প্রায়ই বাড়ির বাইরে বাইরে থাকায়, কয়েকবার মিটার রিডই হয়নি—লাইন প্রায় কেটে দেওয়ার উপক্রম। তাই এরকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ধরুন, আপনারা কেউ বাড়ি নেই, এই সময় লোকটি মিটার রিড করতে এসে মূল্যবান কিছু চুরি করে নিয়ে পালাল, তখন?

সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। লোকটিকে আমরা অত্যন্ত বিশ্বাসী বলেই জানি। আগে ও ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর কাজ করত। এমন কি এ-বাড়ির ওয়্যারিংও ওই করছে।

বাসব একটু চিন্তা করে বলল, শোভনবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কথা নিশ্চয়ই আপনার স্বামী জানেন না ?

মাথা নিচু করে রাত্রি গুপ্তা উত্তর দিলেন, না।

ওয়েল মিসেস গুপ্তা, এখন তাহলে আমরা উঠলাম। আপনি যে উড়ো চিঠিগুলো পেয়েছেন, তার একখানা উপস্থিত আমায় দিলে ভাল হয়—

রাত্রি গুপ্তা খাট থেকে নেমে ওয়ার্ডরোবের কাছে এগিয়ে গেলেন তারপর তার পাল্লাটা খুলে ভেতরের ড্রয়ারের মধ্যে থেকে একটা চিঠি বার করে বাসবের হাতে দিলেন। বাসব চিঠিটা পকেটে রেখেই সান্ত্বনাসূচক কয়েকটা কথা বলল মিসেস গুপ্তাকে। তারপর শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সারাদিনের মধ্যে একটা কথাও বলল না বাসব। গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

বিকেল পাঁচটার সময় শৈবালকে বাড়িতে থাকতে বলে বাসব বেরিয়ে পড়ল। ফিরে এল আটটার পর। মুখের চিন্তিত ভাবটা কেটে গেছে, তার পরিবর্তে ওকে বেশ আনন্দিতই মনে হচ্ছে এখন। বাড়ি ফিরেই টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। একটা নাম্বারে ডায়াল করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

শৈবাল একতরফা কথা শুনে যেতে লাগল…হ্যালো, কে মিসেস গুপ্তা… আপনাদের বারান্দার দরজা—অর্থাৎ যার তালা বাইরের দিক থেকে বন্ধ, তার ক'টা চাবি আছে…কি বললেন ? দুটো…ও…কি বললেন ? একখানা থাকে মিটার রিডারের কাছে আর অন্যখানা চাবির রিঙে…শুনুন, দেখুন তো আপনার চাবির রিঙে দ্বিতীয় চাবিখানা আছে কিনা…বেশ তো, আমি হোল্ড করছি…কি বললেন ? চাবিটা নেই…আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন ? আমি কিন্তু হচ্ছি না মিসেস গুপ্তা…ভাল কথা, চাবির রিঙটা থাকত কোথায় ? ভ্যানিটি ব্যাগে · আচ্ছা, গুড নাইট।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল বাসব।

সোফায় এসে বসল। তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

শৈবাল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার হাবভাব ক্রমেই ভীষণ হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। আমার কাছে এদিকে সবই…

ধোঁয়া বলে মনে হচ্ছে। বাসব ওর কথাটা পূর্ণ করল। যাক, এস মার্ডারটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। তুমি তো ডেডবডির পজিশন দেখেছ ডাক্তার। ও বিষয়ে তোমার কি ধারণা ?

আমার মনে হয়, নিহত ব্যক্তি দরজার দিকে পেছন করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু দেখছিল। এই সময়ে হত্যাকারী তাকে পেছন থেকে স্ট্যাব করে।

আমারও তাই মনে হয়। তারপর বডিটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমি ঘটনাটা এইভাবে সাজিয়েছি মোটামুটি। মৃত লোকটি কোন বিশেষ

কারণে বারান্দার দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে আসে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সে দরজার চাবি পেল কোথা থেকে? আমার মনে হয়, হত্যাকারী আগেই রাত্রি গুপ্তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবিটা চুরি করে এবং ওই লোকটি ও সে নিজে একই সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। এখানে ধরে নিতে হবে হত্যাকারী ও লোকটির মধ্যে বিশেষ আলাপ ছিল। তারপর তোমার কথামত খুন হয়ে যাওয়ার পর খুনী ওখান থেকে সরে পড়ে। হত্যাকারী একজন বলশালী লোক। তা না হলে ছোরাখানা দেহের এতখানি অভ্যন্তরে যেতে পারে না।

কিন্তু দুটো জিনিস রহস্যই থেকে যাচ্ছে। এক, লোকটি কে এবং কেন ও বাড়িতে গিয়েছিল। আর দুই, হত্যার উদ্দেশ্য কি?

তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু ও দুটো ব্যাপারেই আমি এখনও কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারিনি। কিছুক্ষণ আগে থানায় গিয়ে আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছি। এগুলো সবই নিহত ব্যক্তির পকেটে পাওয়া গেছে।

বাসব পকেট থেকে বার করল একে একে—একটা নোটবই, ফাউণ্টেন পেন, একটা চিঠি, একটা সিনেমার আধছেঁড়া টিকিট।

শৈবাল বলল, এগুলো থেকে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারবে বলে তুমি বিশ্বাস কর?

আমার তো মনে হয় পারব।

বাসব জিনিসগুলো পকেটে ভরতে ভরতে আবার বলল, আমি এখন ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে তোমায় একটা প্রশ্ন করি—

কর।

কয়েকদিন থেকে ভীষণ ঠাণ্ডা চলেছে, তবু মৃতব্যক্তির গায়ে আমরা কোন গরম কাপড় দেখতে পাইনি কেন? এই প্রচণ্ড শীতে শুধু একটা সার্ট গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুবার কি কারণ থাকতে পারে, বলতে পার?

শৈবাল আশ্চর্য হয়ে ভাবে। তাই তো, এ জিনিসটা তো সে মোটেই খেয়াল করেনি! হতব্যক্তির গায়ে ছিল ডেক্রনের ট্রাউজার আর সাদা সার্ট মাত্র।

দু'ঘণ্টা পরে বাসব বেরিয়ে এল ল্যাবরেটরি ঘর থেকে। হস্তস্থিত সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, কি ডাক্তার, যা বলে গিয়েছিলাম, ও বিষয়ে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলে?

আমার মনে হয়, লোকটির গায়ে কোট ছিল, নিহত হওয়ার পর সেখানা খুলে নেওয়া হয়েছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। খুন হওয়ার আগের দিন যখন লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখনও তার গায়ে ওই জামাকাপড়ই ছিল। হয়ত সে বিকেলবেলাতেই ফিরে এসেছিল আবার এবং কোনক্রমে বারান্দার ওই দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। তারপর—

তাহলে তো তোমার আগের থিয়োরি টিকছে না।

কই আর টিকছে! যাক, ও-কথা পরে ভাবলেই চলবে। এখন তুমি আমার একটা আবিষ্কারের কথা শোন। আমি ওই জিনিসগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি, নিহত ব্যক্তিটি বাংলাদেশের লোক নয়, সুদূর রাজপুতনার অধিবাসী।

কি রকম?

আমি নোটবই, ফাউণ্টেন পেনের খোল ইত্যাদি অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, ওগুলোর খাঁজে প্রচুর বালির কণা জমা হয়ে রয়েছে।

বালির কণা!

হ্যাঁ। রাজপুতনা বালির দেশ, ওখানকার অধিবাসীদের ব্যবহৃত জিনিসে বালির কণা পাওয়া যাবে, এতে আর বৈচিত্র্যের কি আছে! তাছাড়া ওই চিঠিখানাও এসেছে আমার কোট থেকে।

চিঠি আর নোটবুকে কি আছে?

বিশেষ কিছু নেই। নোটবইটায় খাপছাড়া ভাবে রোজগার খরচ লেখা। চিঠিখানা হিন্দীতে রামস্বরূপ নাম কোন লোকের লেখা। অতি মামুলি চিঠি। মৃত লোকটিকে চিঠিতে অমিয়বাবু হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে।

বাসব আর কিছু বলল না। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে পায়চারি করতে লাগল।

পরের দিন একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে তিনটে চেয়ারে বসে রয়েছে বাসব, শৈবাল আর শোভন। রাত্রি গুপ্তার বন্ধু শোভন রায়।

ঠিকানাটা আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল বাসব। তাই আজ সকালেই শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ও চলে এসেছে শোভন রায়ের বাড়িতে।

আপনার সঙ্গে তাহলে হপ্তাখানেক মিসেস গুপ্তার দেখা হয়নি?

বাসবের কথার উত্তরে মিঃ রায় বললেন, না। কয়েকদিন বিশেষ কাজে আমি ব্যস্ত ছিলাম।

আপনি উড়ো চিঠি আর ওই লোকটির সম্বন্ধে কি জানেন?

বিশেষ কিছুই না। রাত্রি পর পর দুটো উড়ো চিঠি পেয়েছিল, আর ওই লোকটি কিছুদিন ধরে ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করত—আমি এইটুকুই জানি।

হুঁ। আপনার সঙ্গে রবীন গুপ্তর আলাপ আছে?

না।

অথচ আপনি তাঁর বাড়ি যাতায়াত করতেন—

তীব্র কণ্ঠে শোভন রায় বললেন আপনি কি মীন করছেন?

বাসব নির্বিকার কণ্ঠে বলল, সাদা চোখে যা দেখা যাচ্ছে। রাত্রি গুপ্তার

সঙ্গে আপনার এত দহরম মহরম অথচ তাঁর স্বামী মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে মৌখিক আলাপটুকু পর্যন্ত আপনার নেই।

আপনার সংগে সহযোগিতা করবার ইচ্ছেই আমার আছে। তবে আপনি অফট্র্যাকে চলে যাচ্ছেন।

একেবারেই না। রাত্রি গুপ্তার সংগে আপনার কি সম্পর্ক মিস্টার রায় ?

ব্যক্তিগত কোন কথা আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না।

অবশ্য আপনি না বললেও আমার কিছুই অজানা থাকবে না। চল ডাক্তার, ওঠা যাক। আচ্ছা মিস্টার রায়—গুড ডে।

ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফিরতে ওদের মিনিট আটেকের বেশি লাগল না।

বাইরের ঘরেই এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন।

ওদের দেখেই তিনি বললেন, আমি রবীন গুপ্ত।

বাসব এগিয়ে এসে বলল, কি সৌভাগ্য! বসুন—বসুন—নিশ্চয়ই আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে ?

না, না, এই আসছি। কাল রাত্রেই ফিরেছি ওয়ালটেয়ার থেকে।

শৈবাল খুঁটিয়ে দেখল ভদ্রলোককে। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী। দেহের গঠনে বেশ শক্তিমান বলেই মনে হয়। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশের মধ্যেই।

বাসব সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরল তার দিকে। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে করতে মিঃ গুপ্ত বললেন, আমারই বাড়িতে যে এ-রকম ইন্সিডেণ্ট হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এসে শুনলাম, রাত্রির অনুরোধে আপনি কেসটা হাতে নিয়েছেন। তাই সোজা চলে এলাম আপনার কাছে। যদি কোনরকম সাহায্য হয়—

খুবই ভাল কাজ করেছেন মিস্টার গুপ্ত। আচ্ছা, আপনি মর্গে গিয়ে ডেডবডি দেখে এসেছেন ?

হ্যাঁ। কাল রাত্রেই দেখেছি। লোকটিকে আদপেই চিনতে পারলাম না।

আপনার কিছু খোয়া গেছে বাড়ি থেকে ?

আমার স্ত্রীর কাছে খোঁজ করেছিলাম, ও তো বললে কিছুই হারায়নি।

আপনার মোটর আছে ?

এই রকম প্রশ্নে একটু আশ্চর্য হলেন রবীন গুপ্ত। বললেন, না। তবে কেনবার ইচ্ছে রয়েছে।

আপনার পারিবারিক বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে পারি নিশ্চয়ই ?

ও, সিওর। কি জানতে চান বলুন ?

আমি আপনাদের পরিবারের বিষয় কিছু জানতে চাই। কিছু অতীতের—কিছু বর্তমানের।

একটু নীরব রইলেন মিঃ গুপ্ত। মনে মনে সমস্ত বিষয়টা গুছিয়ে নিলেন যেন। তারপর আরম্ভ করলেন, আমার পারিবারিক ইতিহাস আমারই যে খুব

ভালভাবে জানা আছে, তা নয়। তবে যতটুকু জানি বলছি। আমার দাদু বরেন গুপ্ত, অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন একরোখা ও রাশভারি। তাঁর তিন ছেলে। আমার বাবা, আমার মেজকাকা অসীম গুপ্ত, আর ছোটকাকা অচিন গুপ্ত। দাদুর বেশ বয়স হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি উইল করবেন মনস্থ করলেন। উইলও হল যথা সময়ে, কিন্তু উইলের মর্মকথা ছেলেদের জানতে দেওয়া হল না। এদিকে ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মনোমালিন্য দেখা গেছে—বিশেষ বাবার সঙ্গে ছোটকাকার। ছোটকাকাকে কিন্তু দাদু খুব ভালবাসতেন। সেবার গরমে ছোটকাকাকে নিয়ে উনি সিমলা বেড়াতে গেলেন। হপ্তাখানেক পরে সিমলা থেকে তার এল: দাদু নাকি পাহাড়ের ওপর থেকে খাদে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যথা সময়ে উইল পড়া হল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দাদু ছোটকাকাকে এক কপর্দকও দিয়ে যাননি। ছোটকাকা ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর মতে এ উইল জাল। বাবাও বললেন, দাদু খাদে পড়ে যাননি। তাঁকে ছোটকাকাই ধাক্কা মেরে ফেলে খুন করেছেন। একথা শোনবার পর জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন; গুম হয়ে গেলেন তিনি এবং পরের দিন আর বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি, পুলিশ খবর দেওয়া, সবই হল, কিন্তু ফল কিছুই পাওয়া গেল না। তবে বছরখানেক পরে জানা গেল, ছোটকাকা ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছেন। তারপর কত বছর কেটে গেছে, বাবা মারা গেছেন। অবশ্য মারা যাওয়ার আগে তিনি মেজকাকার সঙ্গে পার্টিশন করে নিয়েছিলেন। এই আমাদের পরিবারিক ইতিহাস।

একটানা এতক্ষণ বলার পর থামলেন রবীন গুপ্ত।

বাসব বলল, ছোটকাকাকে আপনার মনে আছে?

না। আমি ছোটবেলা থেকেই মধ্যপ্রদেশের সুবিখ্যাত সিন্ধিয়া স্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছি। পড়া শেষ করে যখন বাড়ি ফিরি, তখন ছোটকাকা মারা গেছেন।

হুঁ। শোভন রায় বলে কাউকে চেনেন?

না।

আপনার দাম্পত্য-জীবন কেমন মিস্টার গুপ্ত?

খুবই ভাল। কিন্তু একথা কেন মিস্টার ব্যানার্জী?

এমনি। কফি খাবেন তো?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কফি এল। দু-একটি সৌজন্যসূচক কথা বলতে বলতে কফি শেষ করলেন মিস্টার গুপ্ত। তারপর তিনি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ডাক্তার, কি রকম বুঝলে ভদ্রলোককে?

আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে যেন একটু বেশি মাত্রায় ইন্টা-

মনে হল।

তাছাড়া কত বেশি কথা বলেন ভদ্রলোক লক্ষ্য করলে ?

সন্ধ্যেবেলায় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল। যা আন্দাজ করা গেছল, তাই। শুধু বেশির মধ্যে জানা গেল, মৃতলোকটির শরীরের মধ্যে সায়ানাইড আর অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।

বেশ রাত করে বাসব বাড়ি ফিরল। শৈবাল তখনো জেগে বসে রয়েছে। বাসব থানায় পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখার পর সোজা রবীন গুপ্তর বাড়ি চলে গেছল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, এত দেরি হল কেন তোমার ?

বাসব সোফায় বসতে বসতে বলল, আর বল কেন ! মিসেস গুপ্তাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাবার ছিল—

চিঠি !

হ্যাঁ, হে। ওখান থেকে বেরিয়েই সোজা গেলাম চৌরঙ্গী পাড়ার এক সিনেমা হলে। ওখান থেকে আবার রিপন স্ট্রীটের এক দর্জির দোকানে।

দর্জির দোকানে ! তুমি যে ক্রমেই—

আহা-হা, ব্যস্ত হয়ো না ডাক্তার। সমস্ত ধাঁধার উত্তর তুমি কালই পাবে।

শৈবাল প্রায় লাফিয়ে উঠল : বল কি ! তুমি জানতে পেরেছ লোকটার পরিচয় ?

শুধু তাই নয়। হত্যাকারীও আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। আচ্ছা, জিনিসটা তোমার কাছে একটু সরল করে আনি। বারান্দার দরজার চাবিটা মিসেস গুপ্তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চুরি গেছে নিশ্চয়ই শুনেছ ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বল তো, কার পক্ষে ওই চাবিটা চুরি করা সবচেয়ে সহজ ?

শৈবাল এক মিনিট চিন্তা করে বলল, রবীন গুপ্ত যখন এখানে ছিলেন না, তখন—মিসেস গুপ্তার বিশেষ বন্ধু শোভন রায়, তাঁর পক্ষেই অবশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে···তুমি তাহলে বলতে চাও···

বাসব মৃদু হাসল : আমি আজ আর কিছুই বলতে চাই না। রাত হয়েছে ; চল, খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বাসবের অনুরোধে সকলে একত্রিত হয়েছেন রবীন গুপ্তর ড্রইংরুমে ॥

মিসেস গুপ্তা, অসীম গুপ্ত, শোভন রায় ও রবীন গুপ্ত।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করল সাতটার পর। ওর হাতে একটা যেনশও ব্যাগ।

ওরা দুজনে সোফায় বসল।

সকলের মুখের ওপর একটা থমথমে ভাব। বাসব সকলের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমি আপনাদের এইভাবে বিরক্ত করার দরুণ দুঃখিত। না করেও উপায় ছিল না। পুলিশ ওয়ারেণ্টের সাহায্যে কালই একজনকে অ্যারেস্ট করবে। তাই—

গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে রবীন গুপ্ত বললেন, অ্যারেস্ট! কাকে?

আপনার স্ত্রীকে।

আমাকে! বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন রাত্রি গুপ্তা। কিন্তু আমি…আমি তো…

আমি জানি আপনি কি। পুলিশ অযথা আপনাকে সন্দেহ করেনি। তারা খবর পেয়েছে, দুর্ঘটনার দিন রাত এগারটার পর আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, গি—গিয়েছিলাম। খুনের সঙ্গে তার…

তবে আপনি আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? আপনি বলেননি, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরে রাতভোর আপনি বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলেন?

এই শীতেও ঘেমে উঠেছেন মিসেস গুপ্তা। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, আমি কোন কারণে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন…

আপনি উত্তেজিত হবেন না রাত্রিদেবী, শান্ত হোন। শুধু আপনিই যে মিথ্যে কথা বলেছিলেন, তাই নয়—রবীনবাবু, আপনি কলকাতাতেই ছিলেন, অথচ সকলের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছেন, ওয়ালটেয়ারে থাকার বিষয়ে। এর অর্থ কি?

রবীন গুপ্ত যেন ফেটে পড়বেন। তিনি নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ। আমি কলকাতাতেই ছিলাম, কিন্তু তাতে কি এল গেল? নিশ্চয়ই এতে প্রমাণ হচ্ছে না আমি হত্যাকারী?

বাসব ও-কথায় কান না দিয়ে বলল, আপনারা কাল সকালে পুলিশ আসবার আগেই নিজের নিজের পরিষ্কার অ্যালিবাই আমায় দেবেন, এটাই আশা করব। অবশ্য না দিলেও যে আমার খুব ক্ষতি হবে, তা নয়। এই ফোলিওর মধ্যেই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দুটো বড় প্রমাণ আমি সংগ্রহ করে রেখেছি। এক—একটা টেরিলিনের টুকরো। দুই—সিনেমায় জিনিস জমা রাখার আট নম্বরের একটা টোকেন। হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার পক্ষে ও দুটোই যথেষ্ট। চল ডাক্তার—

বাসব আর একটি কথাও না বলে, ঘরের চারটি নিশ্চল স্তম্ভিত মূর্তির সামনে দিয়ে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

একটানা ঝিল্লির ঐকরব শোনা যাচ্ছে।

সশব্দে দুটো বাজল কোথায়। চারধারে কালো অন্ধকার—শীতের রাত যেন চিরদিনের মত পৃথিবীকে গ্রাস করেছে।

বাসব আর শৈবাল গভীর ঘুমে অচেতন।

মৃদু শব্দ হল কোথায়!

বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছায়ামূর্তি। বিরাট অলেস্টারে সারা দেহ তার ঢাকা। মাথায় মাইন ক্যাম্প। ছায়ামূর্তি বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে বাথরুমের জানলাটা খুলে ফেলল আগন্তুক। তারপর গরাদহীন জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আগন্তুক এগিয়ে চলল, বাথরুম পেরিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে। এ-ঘরের ও-ঘরের পর শোবার ঘরে এসে থামল ও। সন্তর্পণে খাটের কাছে এগিয়ে গেল। ঝুঁকে দেখল, লেপের মধ্যে থেকে মাথা বার করে গভীর ঘুমে অচেতন দুজনে। ভারি নিশ্বাস পড়ছে।

আগন্তুক শোবার ঘর পেরিয়ে বাইরের ঘরে এল। ঘরের চতুর্দিকে টর্চের আলো ফেলে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। এক সময়ে ওর দৃষ্টি পড়ল ম্যান্টিলপিশের ওপর। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ফোলিও ব্যাগটা। আগন্তুকের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে ফোলিওটা তুলে নিতে গেল আগন্তুক, কিন্তু—

ঠিক সেই মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলোটা।

একটু ভুল হচ্ছে মিস্টার গুপ্ত, টেরিলিনের টুকরো আর টোকেনটা ফোলিওর মধ্যে নেই।

বাসবের কণ্ঠস্বরে ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ গুপ্ত। একটা অগ্নিময় দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন তাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইলেন।

এই সময়ে বারান্দায় কয়েকজোড়া ভারি জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। শৈবাল দরজা খুলে দিল। সদলে বিরাজ সোম ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনার পাংচুয়ালিটির জন্য ধন্যবাদ। আসামী এইখানেই উপস্থিত। আপনি অচিন গুপ্তকে হত্যার অপরাধে রবীনবাবুর কাকা অসীম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

বিরাজ সোম অসীম গুপ্তের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন অসীমবাবু। চোখের সেই দৃষ্টিটা ম্লান হয়ে এসেছে। তিনি ধীরে ধীরে মাথা নত করলেন।

আমি দুঃখিত মিস্টার গুপ্ত। ইন্সপেক্টার সোম বললেন, কর্তব্যের অনুরোধে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।

মাথা তুললেন অসীমবাবু। বললেন, আমি রেডি ইন্সপেক্টার। চলুন—

বাসব ও শৈবালকে নৈশ আহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রবীন গুপ্ত। আহারের পর সকলে ড্রইংরুমে এসে বসেছেন।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ শীত একটু কম।

খাপছাড়া ভাবে গল্প চলেছে। এক সময় রবীনবাবু বললেন, আপনি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন, মৃতব্যক্তিটি আমার কাকা ?

তা কি করে পারব ! তবে আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস জানবার পরই আন্দাজ করেছিলাম।

আপনি প্রথম থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা বলুন মিস্টার ব্যানার্জী। রাত্রি গুপ্তা অনুরোধ জানালেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে আরম্ভ করল, মিসেস গুপ্তা এলেন একদিন আমার বাড়িতে। একটি লোক নাকি কিছুদিন ধরে ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করছে। কথাপ্রসঙ্গে এও জানতে পারলাম, শোভন রায় নামে একটি লোকের সঙ্গে রাত্রিদেবীর বিশেষ আলাপ ছিল এবং এখনো বন্ধুত্ব বজায় আছে। উনি আমার কাছে সাহায্য চাইলেন, ওই লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম, কোনরকম ক্ষতি না করে শুধু ছায়ার মত অনুসরণ করার মধ্যে কি সার্থকতা থাকতে পারে ? ঠিক যেন পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে মিসেস গুপ্তাকে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে এল —পাহারাই দিচ্ছে না তো লোকটা, সম্ভবত মিস্টার গুপ্তের নির্দেশে।

এই সময়ে রবীন গুপ্ত বললেন, আপনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন মিস্টার ব্যানার্জী। মেজকাকা আমায় একদিন বললেন, তিনি নাকি একজনকে প্রায়ই এ বাড়িতে আসতে যেতে দেখেছেন। আমার সন্দেহ হল। ভাবলাম, আমি কলকাতার বাইরেই থাকি—রাত্রি কি তবে—! যদিও আমি স্ত্রীকে খুবই ভালবাসি, তবু মনের মধ্যে একটা খটকা লাগল। আমি রাত্রিকে ওয়াচ করবার ব্যবস্থা করলাম।

যাই হোক, আমার অনুমানটা ঠিক কিনা প্রমাণ করবার জন্যে, সেদিন বিকেলে লোকটিকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু ফল কিছুই হল না, মাঝ থেকে ধরা পড়ে গিয়ে নাজেহাল হয়ে ফিরে আসতে হল। পরের দিন সকালে খবর পেলাম লোকটি খুন হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চারটি জিনিস আমার চোখে পড়ল। এক : টেরিলিনের একটা টুকরো। দুই : মৃতের মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ। তিন : একটা টোকেন। চার : মৃতব্যক্তির গায়ে কোনরকম গরম কাপড় না থাকা। আরেকটা জিনিস জানতে পারা গেল, বারান্দার দরজাটা রাস্তার দিক থেকে তালা দেওয়া মিটার রিডারের সুবিধা হওয়ার জন্যে নাকি। এক-আধ দিনের ব্যবধানে রাত্রিদেবী, অসীমবাবু, শোভন রায় এবং রবীনবাবু আমার কাছে তাদের বক্তব্য বললেন। রবীনবাবুর পারিবারিক ইতিহাস শোনার পরই আমার মনে একটা খটকা লাগল। মৃতের

পকেটে যে জিনিসগুলো পাওয়া গেছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে আমি বুঝতে পেরেছিলুম, লোকটি বালিপ্রধান দেশের অধিবাসী। ওই জিনিসগুলোর মধ্যে একটা চিঠিও ছিল। জনৈক রামস্বরূপ অমরকোট থেকে লিখেছে। অমরকোটে মৃতলোকটির আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেল। সেখানে এমন কতকগুলো জিনিস পাওয়া গেল, যাতে প্রমাণ হল উনি রবীনবাবুর কাকা অচিন গুপ্ত। ছদ্মবেশে ওখানে বাস করছিলেন।

বাসব থামল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে প্রশ্ন করল, অচিনবাবুকে আপনি কিভাবে এ-কাজে নিয়োগ করলেন মিস্টার গুপ্ত ?

মেজকাকার মুখে রাত্রির সম্বন্ধে ওই কথা শোনার পর, আমি তাঁরই কাছে পরামর্শ চাইলাম—এ বিষয়ে কি করা যায় ? উনি বললেন একটু নজরে নজরে রাখতে। ঠিক এই সময়েই আমার অচেনা ছোটকাকাটি আমার কাছে এলেন চাকরির সন্ধানে। আমি প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। ওঁকে মোটা মাইনে দিয়ে বহাল করলাম কাজে—ওঁর ডিউটি হল রাত্রিকে ওয়াচ করা।

বাসব আবার বলতে শুরু করল, প্রথমে আমি সন্দেহ করিনি অসীমবাবুকে। কিন্তু তাঁর একটু সময়ের গরমিল আমায় ভাবিয়ে তুলল। উনি আমায় বলেছিলেন, ভোর সাড়ে ছ'টার সময় ভৃত্য বলাইয়ের মুখে প্রথম খুনের কথা জানতে পারেন। আবার মিসেস গুপ্তা বললেন, বেলা সাতটার পর কলিংবেলের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। উনি দরজা খুলে দিতে বলাই ঘরে প্রবেশ করে। কাজেই অসীমবাবুর পক্ষে বলাইয়ের মুখ থেকে সাড়ে ছ'টার সময় খুনের কথা জানা সম্ভব নয়। এদিকে রবীনবাবুও আমার কাছে কিছু সত্য লুকিয়ে গেছিলেন। তিনি আমায় বলেন, কাল রাত্রে ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরেছেন। উনি অবশ্য তলিয়ে দেখে কথাটা বলেননি। নইলে বুঝতে পারতেন, ওয়ালটেয়ার থেকে কলকাতা ফেরার রাত্রে কোন ট্রেন নেই। সোজা ওখান থেকে মোটরে এসেছেন কিনা জানবার জন্যে প্রশ্ন করে জানলাম ওঁর মোটরকার নেই। আবার মিসেস গুপ্তা বললেন, তিনি সন্ধ্যের পর থেকে ভোর অবধি বাড়িতেই ছিলেন। অথচ বীটের পুলিশ দেখেছে রাত সাড়ে এগারটার পর তাঁকে বাড়ি ফিরতে। পরে অবশ্য আমি জানতে পেরেছি, উনি শোভন রায়ের কাছে গেছিলেন। তাই না মিসেস গুপ্তা ?

রাত্রি গুপ্তা সহজ কণ্ঠেই বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার ব্যানার্জী। আপনি এত কথা যখন জানেন, তখন নিশ্চয়ই জানেন যে আমি শুভাকাঙ্ক্ষী বললেও, আসলে শোভন দিনের পর দিন আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। কেন জানি না, কিছুদিন ধরেই ও আর আমাদের বাড়িতে আসত না। সেদিন ও টেলিফোনে সাড়ে ন'টার সময় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দেখা করতে বলে আমায়। তারপর ঘণ্টা দুয়েক অনির্দিষ্ট ভাবে আমরা ট্যাক্সিতেই ঘুরে বেড়াই। ও আমার কাছে একটা বড় রকম টাকার দাবি জানায়। আমি

ওকে বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি, এইভাবে ও যেন আমার ক্ষতি না করে আর। শোভন আমাকে ভয় দেখাতে থাকে। টাকা না দিলে ও নাকি আমার স্বামীকে কি সব বলবে।

বাসব আরেকটা সিগারেট ধরাল।

হ্যাঁ, এই রকমই আমি অনুমান করেছিলাম। মৃতব্যক্তির পকেটে একটা সিনেমার টিকিট পাওয়া গেছিল। 'আট' লেখা টোকেনটা পকেটে ফেলে আমি টিকিটের ওপর নাম ছাপা নির্দিষ্ট সিনেমা হলে গেলাম। টোকেনটা যে মাল জমা দেওয়ার, তা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। কাউণ্টারে গিয়ে বললাম, সেদিন তাড়াতাড়িতে জিনিসটা নিতে ভুলে গেছিলাম, তাই—। তারা টোকেন নিয়ে মালটা দিয়ে দিল। জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা ছাতা আর একটা কোট। পুলিশের সাহায্যে ওই ছাতার বাঁট থেকে পাওয়া গেল একটা হাতের ছাপ, এবং আমি নিশ্চিত জানতাম অসীমবাবুর হাতের ছাপের সঙ্গে তার হুবহু মিল হবে। কোটটা অবশ্য অচিনবাবুর। মিসেস গুপ্তার কাছে এক সময় খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, গুপ্ত-পরিবারের জামা-কাপড় তৈরি হয় রিপন স্ট্রীটের 'টিপটপে'। পুলিশের নাম করে ওখানে গিয়ে খোঁজ করতেই জানা গেল, কিছুদিন আগে অসীমবাবু ওভালটিন কালারের একটা টেরিলিনের সার্ট এখানে করিয়েছেন। এরপর যা ঘটেছে, তা আপনারা জানেনই।

শৈবাল বলল, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য কি?

আমার মনে হয়, অর্থের অভাবে অচিনবাবু কলকাতায় এসে অসীমবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। পুরো সম্পত্তি করায়ত্ত করার দুরন্ত লোভ ছিল অসীমবাবুর কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এখন তিনি দেখতে পেলেন সুবর্ণ সুযোগ তাঁর সামনে উপস্থিত। রগচটা ছোট ভাইটিকে হাতের মুঠোয় আনতে খুব বেশি কষ্ট হল না তাঁর। তিনি ভাইকে বোঝালেন, তার দুরবস্থার জন্যে দায়ী তাঁদের মৃত বড় ভাই। সে অবশ্য নাগালের বাইরে, তবে তার ছেলে রয়েছে। কেউটের বাচ্ছা কখনো ঢোঁড়া হতে পারে না, কাজেই—রবীনবাবুকে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে বলে কাজ খানিকটা তিনি এগিয়েই রেখেছিলেন, এখন অচিনবাবুকে পরামর্শ দিলেন ভাইপোর কাছে চাকরি নিতে। দুর্ঘটনার আগের দিন দুই ভাই সিনেমা গেলেন। দুজনেই একটু রঙে ছিলেন। তাই সিনেমা থেকে বেরোবার সময় টোকেন দিয়ে মাল ছাড়িয়ে আনার কথাটা মনেই পড়ল না কারোর। দুজনে ফিরে এলেন অসীমবাবুর বাড়িতে। ক্রমে অসীমবাবুর নেশা কেটে গেল, কিন্তু অচিনবাবু চুর হয়েছিলেন। কোন এক সময়ে মিসেস গুপ্তার ব্যাগ থেকে চুরি করে আনা চাবিটা তাঁর কাছেই ছিল। প্ল্যান মাফিক অসীমবাবু এবার কাজে নামলেন।

একে প্রচণ্ড শীত, তার ওপর অন্ধকার। পেছনের গলিতে লোক চলাচল ছিলই না। অসীমবাবু নিজের মত্ত ভাইটিকে নিয়ে, চাবি দিয়ে দরজা খুলে

এ-বাড়িতে এলেন। তাঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল, তখন বাড়িতে বলাই বা মিসেস গুপ্তা কেউই থাকবেন না। তারপর মদেচুর একজন লোককে হত্যা করতে খুব অসুবিধা হয়নি তাঁর। অবশ্য ওখান থেকে চলে আসার সময় পকেট থেকে টোকেনটা পড়ে যায় এবং দরজার হ্যান্ডেলে জামার কিছুটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে যায়। অচিনবাবুকে হত্যা করার উদ্দেশ্য হল রবীনবাবুকে ফাঁসানো।

কিভাবে?

অতি সহজেই। সেইজন্যেই অচিনবাবুকে আপনার কাছে চাকরি করতে পাঠানো হয়েছিল। এ পাড়ার সকলেই অচিনবাবুর ব্যবহারে সন্দেহাকুল হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক। একটা লোক যদি দিনের পর দিন কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেই বাড়িতে যদি কোন সুন্দরী মহিলা থাকেন তাহলে সকলের মনেই একটা বিশেষ ধরনের প্রশ্ন উদয় হবেই। তাছাড়া ওয়ালটেয়ারে খোঁজ করলেই জানা যাবে রবীনবাবু ওখানে নেই। কাজেই পুলিশ সহজেই তাঁকে, এবং সম্ভব হলে তাঁর স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করবে। এরপর হয় ফাঁসি, নয়ত দীর্ঘ মেয়াদের কারাবাস। তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত সম্পত্তি অসীমবাবুর হাতে চলে আসবে।

শৈবাল বলল, তুমি মিসেস গুপ্তাকে দিয়ে কাকে যেন একটা চিঠি লিখিয়েছিলে। সেটা কি ব্যাপার?

মিসেস গুপ্তা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছলেন। ও'র ভয় ছিল, এই গোলমালে শোভন রায় সংক্রান্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলবেন। আমি তাঁকে বললাম, রবীনবাবুর কিছু অজানা নয়। আপনি বরং শোভন রায়কে জানিয়ে দিন আর আপনি তাঁকে ভয় করেন না। ··আচ্ছা মিস্টার গুপ্ত, আপনি হঠাৎ ওই সময় ওয়ালটেয়ার থেকে কলকাতায় চলে এলেন কেন?

আসলে মেজকাকা যাই বলুন, রাত্রিকে আমি ঠিক সন্দেহ করতে পারছিলাম না। একজন লোক নিযুক্ত করেও মনে ঠিক শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাই সকলের অজান্তে নিজেই চলে এলাম সরেজমিন তদন্ত করতে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এখন নিশ্চয়ই আর সন্দেহের অবকাশ নেই?

আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মিঃ ব্যানার্জী!

ঢং ঢং করে দশটা বাজল এই সময়।

বাসব আর শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

মিসেস গুপ্তা দ্রুত কণ্ঠে বললেন, একি, এক্ষুণি উঠছেন! আপনার··

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাসব বলে উঠল, চেকটা না হয় কালই পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

তারপর ওরা দুজনে বিদায় নিল।

অথ্ পাথার ঘাঁটিত

অলকা পাশ ফিরে শুলো।

বহুক্ষণ ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে অলকা। কেন কে জানে আজ ন'টার আগেই রাজ্যের ঘুম চোখে এসে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু তখন বিছানায় গা ঢেলে দেবার উপায় নেই। নীলেশ ফেরেনি। সে ফিরবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, তারপর তো শোয়ার পালা।

নীলেশ ফিরল সাড়ে ন'টার কিছু পরে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সে কিন্তু বেরোয় না—বেরোয় না একলা থাকলে অলকা ভয় পাবে বলে। আজ অনন্যোপায় হয়ে বেরুতে হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে যখন দুজনে শোবার ঘরে পেঁছাল তখন প্রায় এগারটা।

নীলেশ সিগারেট পোড়াতে পোড়াতে দু-চার কথা বলল স্ত্রীর সঙ্গে, তারপর শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। অলকার ঘুম তখন চটে গেছে। সেই থেকে এপাশ-ওপাশ করে চলেছে বিছানায়। একবার মনে হয়েছিল নীলেশকে তুলে দেয়। বলে, একা একা তোমার ঘুমাতে লজ্জা করছে না! সে ইচ্ছে অবশ্য দমন করে ফেলেছে। মায়া হয়েছে অলকার। আজ হয়ত খাটা খাটুনি একটু বেশি হয়ে গেছে। শরীর ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। ঠাকুমা বলতেন উল্টোদিক থেকে গুনতে আরম্ভ করবি, ঘুম তখন না এসে পথ পাবে না। হাসি পেয়ে গেল। কি সমস্ত দিনই গেছে। অলকা আবার জামা বদলাল, হাত রাখল নীলেশের পিঠে। মন রসসিক্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় ঝনঝন করে কি যেন পড়ার শব্দ হল। অলকা সচকিত হল। খাবার ঘরের টেবিলের উপর থেকে ইঁদুর কি স্টেনলেস স্টিলের গেলাসটা ফেলল? কিন্তু আওয়াজ তো খাবার ঘরের দিক থেকে এল বলে মনে হল না। বাইরের দিক থেকে যেন—অলকার কানে এল এবার পায়ের আওয়াজ। কেউ দ্রুত পায়ে এধার থেকে ওধারে চলে গেল। ব্যাপারটা কি?

—এই শুনছ—

অলকা ধাক্কা দিল নীলেশকে।

—উঁ—

—ওঠ—ওঠ—চোর এসেছে।

নীলেশ ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল।

—কি বললে? চোর—

—আমি বাইরের দিকে কিরকম সমস্ত শব্দ শুনতে পেলাম। ভেতরে ঢোকার জন্য কেউ বোধহয় চেষ্টা করছে।

—কি বলছ আজে বাজে কথা।

—আমি নিজের কানে শুনলাম কে একজন এধার থেকে ওধারে ছুটে গেল। তার আগে—

—জোরে কথা বল না। দেখছি ব্যাপারটা কি। টর্চটা আবার গেল কোথায়!

—তুমি একা বাইরে যাবে?

—বডিগার্ড এখন পাচ্ছি কোথায়? কোন ভয় নেই। খালি হাতে বেরুব না।

টর্চটা পাওয়া গেল খুঁজে। আলো ফেলতে ফেলতে নীলেশ ঘরের একধারে এগিয়ে গেল। ওখানে ডাবল ব্যারেল সটগান দাঁড় করানো ছিল। বন্দুকটা হাতে নিয়ে, সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল রাস্তার দিকে। শব্দটা নাকি ওইদিক থেকেই এসেছে।

কোন লোক চোখে পড়ল না। মরা চাঁদের আলোয় চতুর্দিক বিবর্ণ দেখাচ্ছে। নভেম্বরের এই মাঝরাতে স্বাভাবিক কারণেই শিকারপুর ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে। অলকাও চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারেনি। বেরিয়ে এসেছিল পিছু পিছু।

নীলেশ তার দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্তির স্বরেই বলল, কোথায় কি? মাঝ থেকে আমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে।

—বিশ্বাস কর, দুবার আমি শব্দ শুনেছি। কিছু যেন পড়ে ভেঙ্গে গেল। তারপরই চলে গেল কেউ দৌড়ে।

শিকারপুরের মত ক্ষুদ্র জনপদে এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। লাইট জ্বালিয়ে যে ভাল করে চারদিক দেখবে তার উপায় নেই। পাশের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে নীলেশ একটা দরজায় করাঘাত করল। সংলগ্ন বাংলোটি অশোকের।

দরজায় করাঘাত করল নীলেশ।

—অশোক—অশোক—

বারকয়েক ডাকাডাকির পর অশোক বেরিয়ে এল। ঘুম তখনও যেন তার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। বাইরে এসে বারকয়েক চোখ কচলে নিল।

—কি ব্যাপার?

—তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত। আর বল কেন, অলকা কি সমস্ত শব্দ শুনেছে।

—শব্দ!

নীলেশ ব্যাপারটা বলল।

—ওঁর কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অশোক বলল, লোকটাকে অবশ্য আর পাওয়া যাবে না। তবে কি ভেঙ্গেছে তার সন্ধান আমরা পেলেও পেতে পারি।

মন্দ প্রস্তাব নয়। অলকা নিজেদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। নীলেশ আর অশোক লেগে পড়ল ঝনঝন শব্দের উৎসের সন্ধান করতে। খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। বাংলোর মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা কাঁচের গেলাসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। হয়ত কোন লোকের হাত থেকে গেলাসটা

পড়ে গিয়ে নিশ্চিত ভেঙেছে। তারপরই সে ছুটে সরে গেছে এখান থেকে।

অশোক আর নীলেশের মধ্যে যখন গেলাসটা নিয়ে গবেষণা চলেছে অলকার দৃষ্টি তখন গিয়ে পড়ল বাংলোর ডানধারে। ওখানে আধবয়সী একটা দেবদারু গাছ আছে। বেশ ঝাঁকড়া গাছ। মূর্তিমান প্রেতের মত কে একজন নেমে এল ওই গাছ থেকে। অলকা প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ওখানে একটা লোক।

দুই গবেষক ঝটিতে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল তাকে।

ঝাঁকড়া গাছের তলায় চাঁদের আলো ভালভাবে পৌঁছায়নি বলেই কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারা গেল না। নীলেশ আর অশোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। লোকটা তৎক্ষণে এগিয়ে এসেছে। এবার চিনতে পারা গেল তাকে—তিলকা মাঝি। স্বল্পবাক্, প্রৌঢ় এই আদিবাসীকে ওরা সকলেই চেনে। স্থানীয় এক কয়ারিতে পাথর কাটার কাজ করে। কোন সাতে-পাঁচে থাকে না। কারুর কারুর ধারণা ওর মাথায় গোলমাল আছে।

বিস্মিত গলায় অশোক বলল, মাঝরাতে তুমি এখানে কি করছ?

—টাকার ধান্দায় এসেছি বাবু।

তিলকা মাঝি বাংলা ভালই বলে।

—টাকা!

দুজনে অবাক হয়ে গেল।

—গাছের তলায় টাকার সন্ধান করছ?

—আমি গাছের উপরে ছিলাম, বাবু।

নীলেশ বলল, মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা খুলে বলবে কি?

অশোক বলল, গাছের উপর যখন ছিলে তখন নিশ্চয় একজনকে দৌড়ে পালাতে দেখেছ?

তিলকা মাঝি নির্বিকারভাবে বলল, কাকে আর দেখব? আমিই তো দৌড়ে এসে গাছে উঠলাম।

—গেলাসটা—

আমিই ভেঙেছি, বাবু।

সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। লোকটার এই খাপছাড়া কাণ্ড-কারখানার অর্থ কি? অনেকে যা সন্দেহ করে, এই মাঝরাতে তাই কি বাস্তব রূপ নিল? সত্যি সত্যি তিলকা মাঝি পাগল হয়ে গেল নাকি?

নীলেশ প্রশ্ন করল, এই সময় দৌড়ে গাছে উঠলে কেন? আর গেলাসটাই বা ভাঙার কি দরকার ছিল?

—বললাম তো বাবু, আমার টাকার দরকার।

—কি আবোল-তাবোল বকছ? মাথাটা কি সত্যি তোমার খারাপ হয়ে

গেল? এই অসময়ে আর জ্বালিও না। ঘরে ফিরে শুয়ে পড়গে যাও।

--ওহে, এদিকে দেখ—

অশোকের ডাকে নীলেশ মুখ ফেরাল।

--দেখছ, কারা আসছে।

দেখা গেল জন পাঁচ ছয় লোক আসছে এদিকেই। তাদের কাছে লণ্ঠন আর টর্চ দুই রয়েছে। এতরাতে এতগুলো লোক কি করতে আসছে এদিকে। কাছে আসতেই তাদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারল নীলেশ ও অশোক।

মনোতোষবাবুর দুই ভাগনে উদয় আর তাপস। অবশ্য আর বুঝতে বাকি থাকছে না নৈশাবিহারীদের উদ্দেশ্য।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে নীলেশ বলল, কোন সংবাদ পেলেন?

মহা উদ্বিগ্ন ভাগনেদের একজন বলল, না। পাটান থেকে আসছি।

--সেখানে কেন?

—ওখানে একজন ঠিকাদার থাকেন। মাঝে মাঝে উনি যেতেন ওখানে। খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম যদি গিয়ে থাকেন ওখানে।

—খুবই ভাবনার কথা হল। বাড়ি চলে যাননি তো?

—খবর নিতে লোক পাঠিয়েছি। তবে আপনাদের না বলে হঠাৎ চলে যাবেন এমন মনে হয় না।

আরো দু-চার কথার পর তাপস আর উদয় দলবল নিয়ে বিদায় নিল।

তিলকা মাঝিও যে ওই দলের সঙ্গে চলে গেছে মোটেই বুঝতে পারেনি নীলেশ বা অশোক। অলকা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে লক্ষ্য করেছে।

এগিয়ে এসে বলল, মাঝি যে পালাল।

অশোক বলে উঠল, তাইতো। লোকটা একেবারে-

—পাগল হয়ে গেছে। দেখলে না দেবদারু গাছের উপর চড়েছিল টাকার খোঁজে। বাকি রাতটা জেগে কাটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। অশোক শুয়ে পড় গিয়ে। আমরাও যাই।

এবার আগেকার কথা কিছু বলে নেওয়া বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

শিকারপুরের অবস্থান এমন এক জায়গায় যেখান থেকে মাত্র আট মাইল এগুলেই পশ্চিম বাংলার বীরভূমে পা দেওয়া যায়। অতি নগণ্য স্টেশন। কোন এক্সপ্রেস ট্রেনের এখানে থামার প্রশ্নই ওঠে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপ ও ডাউন মিলিয়ে দু'বার মাত্র এখানে স্টপেজ আছে গয়া প্যাসেঞ্জারের। তাও দু'মিনিটের বেশি শ্রান্তি দূর করার অবকাশ এখানে পায় না ইস্টার্ন রেলওয়ের সবচেয়ে ধীরগামী ট্রেনটি। অথচ মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত পাকুড় জমজম করছে।

শিকারপুরে অনেক সুবিধাই নেই।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আঁচলে ঢাকা পড়ে যায় গ্রাম। কেরোসিনের আলো সেই কালোর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। অবশ্য অজস্র জোনাকি অন্ধকার তরল করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। এইরকম কোন সন্ধ্যায় কেউ শিকারপুরে পা দিলে কল্পনাও করতে পারবে না মাত্র অল্প কিছুদূরেই আধুনিক সভ্যতার ঝড় বয়ে চলেছে।

নীলেশ এই পাণ্ডববর্জিত গ্রামে এসেছে মাসআটেক হল। বলা বাহুল্য, অকারণে আসেনি। এসেছে কারখানার কাজে। সে একটি বিখ্যাত কাগজের কারখানায় কাজ করে। কাগজ প্রস্তুতের জন্য এক ধরনের বাঁশের প্রয়োজন হয়। এই অঞ্চলের পাহাড়ের তরাই-এ সেই বাঁশের ঘন জঙ্গল আছে। বিহার সরকারের কাছ থেকে জঙ্গলের ইজারা নিয়েছে কারখানাওয়ালারা।

নীলেশ কলকাতার ছেলে। এখানে আসতে চায়নি।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ট্রান্সফার বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছিল। তার বিব্রত অবস্থা দেখে হেসে ফেলেছিলেন ম্যানেজার। বলেছিলেন দূর থেকে জায়গাটাকে আফ্রিকা মুল্লুকের মত মনে হচ্ছে বটে, তবে একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর এ'মুখো হতে চাইবে না।

—ওই অজ গ্রামে—

—তোফা জায়গা। কলকাতার এই একঘেয়েমির হাত থেকে তো রেহাই পাবে। রওনা হয়ে পড়।

অগত্যা নীলেশকে রওনা হতে হল। আশার কথা ওখানে অশোক আগে থেকেই আছে। একেবারে অথৈ জলে গিয়ে পড়তে হবে না। বেলা দশটার সময় শিকারপুরে গিয়ে উপস্থিত হল। স্টেশনে উপস্থিত ছিল অশোক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে নিয়ে উপস্থিত হল বাঁশবেত আর অ্যাসবেস্টাস দিয়ে তৈরি বাংলোয়।

—এই তোমার প্রাসাদ।

ভ্রূ-কুঁচকেই নীলেশ বলল, তাতো হল। এদিকে খিদের ঠেলায় আমার পেট যে জ্বলে যাচ্ছে।

—বিন্দুমাত্র ভেব না। সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে রয়েছে।

আদিবাসী চাকরটা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে ইঙ্গিত করতেই সে একগোছা চপচপে ঘি মাখানো রুটি আর বড় সাইজের এক বাটি মুর্গির মাংস এনে টেবিলের উপর রাখল।

অশোক বলল, আর কোন ব্যবস্থা করা গেল না। এই খেয়েই পেট ভরানো ছাড়া উপায় নেই।

খাদ্যবস্তু দেখে নীলেশের চোখ ছানাবড়া।

—এখানে মুর্গী পাওয়া যায় নাকি?

—যায় মানে! কত চাই তোমার? দেড় টাকা জোড়া। আমাদের জন্যই

দামটা চড়ে গেছে, নইলে আরো সস্তা ছিল।

—বল কি!

—তাছাড়া মুরগীতে যদি তোমার অরুচি ধরে যায়—হরিয়াল, বাউই ধরনের সুস্বাদু পাখি পাবে। ভেড়ার এখানে অভাব নেই। ইচ্ছে করলে মাটান খেতে পার। এই সমস্ত খাদ্য কলকাতায় রাজকীয় মেনুতে স্থান পেলেও, এখানে সাধারণ মানুষ নিয়মিত খায়।

—এই সমস্ত খেয়েই বোধহয় তোমার শীর্ণ চেহারা এমন কেঁদো মত হয়ে উঠেছে। রঙ বেশ ফিকে হয়ে এসেছে।

অশোক মৃদু হেসে বলল, ধরেছ ঠিক। তুমিও নিজেকে এই ফাঁকে মেরামত করে নিতে পার। আমি তো ভেবে রেখেছি রিটায়ার করার পর এখানে বাড়ি করব।

কয়েকদিনের মধ্যেই নীলেশের কুঁচকে থাকা ভ্রূ সরল হল। শুধু খাওয়া দাওয়াই নয়, এখানকার নৈসর্গিক শোভাও তাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। ম্যানেজারের তোফা জায়গা বলার সারবত্তা এবার সে ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। মাসদুয়েক পরে অলকাকে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। তারপর বেশ স্বচ্ছন্দ খাতেই সময় কেটে চলেছে।

কাজেরও তেমন চাপ নেই, বলতে গেলে মাসের মধ্য দশদিন কিছু করতেই হয় না। জঙ্গল থেকে সুষ্ঠুভাবে যাতে বাঁশ কাটা হয় তারই তদারক করা আর সেই সমস্ত বাঁশ কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা—এই হল তাদের প্রধান কাজ।

এবার আজকের ব্যাপারে আসা যাক।

তখন প্রায় সাতটা।

নভেম্বরের ঠাণ্ডার আমেজমাখানো সন্ধ্যা। কটস উলের ফ্লাইং সার্ট গায়ে চাপিয়ে নীলেশ বাংলো থেকে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হল। মাঝে মাঝে এই সময় বেরোয়। যায় মনোতোষবাবুর বাসায় আড্ডা দিতে। অলকাকে তখন সঙ্গ দেয় আদিবাসী ঝি।

মনোতোষ গাঙ্গুলী স্টোন চিপসের ব্যবসা করেন। এখন পাহাড়ের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে চিপস পাঠাচ্ছেন আসাম-দিল্লী হাইওয়ের কাজে। বেশ ভালই রোজগার করেন এই ব্যবসায়। ট্রাক আর ওয়াগান করেই মাল যায় এখানে ওখানে।

সদালাপী, অমায়িক ভদ্রলোক। বিয়ে করেননি। নিজের বলতে তাঁর আর কেউ নেই। দুই ভাগনেকে ছেলের মত মানুষ করেছেন। তারাই এখন তাঁর প্রাণ। উদয় আর তাপস মামাকে শ্রদ্ধা করে খুব। চিপসের ব্যবসায় দুই ভাই হল মনোতোষবাবুর প্রধান সহায়। তিনজনে কাজের সুবিধার জন্য থাকেন শিকারপুরেই। সপ্তাহে একবার ভাগনেদের নিয়ে মামার বাড়ি যান।

নীলেশ আর অশোকের সঙ্গে মনোতোষবাবুর পরিচয় হয় যাকে বলে

াটকীয়ভাবেই। ও'র পাথরভর্তি একটা ট্রাক কিভাবে যেন পাহাড়ের কাছেই স্বল্প গভীর খাদে গিয়ে পড়েছিল। বহু চেষ্টা করার পরও যখন খাদ থেকে ট্রাক তোলা সম্ভব হল না, তখন মনোতোষবাবু বাঁশ-কাটা কুলিদের সাহায্য চেয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাহায্যে ট্রাক উপরে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই সূত্রে দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় ও'র।

আজ দুপুরেই নীলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মনোতোষবাবুর। তখন উনি ট্রাকে পাথর বোঝাই করাচ্ছিলেন। বয়স হয়েছে কিন্তু খাটা খাটুনিতে এখনও পিছু হটেন না। ভাগনে দুজন অবশ্য কাছেপিঠে থেকে কাজের খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রাখছে।

মৃদু হেসে বললেন, কোথায় চলেছেন ?

—বাসায় ফিরছি।

—বেশ আছেন। এরকম আরামের চাকরি পেলে আমি তো এখুনি ব্যবসা-পত্তর গুটিয়ে ফেলি।

—দূরে থেকেই মনে হয় আরামের চাকরি।

অশোকও এসে পড়েছিল এই সময়।

বলল, খাটুনি যখন আরম্ভ হয় তখন বুঝতে পারা যায় কত আরামে আমরা রয়েছি। বরং একটা ব্যবসা-ট্যবসা করতে পারলে বেঁচে যেতাম।

মনোতোষবাবু পকেট থেকে পানের ডিবে বার করলেন। গোটাতিনেক পান বার করে আলতোভাবে ফেলে দিলেন মুখে। এক চুটকি দোক্তাও চালান করে দিলেন। একটু বেশিমাত্রায় পান তিনি খেয়ে থাকেন। মন্থরভাবে কিছুক্ষণ চবণসুখ উপভোগ করার পর পিক ফেললেন ঘাসজমির উপর।

বললেন, তা সময় সময় একটু কাজ-কর্ম করতে হবে বইকি। ব্যাপারটা হল কাজের মধ্যে যত জড়িয়ে থাকবেন, শরীর তত বেশি তাজা থাকবে। ও থা যাক। আসুন না সন্ধ্যাবেলায় আমার ওখানে আপনারা। বেশ জমিয়ে গপগুজব করা যাবে।

নীলেশ বলল, যাব। অশোককে জিজ্ঞেস করুন যাবে কিনা। কুম্ভকর্ণের ঙ্গে এমন চরিত্রগত মিল বড় একটা দেখা যায় না।

অশোক বলল, তুমি বলতে চাও আমি সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ি ? মাটেই না। ঠিক পেঁছাব দেখবেন।

যাহোক, অশোককে ডেকে নিয়ে নীলেশ রওনা হল মনোতোষবাবুর বাসার উদ্দেশে। দুজনের হাতে টর্চ। ও'র বাসা অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়। ব্যবধান বড়জোর হাজারখানেক গজ হবে।

নীলেশ বলল, এদিকে বেশ ঝামেলা হয়ে গেছে। সব মাল আজ বোঝাই করা গেল না।

—কেন ? ওপেন ওয়াগান এসে পেঁছায়নি নাকি ?

—চারটে ওয়াগান এসেছে। অথচ মাল আছে ছ'টা ওয়াগানের মত।

—স্টেশনমাস্টার কি বললেন ?

নীলেশ হেসে ফেলল।

—বড় মজার কথা বললেন। বললেন, আপনাদের ওয়াগানের খাঁই মেটাতে মেটাতে মশাই মারা পড়লাম।

মাল পাঠানোর ব্যাপারে সময় সময় ওদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রয়োজনমত ওপেন ওয়াগান পাওয়া দুষ্কর। অথচ কলকাতা থেকে তাগাদার পর তাগাদা আসতে থাকে। নীলেশ আজ স্টেশনে মাল বুক করতে গিয়ে যথানিয়মে অসুবিধায় পড়েছিল।

আস্তানায় পেঁছিবার পর মনোতোষবাবুকে পাওয়া গেল না। দেখা হল প্রেমস্বরূপ গুপ্তার সঙ্গে। ভদ্রলোক স্থানীয় অধিবাসী। জমিজমার মালিক ; অর্থাৎ স্বচ্ছল অবস্থার অধিকারী। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই। একটু নেয়াপাতিগোছের চেহারা। ওদের সঙ্গে ভালই আলাপ ছিল প্রেমস্বরূপের।

অশোক প্রশ্ন করল, গাঙ্গুলীবাবু কোথায় ?

—এখনও ফেরেননি।

—আমাদের আসতে বলে নিজেই গায়েব ?

মৃদু হেসে বললেন প্রেমস্বরূপ, জানেন, তিনি আমাকেও তো ডেকেছিলেন। আসুন, ভেতরে বসা যাক। এখুনি এসে পড়বেন উনি।

সকলে ভিতরে গিয়ে বসল।

উদয় ঘরেই ছিল।

চাকরকে তিন কাপ চা আনার নির্দেশ দিল।

উদয়ের বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। চালাক চতুর ছেলে। ব্যবসার ভালমন্দ অনেকটা তারই উপর নির্ভর করে। তাপস চার বছরের ছোট উদয়ের চেয়ে। একটু গোবেচারা ধরনের। অবসর সময়ে তাকে বন্দুক হাতে পাখির উদ্দেশে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চা এল।

গল্প জমে উঠল তিনজনের মধ্যে।

সাড়ে সাতটা বাজল ক্রমে।

নীলেশ বলল, কি ব্যাপার বলুন তো উদয়বাবু ? আপনার মামার আজ এখনও দেখা নেই ?

চিন্তিত গলায় উদয় বলল, আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। এত দেরি হবার তো কথা নয়। প্রত্যহ পাহাড়ের ধার থেকে পাঁচটার মধ্যেই চলে আসেন।

—আজও ওই সময় ফিরবেন—প্রেমস্বরূপ বললেন, সকালে তো এই কথাই বলেছিলেন আমায়।

আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

আটটা বাজল।

এখনও দেখা নেই মনোতোষবাবুর।

দুশ্চিন্তা ক্রমেই চাপ বেঁধে বসছে মনের মধ্যে। শহর হলে অবশ্য চিন্তার কোন কারণ ছিল না। শিকারপুরের মত গ্রাম বলেই কথা। তাছাড়া বিশেষ কয়েকটা কারণও বিদ্যমান রয়েছে। মনোতোষবাবুর চোখের অবস্থা ভাল ছিল না। রাত্রে ভাল দেখতে পান না। পাঁচটার পর বাসার বাইরে চোখের জন্য তিনি থাকতে পারেন না। তাছাড়া কয়েকজনকে ডেকে নিয়েই অনুপস্থিত থাকবেন, এমন লোক তিনি নন। কাজেই নানা অশুভ চিন্তা মনকে নাড়া দিতে থাকবেই।

আরো কিছুক্ষণ জল্পনা কল্পনা করার পর উদয় তাপসকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে খুঁজতে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। প্রেমস্বরূপ, নীলেশ আর অশোক বিদায় নিল। আসবার আগে অবশ্য বলে এসেছে মনোতোষবাবুর কোন সংবাদ পেলেই যেন তাদের জানানো হয়।

নীলেশের ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়।

তিলকা মাঝি সংক্রান্ত ব্যাপারটা ঘটার পরও বহুক্ষণ ঘুম আসেনি তার। কাজেই উঠতে দেরি হয়ে গেছে। অলকা চা নিয়ে এল। ইতিমধ্যে সে স্নান সেরে নিয়েছে। চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দেবার পরই নীলেশের মনে পড়ল মনোতোষবাবুর কথা। না বলে কয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ গেলেন কোথায়?

অলকা চা-এর কাপ হাতে নিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, একবার মনোতোষবাবুর বাসায় যেতে হবে।

—সত্যি, বুড়ো মানুষটা গেল কোথায়?

কাল ফিরে এসেই সমস্ত কথা বলেছিল স্ত্রীকে।

—পাকুড়ে যদি না গিয়ে থাকেন, তবে সত্যি চিন্তার কথা হবে।

—ওখানে যাবেন কিভাবে? সন্ধ্যার দিকে পাকুড়ে যাবার তো কোন ট্রেনই নেই।

—তাও তো বটে। তার মানে তিনি গ্রামেই কোথাও আছেন। এতক্ষণ হয়ত ফিরে এসে থাকবেন—কি বল?

অশোক এল।

এসেই তাড়া দিল, যাবে না একবার ওখানে? ভদ্রলোক ফিরলেন কিনা দেখা দরকার তো?

—নিশ্চয়! তুমি একটু বস। আমি তৈরি হয়ে আসছি।

কয়েক মিনিট পরে দুজনে রওনা হল। প্রেমস্বরূপ আগেই মনোতোষবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল এখনও গৃহকর্তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উদয় আর তাপসের সঙ্গে দেখা হল

—দুই ভাই একরাতেই ভয়ে ভাবনায় একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

জানা গেল, স্টেশন থেকে পাকুড়ে ফোন করা হয়েছিল। পাকুর স্টেশনের কাছেই মনোতোষবাবুর বাড়ি। জানা গেছে তিনি যাননি সেখানে। যেখানে যেখানে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব, সব জায়গায় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে; ফল কিছুই হয়নি।

নীলেশ বলল, এবার পুলিশে খবর দেওয়াই বোধহয় ভাল।

—এখনই পুলিশের হাঙ্গামা করবেন না। প্রেমস্বরূপ বললেন, আর একবার ভালভাবে তাঁকে খুঁজে দেখি। একান্ত যদি সন্ধান পাওয়া না যায় তখন না হয়—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই অশোক বলল, মন্দ প্রস্তাব নয়। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

—মনোতোষবাবু নিজের কার্যক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেননি—নীলেশ বলল, অনুসন্ধান আরম্ভ করতে গেলে ওখান থেকে আরম্ভ করাই ভাল। কি বলেন।

প্রেমস্বরূপ সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন।

আর সময় নষ্ট করা হল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে পেঁছাল মনোতোষবাবুর কাজের জায়গায়। চারিধারে অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ানো রয়েছে। একধারে কয়েক হাজার গজ জায়গা জুড়ে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো অসংখ্য পাথরের স্তূপ। এই সমস্ত পাথরের টুকরোই ওয়াগান বা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠানো হয়।

শীত যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এখানে এই সময় পেঁছালেই বুঝতে পারা যায়। কনকনে হাওয়া সকলের শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে। কুলি, মেশিনম্যান বা ডিনামাইট চার্জাররা এখনও এসে উপস্থিত হয়নি। তারা আসবে ন'টার সময়। তখন কাজ আরম্ভ হয় প্রতিদিন।

পাথরের স্তূপ যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সামান্য এধারে বাঁশের ছাউনি দেওয়া খড়ের একটা ঘর। দুপুরের অধিকাংশ সময় এই ঘরে বসেই কাটাত মনোতোষবাবু। অস্থায়ী অফিস আর কি। এখন ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

তাপস বিস্মিত গলায় বলল, দাদার ঘরের দরজা তো এভাবে খোলা থাকার কথা নয়।

উদয়ও কম অবাক হয়নি।

এই ঘরের দরজা মোটেই এইভাবে খোলা থাকার কথা নয়। কারণ গাঁইতি ইত্যাদি লোহার কিছু হাল্কা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বহু টুকিটাকি জিনিস থাকার দরুণ প্রতিদিন বাসায় ফেরার আগে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে যেতেন মনোতোষবাবু। এই কাজে তাঁকে কখনও অবহেলা করতে দেখা যায়নি। তবে আজ—

সকলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

সমস্ত কিছু যথাযথ রয়েছে বলেই মনে হল উদয় আর তাপসের। এমনকি, তক্তপোষের উপর ক্যাশবাক্সটি পর্যন্ত। যদিও ক্যাশবাক্সে এক নয়া পয়সাও থাকে না রাত্রে। তবে কিছুটা আগোছাল মনে হচ্ছে চারিধার।

—দাদা, একটা পেপার ওয়েট নেই মনে হচ্ছে।

—পেপার ওয়েট!

তাপসের কথা শুনে উদয় ঝুঁকে পড়ল ক্যাশবাক্সর পাশের দিকে। সেখানে লেখার সরঞ্জামের সঙ্গে একটা পেপারওয়েট রয়েছে। তবে থাকবার কথা দুটো। একটা গেল কোথায়। উদয় তক্তপোষের তলায় উঁকি মেরে দেখল একবার।

—কি হল?

—একটা পেপারওয়েট কোথায় গেল বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রেমস্বরূপ বললেন, গোটা একটা মানুষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, আর আপনি পেপার ওয়েটের কথা ভাবছেন!

সকলে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। মনোতোষবাবু কোথায় গেছেন তার কোন সূত্র যদি কারুর চোখে পড়ে যায়। হঠাৎ নীলেশের দৃষ্টি পড়ল একটা শালগাছের নিচেকার ঘাস জমির উপর। দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে।

রক্ত! কেউ রক্তের ছড়া দিয়ে কয়েক হাত এগিয়েছে।

—আপনারা এদিকে আসুন।

সকলে দ্রুত এগিয়ে এসে, নীলেশের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তাজা রক্ত অবশ্য নয়। প্রায় শুকিয়ে এসেছে। হাত দিয়ে ছুঁলে বোধহয় চটচট করবে বুঝতে পারা যায়। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একটা আশঙ্কা সকলের মনেই গুলিয়ে উঠছে।

তবে কি—

শেষে প্রেমস্বরূপ নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

—সমস্ত ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গেল।

—আপনি—আপনি কি বলতে চাইছেন।

উদয়ের গলায় আশঙ্কার প্রকাশ।

—আপনি কি বুঝতে পারেননি?

—মানে···

—মনোতোষবাবু আর বেঁচে নেই। ঘাস জমিটা ভাল করে লক্ষ্য করুন। রক্তের সঙ্গে ভারি কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগও রয়েছে।

নীলেশ দ্রুতগলায় বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন মনোতোষবাবুকে বাঘে নিয়ে গেছে।

—আমি তাই বলতে চাইছি। সত্যি, অত্যন্ত বিশ্রী কাণ্ড হল। তাঁর মত মানুষ এইভাবে প্রাণ দিলেন।

অশোক বলল, আমারও তাই ধারণা। হাতদশেক টেনে নিয়ে যাবার পর তাঁকে মুখে করে জন্তুটা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

এই অনুমান নীলেশকেও সমর্থন করতে হল। কারণ সপ্তাহখানেক ধরে বাঘের উপদ্রব অসম্ভব বেড়ে গেছে এখানে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার জাতীয় অবশ্য নয়—একটু ছোট ধরনের। তবে অসম্ভব চতুর। হিংস্রতায় এদের জুড়ি মেলা ভার। লোকালয়ের খুব ভেতরে অবশ্য এরা আসে না। ছাগল ভেড়া ও ইতিমধ্যে দুজন মানুষ মারা পড়েছে।

উদয় আর তাপস ছোট ছেলের মতই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাদের মামা ছাড়া আর কেউ নেই। কাজ-পাগল মানুষ বাসায় ফিরতে বেশ বিলম্ব করে ফেলেছিলেন নিশ্চয়। কর্মচারিরা সকলেই চলে গিয়েছিল। রক্তলোলুপ জন্তু সহজেই নিজের আকাঙ্খা মিটিয়ে নিতে পেরেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই মর্মন্তুদ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। শিকারপুরের মত ছোট্ট জনপদেও ঢেউ উঠল চাঞ্চল্যের। নীলেশ আর অশোক আজ কাজে গেল না। প্রেমস্বরূপও রয়ে গেলেন। স্টেশনমাস্টার এবং আরো কয়েকজন এলেন মনোতোষবাবুর বাসায়। অনেক সান্ত্বনা দেবার পর দুই ভাগ্নেকে অবশ্য শান্ত করা সম্ভব হয়েছে।

তাপস প্রশ্ন করল, মামার মৃতদেহ পাবার কি সম্ভাবনা নেই।

নীলেশ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আধ-খাওয়া দেহটা অবশ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে ওই বিরাট জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পড়ে আছে তার হদিস করা মোটে সহজ ব্যাপার নয়।

—তাছাড়া—প্রেমস্বরূপ বললেন, সেই মাংসপিণ্ড উদ্ধার করতে যাওয়াই হবে আমাদের দারুণ ঝুঁকির ব্যাপার। বাঘটা কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে কে জানে। শেষে আমরাই কেউ তার শিকার হয়ে যাব।

স্থানীয় একজন পুরোহিত ডেকে মনোতোষবাবুর শ্রাদ্ধ সম্পর্কে বিধান নেওয়া হল। যদিও এই সমস্ত কাজ পাকুড়ে করানো যেত, কিন্তু উদয় আর তাপসের ইচ্ছে, এখানে যখন মামার মৃত্যু হয়েছে তখন শ্রাদ্ধাদি যা হবার এই-খানে হোক। পুরোহিত দেহাতি হলেও বেশ শাস্ত্রজ্ঞ। অপঘাত মৃত্যু হলে যে সমস্ত বিধান শ্রাদ্ধের জন্যে দেওয়া উচিত তিনি তাই দিলেন।

বিকালের দিকে কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি বিপরীতমুখী হয়ে পড়ল। আন্দাজ চারটের সময় এক ভদ্রলোক দেখা দিলেন। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। ডান পা একটু টেনে টেনে চলেন। আগে পুলিশে চাকরি করতেন। পা জখম হয়ে যাবার পর কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন রোড কনট্র্যাক্টারি করেন।

নাম রঘুবীর সহায়।

থাকেন পাকুড়ে। তাঁকে প্রায়ই আসতে হয় শিকারপুরে। মনোতোষবাবুর কাছ থেকে স্টোন চিপস নিচ্ছিলেন—তাঁর হাতে এখন একটা বড় কনট্রাক্ট রয়েছে। তাঁকে নীলেশ কয়েকবার দেখেছে। মৌখিক আলাপও আছে।

তিনি ঘরে ঢুকেই উদয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্টেশনে পা দিয়েই বিশ্রী একটা সংবাদ পেলাম, কথাটা কি সত্যি?

উদয় থেমে থেমে বলল, ঠিকই শুনেছেন। মামা নেই।

—খুবই দুঃখের বিষয়। মনোতোষবাবু যে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবেন কল্পনাই করতে পারিনি।

তাপস বলল, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে এলে এত দুঃখের কারণ হত না।

—আপনারা কি স্থির নিশ্চিত যে তাঁর মৃত্যু বাঘের হাতে হয়েছে?

—নিশ্চিত না হয়ে আর উপায় কি বলুন?

রঘুবীর সহায় ভুরু-কুঁচকে কি যেন ভাবলেন।

বললেন আবার, এখানে আসবার আগে পাহাড়তলীর ওধারটা ঘুরে এলাম। দেখলাম, ওঁর ওখানকার ঘর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা কি?

প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারি যেন জেরার কাজে নেমে পড়েছেন। ঘরে উপস্থিত সকলেই অল্পবিস্তর বিরক্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে। লোকে অবশ্য সহায়কে হামবাগ বলেই জানে।

অসহিষ্ণু গলায় উদয় বলল, আমরাও খোলা অবস্থায় দেখেছি।

—ক্যাশবাক্সর মধ্যে এগার হাজার টাকা পেয়েছিলেন?

এগার হাজার টাকা!

এবার সকলে সচকিত হলেন।

—কই, না তো।

—কাল বিকেলে টাকাটা আমি তাঁকে পেমেণ্ট করেছিলাম।

প্রেমস্বরূপ আর থাকতে পারলেন না। —পেমেণ্ট যে করেছিলেন তার প্রমাণ কি?

সরাসরি আক্রমণ। রঘুবীর সহায় অবশ্য গায়ে মাখলেন না। ধীরে-সুস্থে বললেন, আমার কাছে রসিদ আছে! দেখা যাচ্ছে আমার সন্দেহ অমূলক নয়। আপনারা শুনুন, মনোতোষবাবুকে বাঘে নিয়ে যায়নি। তাঁকে খুন করা হয়েছে।

উচ্চমাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল সকলের শিরায় শিরায়।

তাপস কোনরকমে বলল, মামা খুন হয়েছেন?

—সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। খুনের মোটিভ হল ওই এগার হাজার টাকা। এবার আপনারা কি করবেন আমার জানা দরকার।

উদয় আর তাপস কিছু বলল না।

অগত্যা নীলেশ বলল, আপনি কি করতে বলেন?

—আপনারা পুলিশে খবর না দিলে আমাকেই দিতে হবে। পুরানো বন্ধুর হত্যার তদন্ত হবে না আমি তা কিভাবে মেনে নেব বলুন ?

শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দেওয়াই সাব্যস্ত হল।

ফেরার পথে অশোক বলল, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল।

—হুঁ। আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি ?

—কেমন ? অশোক নীলেশের দিকে তাকাল।

—রঘুবীরবাবু বলছেন, উনি এগার হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে রসিদ নেবার পর তিনিই—তিনিই খুনটা করেছেন ? এবং সেই সঙ্গে টাকাটা নিয়ে সরে পড়েছেন ? সাধু সাজছেন এখন ?

—আমিও তাই বলতে চাইছিলাম। কাগজে-কলমে বিল পেমেণ্ট হয়ে গেল, অথচ ঘরের টাকা রয়ে গেল ঘরেই।

—বিচিত্র কিছুই নয়, তবে—ওই দেখ, তিলকা মাঝি আবার উপস্থিত হয়েছে !

নীলেশ দেখল, সত্যি তিলকা মাঝি ওদের জোড়া বাংলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছে। বড় সাইজের একটা বিড়ি ঝুলছে ঠোঁটের আগায়। কিন্তু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। বোধহয় ধরানো নেই।

কাছাকাছি পেঁছাবার পর অশোক প্রশ্ন করল, তুমি এখানে কি করছ ?

—ঘুরে বেড়াচ্ছি হুজুর।

—এখানে ঘুরে না বেড়িয়ে কাজে যাও।

দুজনকে এক নজর দেখে নিয়ে মাঝি বলল, আজ যে কাজ বন্ধ হুজুর ! বুড়ো গাঙ্গুলীবাবু খুন হয়ে গেছে না।

তার কথা শুনে নীলেশ আর অশোক অবাক হয়ে গেল। মনোতোষবাবুকে বাঘে নিয়ে গেছে একথাই প্রচারিত হয়েছে। তার খুনের কথা মাত্র কিছুক্ষণ আগে জানা গেছে। বাইরের কারুর কানে এখনও ওই তথ্য যাবার কথা নয়। তিলকা জানল কিভাবে ?

নীলেশ বলল, কি আজে-বাজে বকছ। গাঙ্গুলীবাবুকে তো বাঘে মেরে ফেলেছে।

—ও-সমস্ত কথায় কান দেবেন না হুজুর। বিকেলবেলা কি বাঘ বেরোয় ? বাঘ নয়, মানুষই মেরেছে গাঙ্গুলীবাবুকে।

কথা শেষ করেই তিলকা দৌড় মারল। বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল তার হাল্কা চেহারা। দুজনে অবাক হয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল সেইদিকে। ব্যাপারটা কি ? তিলকা মাঝি সত্যি পাগল হয়ে গেছে, না কোন অভিসন্ধি কাজে লাগাবার জন্যে ইচ্ছে করে ওইরকম হাবভাব করছে ?

•

খুনের তদন্ত করতে থানা ইনচার্জ মদনলাল দলবল নিয়ে বেলা একটার

সময় পাকুড় থেকে শিকারপুরে উপস্থিত হলেন। মনোতোষবাবুর বাসায় পা দেবার পর, সেখানে রঘুবীর সহায়কে দেখেই তাঁর মন খিঁচড়ে গেল। কোন্ কালে ইনি পুলিশে চাকরি করতেন—অথচ সেই মেজাজ এখনও রেখেছেন। যখন-তখন থানায় পেঁছে নানারকম বোলচাল ঝাড়েন। যাহোক, ব্যাপারটা শুনলেন তিনি। এবং প্রথমে জেরা আরম্ভ করলেন রঘুবীর সহায়কেই।

—আপনি ঠিক ক'টার সময় গিয়েছিলেন মনোতোষবাবুর কাছে ?

—বেলা তখন তিনটে হবে। এগার হাজার টাকা বাকি ছিল। টাকাটা দিতেই তিনি আমাকে রসিদ দেন। এরপর দুজনের মধ্যে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়। আমাকে বলেন আজকাল চোখে কম দেখছেন। আর মাসখানেক পরে কলকাতায় গিয়ে অপারেশন করিয়ে আসবেন। আজকাল দিনের আলো থাকতে থাকতেই পাঁচটা বাজার আগেই বাসায় ফিরে যান।

—আপনি ওখান থেকে উঠলেন কখন ?

—আন্দাজ চারটের সময়।

—তখন মনোতোষবাবুর কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন ?

—না। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন।

—তিনি যে খুন হয়েছেন তা আপনিই প্রথম আঁচ করেন, তাই না ?

রঘুবীর সহায় ভারিক্কিচালে বললেন, এই সহজ ব্যাপারটা এঁদের অনেক আগেই আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল। বাঘ মনোতোষবাবুকে নিয়ে যেতে পারে—ক্যাশ-ব্যাক্স খুলে এগার হাজার টাকাও নিয়ে যাবে ? আপনিই বলুন, টাকার প্রতি জন্তুদের কোন মোহ আছে কি ?

—তা বটে। মৃতদেহ কোথায় পাওয়া যাবে বলে আপনার মনে হয় ?

—বলা শক্ত। খুঁজে বার করবার দায়িত্ব তো আপনাদের। আদা-জল খেয়ে এবার লেগে পড়ুন।

তীক্ষ্ন চোখে রঘুবীর সহায়কে একবার দেখে নিয়ে মদনলাল বললেন, আপনার সঙ্গে পরে আবার কথা হবে। দয়া করে ভাগ্নেদের মধ্যে একজনকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

একটা আলাদা ঘরে সপার্ষদ বসেছেন মদনলাল। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে নেবেন আগে। তারপর যাবেন স্পট এনকোয়ারিতে। সহায় চলে যাবার মিনিটখানেক পরেই উদয় এল। পরিচয়-পর্বটা অবশ্য আগেই হয়ে গিয়েছিল।

—আপনার সঙ্গে আপনার মামার শেষ দেখা হয়েছিল কখন ?

—আড়াইটের সময়।

—তারপর আপনি কোথায় গেলেন ?

—কয়েক ট্রাক মাল পাঠাবার ছিল। ওই কাজেই আমি ব্যস্ত ছিলাম।

—কাজ শেষ করার পরও তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি ?

—কোন প্রয়োজন পড়েনি।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?

—না। মামা ছিলেন অজাতশত্রু। পরিচিতরা সকলেই তাঁকে পছন্দ করত। সন্দেহ করার মত কাউকে তো দেখছি না। তাছাড়া—

—বলুন ?

একটু ইতস্তঃ করে উদয় বলল, আমি বলছি বলেই যে ব্যাপারটা সত্যি হবে তা নয়। তবে—

—বেশ তো বলুন ?

—এমনও তো হতে পারে, মামাকে বাঘেই নিয়ে গেছে। তারপর কেউ ওখানে গিয়ে পড়েছিল। টাকাটা সে-ই সরিয়েছে।

—আপনার ওরকম ধারণা হবার কারণ কি ?

—মানুষে তাঁকে মারলে মৃতদেহ লোপাট হয়ে যাবে কেন বলুন ? মরা মানুষকে বয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়।

—একদিক থেকে অবশ্য আপনি ঠিকই বলছেন। মৃতদেহ খুঁজে বার করা খুবই দরকার। ঠিক আছে। এবার আপনি যেতে পারেন। ছোট ভাইকে গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু।

তাপস ঘরে আসবার আগেই একজন কনেস্টবল এসে স্যালুট জানাল। একটা শ্লিপ এগিয়ে ধরল। শ্লিপের ক'টা লাইন মদনলালকে হতবাক করে দিল। ডিভিশনাল কমিশনার শারানসাহেব এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। স্টেশনের কাছে অপেক্ষা করছেন তিনি।

ব্যাপারটা কি ? চারটি জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা শিকারপুরের মত ছোট জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন কেন ? মদনলাল বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মত একজন সাধারণ কর্মচারির পক্ষে অমন জাঁদরেল অফিসারদের মুখোমুখি হওয়া ভীতিপ্রদ বৈকি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন।

ওদিকে—

দুজন আর্দালি ইতিমধ্যে গাছতলায় জুটের কার্পেটটা পেতে ফেলেছে। টিফিন কেরিয়ার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি জিপ থেকে নামানো হয়েছে। গোটাছয়েক মরা পাখি একধারে স্তূপ হয়ে রয়েছে। দুটো পায়রা আর চারটে স্নাইপ।

জিপ থেকে শারানসাহেব নামলেন। বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী হলেও বয়স সে অনুপাতে বেশি নয়। বয়স প'য়তাল্লিশ অতিক্রম করেনি। শক্ত কাঠামোর দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। জমকালো গোঁফ তাঁকে আরো জাঁদরেল করে তুলেছে। উইঞ্চেস্টার রাইফেলটা জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে কার্পেটের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসলেন।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব নামল জিপ থেকে।

এখানে তার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। এমনকি, সেও ঘণ্টাসাতেক

আগে জানত না, তাকে সাঁওতাল পরগনার এই গণ্ডগ্রামে আসতে হবে। ভাগলপুরে এসেছিল একটা তদন্তে। সাফল্যজনক ভাবে কাজ শেষ করার পর আজই তার কলকাতা ফিরে যাবার কথা। কমিশনার সাহেব মহাখুশী তার কাজে। তিনি আবার শিকার-পাগল মানুষ। ধরে বসলেন বাঘ শিকারে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে। প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। নতুন এক অভিজ্ঞতা হবে। মন্দ কি। ভাগলপুর থেকে জিপেই সরাসরি চলে এসেছে এখানে। একটা রাইফেল আর একটা ডবল ব্যারাল সটগান সঙ্গে আনা হয়েছে।

এখানে পেঁছাবার পরই পাখি শিকার-পর্বটা সেরে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্তই মাংস অবশ্য সংগৃহীত হয়েছে। পাহাড়ের একধারে ঝর্ণা আছে। পাখি মারার উপযুক্ত জায়গা হল ওটাই। ঝর্ণার ধার থেকে ফেরার পথেই স্টেশনে জিপ থামিয়েছিলেন শারানসাহেব। ব্যাপারটা জানতে পারলেন ওখানেই। প্রেমস্বরূপও ছিলেন তখন স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে। বিস্তারিত ভাবে সমস্ত কিছু বললেন তিনি।

—রহস্যের গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে?

শারানসাহেবের কথা শুনে বাসব মৃদু হাসল।

—বাদ দিন।

—বাদ দেব কেন? একে রহস্যের গন্ধ তায় আপনি আবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত। দুই আর দুই-এ কখনও পাঁচ হয়? দাঁড়ান, ডেকে পাঠাই তদন্ত-কারী ইন্সপেক্টারকে।

বাসবের কোন ওজর-আপত্তিই তিনি শুনলেন না। একজনকে শ্লিপ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মদনলালের কাছে। তারপর স্টেশনের কাছে, এই গাছতলায় আড্ডা গাড়ার মনস্থ করলেন। বিগ গেমের সন্ধানে এখান থেকেই সন্ধ্যার পর রওনা হবেন।

একটা কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে মদনলাল যখন পেঁছালেন তখন আর্দালিরা দুটো স্থরয়ার কেটে ফেলেছে। মহাবিব্রত মদনলাল ঘটনার বিবরণ দিলেন কোনরকমে। যতটা এজাহার নেওয়া হয়েছিল তাও পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

—কিরকম বুঝছেন মশাই?

—দুর্ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছু বলা মুশকিল। মৃতদেহ খুঁজে বার করা আগে দরকার। তারপর ধরুন যাদের এজাহার বাকি আছে, তাদের ডেকে পাঠিয়ে কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

বাসবের কথা শুনে শারানসাহেব বললেন, তাহলে তো উঠে পড়তে হচ্ছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। আলো থাকতে থাকতেই কাজ সেরে নেওয়া ভাল।

তারপর মদনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি আমার বন্ধু। অপরাধ

বিজ্ঞানের একজন মহারথী। এই ব্যাপারটা ইনি একটু নেড়ে চেড়ে দেখবেন। আপত্তি নেই তো ?

—না, স্যার। এতে আপত্তির আর কি থাকতে পারে। একদিক দিয়ে তো ভালই হল।

সামান্য জলযোগের পর শারানসাহেব বাসব ও মদনলালকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়তলীর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু মাঝপথেই থামতে হল। ইতিমধ্যে প্রেমস্বরূপের মাধ্যমে বাসবের কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল। জোড়া বাংলোর সামনে প্রেমস্বরূপ, নীলেশ আর অশোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

মদনলাল বললেন এঁরা তিনজন মনোতোষবাবুর ঘনিষ্ট পরিচিতদের মধ্যে। এঁদের জেরা বাকি আছে।

বাসব বলল, এখানেই তাহলে থামা যাক। এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিই। ইন্সপেক্টার, মনোতোষবাবুর ছোট ভাগ্নের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি, বলছিলেন না ? তাঁকে এখানে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

শারান বললেন, পাহাড়তলীর দিকে—

—ওটা আজ মুলতুবি থাক। ঘুরে ফিরে দেখার খুব বেশী সময় পাব না। তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর নীলেশ সকলকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। অলকাও দেখা দিয়ে গেল। চা-এর জল চড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারপর। মদনলাল নিজেই গেছেন তাপসকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্য।

বাসব বলল, এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনাদের সকলের সঙ্গে মনোতোষবাবুর ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথা হয়ত আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারি। নীলেশবাবু আপনাকে দিয়েই আমি আরম্ভ করতে চাই।

—বেশ তো।

—এখানে নয় ; আসুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

—আপনি এবার গুছিয়ে ব্যাপারটা আমায় বলুন ? খুঁটিনাটি কিছু বাদ না দিলেই খুশি হব।

নীলেশ বলে গেল একে একে সমস্ত কথা। এমনকি তিলকা মাঝির কাণ্ডকারখানার বর্ণনাও বাদ দিল না। বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনে গেল এক মনে।

—আপনি কি সন্দেহ করছেন তিলকা মাঝির বেখাপ্পা ব্যবহারের সঙ্গে ওই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে ?

—বলতে পাচ্ছি না। তবে সমস্ত ব্যবহারটাই অদ্ভুত।

—আপনার সন্দেহ হয় কাউকে ?

—ভাগ্নে দুজনকে বেশি সন্দেহ হয়।

—কিন্তু ওঁরা এত রিস্ক নিতে যাবেন কেন ? মনোতোষবাবুর নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। তিনি যেদিনই মারা যান উত্তরাধিকারি ওঁরা ছাড়া তো আর কেউ হত না।

—তা অবশ্য।

—তবে খুন করার আরো কারণ থাকতে পারে। রঘুবীর সহায়কে আপনার কেমন মনে হয় ?

—কেমন সবজান্তা ভাব। আমার কেন জানি না ভাল লাগে না।

—আর বিরক্ত করব না। আচ্ছা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

—নিশ্চয় পারেন।

গলা তুলে নীলেশ বলল, অলকা, এখানে এস একবার। তোমাকে মিঃ ব্যানার্জী কি বলবেন।

অলকা আসতেই নীলেশ পাশের ঘরে চলে গেল। তাপসকে সঙ্গে নিয়ে মদনলাল ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। চা পরিবেশিত হয়েছে। অলকার সঙ্গে বাসব মিনিট পাঁচেকের বেশি কথা বলেনি। তারপর ডেকেছে অশোককে। অশোকের পর প্রেমস্বরূপ এবং সবশেষে তাপসকে ডেকে কথাবার্তা বলেছে।

বাসব এ ঘরে আসতেই শারানসাহেব নিজের পুরানো প্রশ্নই আবার করলেন এবার কি রকম বুঝলেন বলুন ?

—সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি। পরে আপনাকে সব বলব। শুনুন, এখন আমি একটু বেরুচ্ছি।

—বেরুচ্ছি মানে—

—যাব এক জায়গায়। শিকারের ব্যাপারটা রাতের জন্য তোলা থাক। আপনি বরং পাখির মাংসটা এখানে আনিয়ে নিন। সকলে মিলে খাওয়া যাবে।

—আপনি বলতে চাইছেন আজকের রাতটা এঁদেরই আমরা উত্যক্ত করব।

অশোক তাড়াতাড়ি বলল, আমরা মোটেই উত্যক্ত হব না। তাছাড়া এখানে তো কোন হোটেল নেই। রাতটা আপনারা এখানে কাটালে আমরা খুশিই হব।

বাসব বাইরে বেরিয়ে এল। আসবার সময় প্রেমস্বরূপকে ইসারা করেছিল। তিনিও বেরিয়ে এলেন।

—তিলকা কোথায় থাকে জানেন ?

—সে কে ?—তারপর মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে বললেন, ও সেই পাগলাটা ? না, সে কোথায় থাকে বলতে পারব না।

ঠিক আছে। আমি নিজেই দেখছি কতদূর কি করা যায়। আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন।

বাসব অনির্দিষ্টভাবে এগুলো।

কিছুদূর এগুবার পর হাটের মত একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। ছোট মাছ আর তরকারির বেসাতি চলেছে। ক্রেতা অধিকাংশই আদিবাসী।

বাসব কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলল। অর্থাৎ খোঁজখবর নিল, তিলকা মাঝি কোথায় থাকে ; তার সন্ধান কারুর জানা আছে কিনা।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একজনকে।

তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিতেই সে বাসবকে সঙ্গে নিয়ে এগুলো। মিনিটদশেক চলার পর তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাল যাকে লোকালয় বলা চলে না। ঘন গাছপালায় ভরা চারিধার। একটু দূরে গুটিকয়েক কুঁড়ে।

একটা কুঁড়ে দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বিদায় নিল। জরাজীর্ণ অবস্থা। ডালপালা দিয়ে ছাওয়া এই কুঁড়ে যে এখনও কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাই ভেবে অবাক হতে হয়। বাসব তিলকা মাঝির নাম ধরে ডাকল বারকয়েক। সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু ছিল না। বাসব একটু ইতস্ততঃ করে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দেশী মদের গন্ধে ওর শরীর গুলিয়ে উঠল। বাইরে তখন ঘোর হয়ে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই ভেতরে বিরাজ করছে হাল্কা অন্ধকার। কিছু ঠাহর করতে না পেরে বাসব দেশলাই জ্বালল। কাঁপা আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল, কাত হয়ে পড়ে থাকা ছোট সাইজের একটা মাটির হাঁড়ি আর গেলাসের উপর। গন্ধটা হাঁড়ির মুখ থেকেই বেরিয়ে আসছে বুঝতে পারা যায়।

আবার একটা কাঠি জ্বালতে হল।

ঘুরে দাঁড়াতেই বাসব স্তব্ধ হয়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা লোক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। ঘাড়ে ও পিঠে কয়েকটা আঘাতের চিহ্ন। তার মধ্যে একটা আবার বেশ বড় আকারের এবং গভীর। অন্ততঃ ঘণ্টাতিনেক আগে যে এই ব্যাপার ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা তিলকা মাঝি ছাড়া আর কে হতে পারে ?

আরো কয়েকটা কাঠি জেবলে বাসব চারিধার পর্যবেক্ষণ করল। মৃতদেহ অবশ্য ছুঁলো না। তারপর বেরিয়ে এল কুঁড়ের মধ্যে থেকে মহা-চিন্তিত ভাবে। বাইরে তখন দিনের আলো শেষ হয়ে গেছে।

ভোর হওয়ার পরই বাসব শারানসাহেব আর মদনলালকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়তলী অর্থাৎ মনোতোষবাবুর কাজ-কারবার যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। তাঁর মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা এই চেষ্টাই তাকে এখন করতে হবে।

তিলকা মাঝি খুন হওয়ার পর ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে সকলের চোখে। আজ কোন সময় তার দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য ভাগলপুর রওনা হয়ে যাবে। এটা অবশ্য নিয়মরক্ষা। কারণ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেছে, নেশায় চুরচুরে মাঝিকে ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে বাকি সকলে—নীলেশ, অশোক, প্রেমস্বরূপ,

উদয়, তাপস এবং রঘুবীর সহায় উপস্থিত হয়েছেন পাহাড়তলীতে। বাসব জায়গাটা ভালভাবে পরীক্ষা করল। ঘাসের উপর এখনও রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। রং শুধু লালের বদলে কালো।

শারানসাহেব মদনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার লোক মৃতদেহ খোঁজাখুঁজির কাজ চালিয়েছিল তো?

দ্রুতগলায় মদনলাল বললেন, আমি গতকাল দুপুরেই অনুসন্ধানের কাজে লোক লাগিয়েছিলাম। জঙ্গলে কিছু পাওয়া যায়নি। অবশ্য জন্তুরা তাঁর দেহ উদরস্থ করে থাকতে পারে।

ভূমিকা ছাড়াই বাসব এইসময় বলে উঠল, আপনারা শুনলে খুশি হবেন হত্যাকারীকে আমি বুঝতে পেরেছি। এবং সে এখন আমাদের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু তার মুখোস খুলে দেবার আগে মনোতোষবাবুর মৃতদেহের সন্ধান করা দরকার। জঙ্গলে যে দেহ পাওয়া যাবে না তা আমি জানতাম। শুনেছি তিনি দোহরা গড়নের মানুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁর দেহ হত্যাকারীর পক্ষে গভীর জঙ্গলে বয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। কাজেই আমাদের ভেবে নিতে হবে, হত্যাকারী মৃতদেহ খুব বেশি দূর বয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। কাছাকাছিই কোথাও আছে।

প্রেমস্বরূপ বললেন, কাছাকাছি থাকলে আমাদের চোখে পড়ত না?

—কেন চোখে পড়ছে না সে সম্পর্কেও আমি কিছু ভেবেছি। রক্তের দাগ কিছুদূর যাবার পর আর নেই। এই দাগ দেখে আপনাদের ধারণা হয়েছিল, বাঘ মনোতোষবাবুকে কিছুদূর টেনে নিয়ে যাবার পর মুখে করে সরে পড়েছে। হত্যাকারীও জানত সকলে এইরকমই ভাববে। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। আসুন, রক্তের দাগের শেষপ্রান্তে গিয়ে আমরা দাঁড়াই।

বাসব এগুলো। সকলে অনুসরণ করল তাকে। দাগ যেখানে শেষ হয়েছে তার একদিক থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে, অন্যধারে সারি সারি স্টোন চিপসের স্ট্যাগ—। মৃতদেহের চিহ্নমাত্র নেই।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

বাসব আবার বলল, মিঃ শারান, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি।

—পেরেছি বোধহয়। স্ট্যাগগুলোর কোনটার মধ্যে মৃতদেহ আছে এই কথাই বলতে চাইছেন তো?

—আমার তো তাই ধারণা।

—কিন্তু এতগুলো স্ট্যাগের মধ্যে কোনটাতে সেটা আছে কিভাবে বোঝা যাবে?

—পর পর আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।

বলাবাহুল্য কয়েকজন কনেস্টবল ধারে-কাছেই ছিল। মদনলাল তাদের

কাজে লাগিয়ে দিলেন। বেশি পরিশ্রম করতে হল না। প্রথম স্ট্যাগের মধ্যেই পাওয়া গেল মনোতোষবাবুকে। পাথরকুচির তলায় চাপা থাকলেও ফুলে ঢোল হয়ে গেছে দেহটা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে শারান তাকালেন বাসবের দিকে। ততক্ষণে পচা মড়ার উপরই আছড়ে পড়েছে উদয় আর তাপস। দুজনকে কোনরকমে সরিয়ে আনা হল। অনেক বুঝিয়ে শান্ত করা হল তাদের। মৃতদেহ ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হল। সকলে এসে বসলেন মনোতোষবাবুর অস্থায়ী অফিসঘরে। সকলের দৃষ্টি বাসবের মুখের উপর। সমস্ত ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল শুনতে চাওয়ার আগ্রহ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাসব সকলের মনের ভাব বুঝেই আরম্ভ করল, প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্য কেউ নেই। তবু আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না কিভাবে এই রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছিল। মনোতোষবাবু বাসায় ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় একজন এসে উপস্থিত হয়। পরিচিত লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকে। সে কোন এক অবসরে একটা পেপার ওয়েট তুলে নেয় হাতে। তারপর সজোরে বসিয়ে দেয় মনোতোষবাবুর মাথায়। তিনি এলিয়ে পড়েন। তখন ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ধারে-কাছেও কেউ নেই। অচেতন দেহে ঘন ঘন অস্ত্রাঘাত করা হয়। তারপর দেহ টেনে নিয়ে রেখে দেওয়া হয় পাথরের স্তূপের ভেতর। হত্যাকারী কোনক্রমে নিশ্চয় জানতে পেরেছিল আজ ক্যাশ বাক্সে মোটা টাকা আছে। অবশ্য এগার হাজার টাকাকে বিরাট অঙ্ক বলা চলে না। তবে হত্যাকারীর হয়ত ওই অঙ্কর কাছাকাছি টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই রক্তে হাত না রাঙিয়ে সে পারেনি।

এবার আসছে তিলকা মাঝির কথা। এই মর্মন্তুদ পরিবেশের সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র। আমি তার খাপছাড়া কথাবার্তা আর অদ্ভুত ব্যবহারের প্রসঙ্গ জানতে পেরেই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা তার পাগলামি নয়, সে হত্যাকারীকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। অর্থাৎ, সে বুঝিয়ে দিতে চাইছে, তুমি ভেবেছ তোমাকে খুন করতে কেউ দেখেনি তা নয়—আমি দেখেছি। আমার মুখ বন্ধ করতে হলে কিছু ছাড়তে হবে।

হত্যাকারী প্রথমে কিন্তু তার মনের ভাব বুঝতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে ধরে ফেলল ব্যাপারটা। মহাচিন্তায় পড়ে গেল সে। এমন একজন সাক্ষী থাকা তো ঠিক নয়। সুতরাং ওকেও শেষ করতে হবে। হত্যাকারীর এই চিন্তা-ভাবনার মাঝেই তিলকা মাঝি এল তার সঙ্গে দেখা করতে। তখন নিশ্চয় কিছু টাকা দিতে হয়েছিল। এরপর তিলকা যখন নিজের কুঁড়েতে মদ খেতে ব্যস্ত, তখন খুনীর পক্ষে কাজ সেরে আসতে অসুবিধা হয়নি। তবুও কিন্তু একটা ফাঁক রয়েই গিয়েছিল, যেখান থেকে উঁকি মারলে তাকে চিনে ফেলা যায়।

বাসব হাসল।

উদয় বলল, আপনি এখনও কিন্তু হত্যাকারীর নাম করেননি।

—নীলেশবাবু অন্তত আন্দাজ পেয়েছেন।

—আমি !

—নীলেশ অবাক হল।

—আমি কিন্তু এখনও—

—ওই যে ফাঁকের কথা বলছিলাম। তার সন্ধান দিয়েছেন আপনার স্ত্রী অলকাদেবী। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমায় জানিয়েছেন, গতকাল দুপুরে আপনারা দুজন মনোতোষবাবুর বাসা থেকে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর, তিনি বেড়ার ফুকো দিয়ে দেখেছেন তিলকা অশোকবাবুর বাংলোতে ঢুকেছে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ঘরে বজ্রপাত হল যেন।

তীক্ষ্ণগলায় নীলেশ বলল, আপনি বলতে চাইছেন অশোক—মানে—

—আমি তাই বলতে চাইছি। ওঁর বাংলো সার্চ করলে, রক্তের ছিটে দেওয়া এক-আধটা জামা-প্যান্ট পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এছাড়া খোয়া যাওয়া পুরো টাকাটাই হয়ত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ঠিক এই সময় একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল।

মদনলাল বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালেন। সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, অসম্ভব দ্রুতগতিতে অশোক জঙ্গলের দিকে ছুটে চলেছে। সমস্ত কিছু যেন চোখের পলকে ঘটল। দুজন কনেস্টবল ছুটল তার পিছু পিছু। মদনলালও অপেক্ষা করলেন না। তখনও কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে নীলেশের মন চাইছে না। মাত্র এগার হাজার টাকার জন্য অশোক দু-দুটো খুন করে ফেলল!

সমস্ত দিন খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু অশোককে পাওয়া গেল না। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোথাও সে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পেরেছে। একদিক থেকে অবশ্য ব্যাপার কিছুটা সরল হয়েছে। অশোক ভয় পেয়ে পালিয়ে না গেলে পুলিশের পক্ষে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা নিশ্চয় কিছুটা কষ্টকর হত।

পরের দিন অবশ্য অশোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

ওর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহটা পড়েছিল পাহাড়েরই একাংশে। সন্দেহের অবশ্য এক্ষেত্রে আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, কোন মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্যই দায়ী।

লালচকের লাল কাণ্ড

দাঁতে পাইপ চেপেই বাসব জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

সুখময় দত্ত দ্রুত এলেন পিছু পিছু। তিনিই স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর চেহারায় অবশ্যই সেরকম কোন পুলিশী বৈশিষ্ট নেই। মনে হয় অন্য কোন কাজ করার জন্যই জন্মেছিলেন, দৈবাৎ দারোগা হয়ে গেছেন। এই ধরনের মানুষের কাছে চাকরি বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সুখময় বাসবের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রকম বুঝছেন ?

—আমি জানলাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। আপনার কি মনে হয় না এই খুনের সঙ্গে জানলাটার গভীর যোগাযোগ থাকা সম্ভব।

—আপনি বলতে চাইছেন, এই জানলা দিয়ে হত্যাকারী এসেছিল।

—আমি জোর দিয়ে এখন কিছুই বলতে চাইছি না। শুধু চিন্তা করে দেখছি এই পথ যে কোন্ সময়ের জন্য বেছে নিয়েছিল।

—অর্থাৎ—

পাইপ নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আমার ক্রমেই ধারণা হচ্ছে, কাজ সেরে এই পথ দিয়ে সে সরে পড়েছে। ঘরে প্রবেশ করেছিল দরজা দিয়েই।

দ্রুত গলায় সুখময় বললেন, কেন ? আপনার এরকম ধারণা হচ্ছে কেন ?

—দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আপনারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছেন। অথচ জানলাটায় ছিটকিনি লাগানো অবস্থায় নেই ভেজানো ছিল। শীতের রাতে কেউ জানলা শুধুমাত্র ভেজিয়ে শোবে না, ছিটকিনি লাগাবেই। নইলে যে কোন মুহূর্তে হাওয়ায় পাল্লা খুলে যাবার সম্ভাবনা। তারপর একটা বিষয় লক্ষণীয় আছে, রামশঙ্করবাবুর মৃতদেহ বিছানায় শায়িত অবস্থায় নেই। তিনি পড়ে আছেন, হ্যারিংটন চেয়ারটার পাশে—কার্পেটের উপর। অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ তাঁকে হত্যা করেনি, তিনি জেগেছিলেন এবং হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হওয়াও স্বাভাবিক। কাজেই মনে হয়—

—কি মনে হচ্ছে আপনার ?

—এখানে ধরে নিতে হবে যে হত্যাকারী রামশঙ্করবাবুর পরিচিত ব্যক্তি। আমার মনে হয়, সে এসে দরজায় নক করেছিল। রামশঙ্করবাবু হ্যারিংটন চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। রাউণ্ড টেবিলের উপরকার ওল্টানো অবস্থায় খোলা বইটা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। দুজনের কথাবার্তা হবার ফাঁকেই বোধহয় হত্যাকারী গুলি চালায়! দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার নিশ্চয় কোন অসুবিধা থাকায়, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে জানলার পথ ব্যবহার করাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করেছে।

বাসব সরে এল জানলার কাছ থেকে।

জমাট হয়ে যাওয়া চাপ চাপ কালচে রক্তের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবেই পড়ে আছেন রামশঙ্কর চৌধুরী। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছেন, এক

নজরেই বুঝতে পারা যায়। বেশ দশাসই চেহারার লোক ছিলেন তিনি। মনে হয় বয়স বছর পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে গেছে।

এই খুনের তদন্তে বাসবের জড়িয়ে পরাটা আকস্মিক। কিছুদিন থেকে শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তাছাড়া একনাগাড়ে কাজ করে ক্লান্ত বোধ করছিল কিছুটা। কাজেই নগর কলকাতাকে ঠেলে রেখে বাইরে কোথাও কয়েকদিন কাটিয়ে আসবার বাসনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছিল মনে। শেষে স্থির করে ফেলল ছোটনাগপুরের লালচকে যাবে।

পাহাড়ে ঘেরা লালচককে ছোটখাট শহর বলা চলে। স্বাস্থ্যকর এই জায়গায় দূরদূরান্তর থেকে লোক জমায়েত হয় শীতের মুখে। বাসব লালচকের খ্যাতি শুনেছিল বাল্যবন্ধু দুলাল সেনের মুখে। ওই ভদ্রলোক ওখানকার ব্লক ডেভলাপমেন্ট অফিসার। ছুটি কাটাতে কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন বাসবের সঙ্গে। তারপর ওর অবস্থা বুঝতে পেরে একরকম ধরে নিয়ে এসেছিলেন এখানে।

ব্লক-ডেভলাপমেণ্ট অফিস শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে। ওখানে বাস করা সুবিধেজনক নয় বিবেচনা করেই দুলাল সেন লোকালয়ে বাসা নিয়েছিলেন। বাঙ্গালী অধ্যুষিত এই ছবির মত জায়গাটা ভাল লেগে গেল বাসবের। বন্ধুপত্নী অবশ্য বাপের বাড়ি গেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বলিরাম চটপটে তো বটেই, রান্নাতেও চমৎকার হাত।

পনের দিনের মেয়াদে বাসব এখানে এসেছিল। লালচকে পেঁছিবার পরের দিনেই দুলাল সেন টুরে বেরুবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। তাঁকে প্রায়ই জিপে চড়ে টুরে যেতে হয়। বিরাট একটা অঞ্চল তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে।

বাসব বলল, তুমি ঘন ঘন টুরে বেরুবে, আমি কি করব? বিরামহীন ভাবে কড়ি কাঠ গুনে যাব নাকি?

—তা কেন, জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখবে। বলিরামের হাতের মুর্গির স্বাদ নেবে, রেডিওতে গান শুনবে। আর—

—আর—

—আর তোমার আপত্তি না থাকলে পাড়ার দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তারা তোমাকে সঙ্গ দেবে।

—মন্দ কি, নতুন জায়গায় এসে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ রাখা ভাল।

—ঠিক আছে। কাল ফিরে এসেই তামার পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

দুলাল সেন টুরে বেরিয়ে গেলেন।

স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে কিন্তু বাসবকে অপেক্ষা করতে হল

না। রাস্তার সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানছিল। বলিরাম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বিনীতভাবে এসে দাঁড়াল।

বাসব কাপটা তার হাত থেকে নিয়ে প্রশ্ন করল, পাশের বাড়িতে কেউ থাকেন নাকি?

ও এসে পর্যন্ত লক্ষ্য করছে লাগোয়া দোতলা বাড়িখানা অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। অথচ পোড়ো বাড়ি নয়। বেশ ঝকঝকে চেহারা। বাগানটিও ইংরাজীতে যাকে বলে, ওয়েল মেণ্টেণ্ড।

বলিরাম বলল, লোক আছে হুজুর। বাড়ির মালিক রামশঙ্করবাবু নিজেই থাকেন।

—একাই থাকেন বুঝি?

—দুজন চাকর ওঁকে দেখাশুনা করে।

রামশঙ্করবাবু বাড়ি থেকে বেরোন না। বুঝি?

—রোজই সকালে বিকেলে বেড়াতে বেরুতেন। বাগানে খুরপি নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। এ বাড়িতেও এসে বসতেন হুজুর। তারপর—

—কি হল তারপর?

বলিরাম কথাবার্তায় বেশ কেতাদুরস্ত।

বলল, কি হল ঠিক বলতে পারব না। মাসখানেক থেকে উনি আর বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন না। দরজা জানলা সবসময় বন্ধ করে রাখেন।

—হুঁ, আচ্ছা, তুমি যাও।

বাসবের রহস্য-প্রিয় মনের মধ্যে কথা ওঠানামা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই কি এরকমটা হচ্ছে, না এর জন্য কোন গূঢ় কারণ আছে? চায়ের কাপ শেষ করে কিন্তু ও নিজের মনেই হেসে উঠল। এখানে বেড়াতে এসেছে—অহেতুক খুঁচিয়ে নিজের মনে রহস্যের আমেজ সৃষ্টি করার কোন মানে হয় না।

ঘণ্টাখানেক আরো কেটে গেল রাস্তার নানা পোশাকের মানুষ দেখতে দেখতেই। পাইপ মাজতে মাজতে বাসব ভাবছিল এবার ভেতরে গিয়ে বইপত্র ঘাটাঘাটি করবে। ঠিক এই সময় দুজন সুবেশ ভদ্রলোক বারান্দায় উঠে এলেন।

চওড়া সেলের ফ্রেমের চশমা পরা দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি প্রথমে কথা বললেন, নমস্কার। আমি সোমেন রক্ষিত। এখানকার একজন চিকিৎসক। সেন যাবার সময় আপনার কথা বলে গেল। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এই ছোট জায়গায় বেড়াতে এসেছেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, বেড়াবার জায়গাটা কিন্তু চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে। একি, দাঁড়িয়ে কেন? আপনারা বসুন।

বসতে বসতে ডাঃ রক্ষিত বললেন, পাশের বাড়িতে রুগী দেখতে যাবার কথা ছিল, ভাবলাম এই ফাঁকে আপনার সঙ্গে আলাপটা সেরেনি। পরে এক

সময় এসে জমিয়ে গল্প করা যাবে।

—এসে ভালই করেছেন, বড্ড একা পড়ে গেছি। এ'র পরিচয় কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি।

—দেখুন তো ব্যাপারখানা, একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। ইনি আমাদের বিশিষ্ট প্রতিবেশী পরিমল ভদ্র। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আমার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। ও'কেও টেনে নিয়ে এলাম আপনার কাছে।

পরিমল ভদ্রও বেশ আলাপী লোক। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাসবের কীর্তি-কলাপ সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। এখানকার সদর বাজারে ও'র চালু একটা রেডিওর দোকান আছে। তিনজনের মধ্যে মিনিট পনের ধরে নানা বিষয় নিয়ে গল্প-গুজব হল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার রক্ষিত।

—আমি এবার রুগী দেখতে যাই মিঃ ব্যানার্জী। পরে আসব।

—পাশের বাড়ি যাবেন বলছিলেন? রামশঙ্করবাবু কি···

হ্যাঁ উনিই আমায় পেসেণ্ট। এ একটা ডিউটি রক্ষা বলতে পারেন।

—তার মানে?

সহাস্যে ডাঃ রক্ষিত বললেন, অদ্ভুত নার্ভাস প্রকৃতির লোক। রোগটোগ বিশেষ ওঁর কিছু নেই। তবুও আমাকে প্রতিদিন এ্যাটেণ্ড করতে হয়। এর জন্য ভিজিট দেন। বড়লোকদের এও বোধহয় এক ধরনের খেয়াল।

পরিমল ভদ্রও উঠে দাঁড়ালেন।

—আমিও এবার চলি, দোকানের সময় হয়ে এল।

দুজনের বিদায় নেবার পর বাসব স্নানের উদ্দেশে রওনা দিল।

দু'দিন কেটে গেছে।

দুলাল সেন টুর থেকে ফিরে এসেছেন। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বাসবের। সময় নেহাৎ ওর মন্দ কাটছে না। বিকেল উতরে যাবার পর দুই বন্ধু বাজারে গেল টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে। পরিমল ভদ্র দোকানেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল। চমৎকারভাবে সাজানো দোকানটি। একেবারে ঝকঝকে অবস্থা। বাজার ঘেঁষেই ডাঃ রক্ষিতের চেম্বার। কিন্তু তিনি চেম্বারে না থাকায় দেখা হল না।

কেনাকাটা সেরে ওরা বাসায় ফিরে দেখল, অতুলবাবু বসে আছেন। এই পাড়াতেই থাকেন। কয়লার ব্যবসা করেন। বিনয়ের অবতার মার্কা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বাসবের গতকাল পরিচয় হয়েছে।

দুলাল সেন বললেন অতুলবাবুকে—আরো একজন লোককে জোগাড় করুন না মশাই, তাহলে ব্রীজের আসরটা জমানো যায়।

হেঁ হেঁ মার্কা হেসে অতুল কর বললেন, প্রস্তাবটা মন্দ নয় সেনমশাই।

তবে এখন আরেকজনকে কোথা থেকে পাই বলুন ?

—ছকু রায়কে পাওয়া যেতে পারে।

—ছোকরা ব্রীজ ভাল খেলে বটে, কিন্তু তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ আগে সে রামশঙ্করবাবুর বাড়ি গিয়েছে।

বাসব বলল, আচ্ছা, অতুলবাবু বলতে পারেন, রামশঙ্করবাবু কেন নিজের বাড়ির জানলা-দরজা সমস্ত বন্ধ করে বাস করছেন ?

—কি করে বলব বলুন। ওই রগচটা লোকটার সঙ্গে আমি কখনও দহরম মহরম করতে যাইনি।

দুলাল সেন বললেন, ছকু রায়ের সঙ্গে ওঁর বেশ বনিবনা আছে। সে ওই বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া আসা করে।

এই সময় একজনকে গেট পেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

অতুলবাবু বললেন, মেঘ না চাইতেই জল। ছকু আসছে!

ডিগডিগে রোগা ছকু রায়ের বয়স বছর ত্রিশেক হবে। জামাকাপড়ে বেশ পারিপাট্য আছে। সে ঠোঁটের কোণ থেকে সিগারেটের টুকরোটা এগিয়ে এনে, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে দুলাল সেনের দিকে একটা খাম এগিয়ে ধরল।

—রামশঙ্করবাবু পাঠিয়েছেন।

খামখানা হাতে নিয়ে সেন বললেন একি ! বাসব তোমার নাম লেখা রয়েছে দেখছি ! রামশঙ্করবাবু তোমাকে চিঠি দিয়েছেন !

—তাই নাকি ? দেখি—

বাসব খামের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করল। চিঠিখানায় কয়েক লাইনে তিনি নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন। চিঠিখানা নিম্নরূপ—

মান্যবরেষু,

বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। যেতে অসমর্থ। অনুগ্রহ করে এই অপরিচিতের গৃহে পদার্পণ করলে বাধিত হব।

বিনীত

রামশংকর চৌধুরী

—রামশংকরবাবু আমায় ডেকেছেন। ব্যাপার কি বলতো ?

দুলাল সেন বললেন, মনে হয় উনি ডাঃ রক্ষিতের মুখে তোমার কথা শুনে থাকবেন।

—শুনলেই বা। আমি যে শ্রেণীর মানুষ তাতে—আচ্ছা মশাই, আপনি কিছু জানেন ?

ছকু রায়কে উল্লেখ করেই কথাটা বলা হয়েছিল।

সে দ্রুত গলায় বলল, আমি তো কিছু জানি না। আমায় শুধু বললেন, চিঠিটা দিয়ে এস।

অতুল কর বললেন; বুড়ো বোধহয় কোনদিন গোয়েন্দা দেখেনি। আপনাকে কাছ থেকে একটু দেখতে চায় আর কি।

এটা বিদ্রূপ কিনা বোঝা গেল না।

—আমি ঘুরে আসি। উনি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন জানা দরকার।

বাসব কারুর কথার অপেক্ষায় না থেকে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল। রামশংকরবাবুর নিঝুম বাড়িটার সামনে পৌঁছতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। দরজায় কড়া নাড়বার প্রয়োজন ছিল না। একজন চাকর থামে ঠেসান দিয়ে খইনি টিপছিল। বাসব তাকে আগমনের উদ্দেশ্য জানাতেই সে ওকে নিয়ে গেল।

রামশংকরবাবু একটি সুসজ্জিত ঘরে বিমর্ষমুখে সোফায় বসেছিলেন। বয়স হলেও চেহারায় লালিত্য এখনও বর্তমান। বাসবের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারে জীবনের অনেক কুটিল বাঁক অতিক্রম করে এসেছেন। পরিচয় পেতেই অতিথিকে বসতে বললেন। মনে হল, ভাবতেই পারেননি এত তাড়াতাড়ি বাসবের সাক্ষাৎ পাবেন।

—চা আনতে বলি—

—না। তার কোন দরকার নেই। আপনি কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রামশংকর। বারকয়েক পায়চারি করলেন। তারপর আবার এসে বসলেন, মনে হচ্ছে আমি খুন হয়ে যাব।

—খুন হবেন! এরকম একটা ধারণা হবার কারণ আছে নিশ্চয়?

রামশংকরবাবু চুপ করে রইলেন।

—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন? থানায় জানিয়েছেন সে কথা?

—সন্দেহ না করলে আর ভয় ঢুকবে কেন? থানা আমার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। আপনার কথা জানতে পেরেই আশার আলো দেখতে পেয়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান মিঃ ব্যানার্জী।

—আপনাকে আমি কিভাবে ডিফেন্স দেব বুঝতে পারছি না। সত্যি যদি কোন লোক আপনাকে খুন করার মনস্থ করে থাকে, তাহলে সে আজ কি এক মাস পরে—কবে নিজের কাজ শেষ করবে তার কোন স্থিরতা নেই। এক্ষেত্রে আমায় কি করতে বলেন?

—আপনার কি করা উচিত তার নির্দেশ দেবার সাধ্য আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি নিষ্ঠুরভাবে মরতে আমি চাই না।

—আমি আপনার মনোভাব কিছুটা আন্দাজ করতে পাচ্ছি। তবে আমার একটা অবলম্বন চাই যার উপর নির্ভর করে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এগুতে পারি। আপনি সংকোচ না রেখে সমস্ত ঘটনা আমায় বলুন।

রামশংকরবাবু ভ্রূ কুঁচকে রইলেন কিছুক্ষণ। কপালের রেখাগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠল। তারপর বললেন, দিন পনের আগে আমি একটা

চিঠি পেয়েছি। তাতে লেখা ছিল, আমি যেন অবিলম্বে আগ্রায় যাই। পুরানো হিসাবপত্র জট পাকিয়ে রয়েছে, সেগুলি সরল হওয়া দরকার। চিঠি পড়ে বুঝলাম আমার পার্টনার আমাকে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টায় আছে। লোকটা ভাল নয়। সে একবার আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

—লোকটা কে ?

—নরেন নাগ। আগ্রায় আমি হোটেলের ব্যবসা করতাম। নরেন ছিল ম্যানেজার। স্ত্রী মারা যাবার পর ব্যবসায় মন বসাতে পাচ্ছিলাম না। তখন ওকে পার্টনার করে নিয়েছিলাম। ও সমস্ত কাজকর্ম হাতে তুলে নিয়েছিল। প্রতিমাসে নিজের অংশের টাকাটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম। শেষে ওখানেও মন টিকল না—তাছাড়া ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবে-চিন্তে তাই পৈতৃক বাড়িতেই চলে এলাম একদিন।

—খুন করার ষড়যন্ত্রের কথা কি বলছিলেন ?

—নরেন আমাকে পয়জনাস কফি খেতে দিয়েছিল।

—তারপর ?

—মৃত্যু তখন কপালে লেখা ছিল না বলেই বোধহয় আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি কফি সমেত কাপটা পাঠালাম আমার একজন পরিচিত ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার জন্য। জানা গেল ওতে বেশি মাত্রায় ফলিডল মেশানো আছে। নরেন অবশ্য অজ্ঞতা প্রকাশ করল। যে বয় কফি দিয়ে গিয়েছিল তাকে বকাবকিও করল অনেক। সে লোকটা মোটেই স্বীকার করল না যে কাজটা তার।

—আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন ব্যাপারটা ?

—না। গোলমাল বাড়াতে চাইনি।

—তারপর বলুন ?

—এখানে আসার পর দিন বেশ ভালই কাটছিল। প্রতিমাসের প্রথম দিকেই নরেন টাকা পাঠিয়ে দিত। আমি লেখাপড়া করে দিন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ টাকা বন্ধ হয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি দিয়েও নরেনের কাছ থেকে কোন সাড়া পেলাম না। স্থির করলাম একবার আগ্রায় গিয়ে হেস্তনেস্ত করে আসব। ঠিক এই সময়ই ওর জটপাকানো চিঠিখানা পেলাম। আর সেই রাত্রেই একটা লোককে বাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। আবার দিনদুয়েক পরে ওয়াটার পাইপের সাহায্যে সে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল—আমার চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে এল। কিন্তু তাকে ধরা গেল না। তবে—

—বলুন ?

—আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম মিঃ ব্যানার্জী। সে আর কেউ নয়, আমার হোটেলের সেই বয়। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম,

একবার ব্যর্থ হয়ে নরেন শান্ত হয়নি। আবার সচেষ্ট হয়েছে আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে পেয়ে গেছি। এই পরিস্থিতি থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

বাসব পাইপে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বেসরকারিভাবে আপনাকে এখন কি সহযোগিতা দেওয়া যেতে পারে বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে আপনি একটা কাজ করতে পারেন। পুলিশকে সমস্ত কথা খুলে বলুন। যে আপনার ক্ষতি করতে চায় সে অচেনা ব্যক্তি নয়—ওদের কাজের পক্ষে কিছুটা সুবিধাই হবে।

রামশঙ্করবাবু কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন যেন। বললেন, থানায় জানিয়ে কিছু হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সে পথ তো খোলা ছিলই। আমি আগেই তাদের ব্যাপারটা বলতে পারতাম। আপনার উপরই নির্ভর করতে চাই মিঃ ব্যানার্জী। আপনি বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখুন। পারিশ্রমিকের কথা আমার অবশ্যই স্মরণ আছে। আপনার যা ফি—

পারিশ্রমিকই অবশ্য আমার কাজ হাতে নেওয়ার শেষ কথা নয়। যাহোক কি করা যায় তা নিয়ে আমি অবশ্যই চিন্তা করে দেখব। ভাল কথা, আগ্রায় আপনার হোটেলের নাম কি?

—ইণ্টারন্যাশানাল হোম।

—সেই বয়টি এখনও সেখানে কাজ করছে?

—কফি সংক্রান্ত ব্যাপারের পর তাকে সরিয়ে দিয়েছিল।

—নামটা কি?

—মাইকেল। বাঙ্গালী খৃস্টান।

—হুঁ। আপনার নিজের লোক বলতে কে কে আছেন মিঃ চৌধুরী?

—আমার ভাইপো অমিয় ছাড়া আর কেউ নেই। সে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে। আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

—আমি এখন চলি। কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

নৈশ আহারের সময় দুলাল সেন বললেন, রামশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে কি সমস্ত শুনে এলে বললে না তো?

বাসব প্লেটের উপর থেকে মুখ না তুলেই বলল, সকলের সামনে বলতে চাইনি। ভদ্রলোক খুন হয়ে যাবেন এই আশঙ্কা করছেন।

—বল কি? তারপর—?

—আমি এরকম একাধিক কেস পেয়েছি। প্রাণের ভয়ে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্যে, পরে সে খুন হয়ে গেছে।

—তুমি বলতে চাও রামশঙ্করবাবু সত্যি খুন হয়ে যাবেন?

—জোর দিয়ে এখনই কিছু বলতে পারি না। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে—মানে তাঁকে যদি সত্যি খুন করতে চেয়ে থাকে কেউ, তাহলে কারুর সাধ্য হবে না বাঁচাবার। কারণ ব্যাপারটা কখন এবং কবে ঘটবে তার তো কোন স্থিরতা নেই!

—উনি মূলতঃ কি বলতে চাইলেন তা কিন্তু বলছ না।

—প্রাণের আশঙ্কা করেছেন ওটাই হল মূল কথা।

বাসব এবারে সমস্ত বলল।

দুলাল সেন বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার তো। আমার সঙ্গে ভাল আলাপ আছে ভদ্রলোকের। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি এত কিছু তিনি চেপে রেখেছেন।

—তুমি শুনলে তো সব। তাঁর বক্তব্যে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছ কি?

—অসঙ্গতি! তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পারলাম না।

—আমি কিন্তু গুটিকয়েক বেফাঁস ব্যাপার ওঁর বক্তব্যের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছি।

—যেমন?

—যার জীবনের এত মায়া সে বুঝতে পারল বিষাক্ত কফি খাইয়ে তাকে একজন মারতে চেয়েছিল অথচ পুলিশকে কোন কথা জানাল না! এ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম নয় কি? এখানেও সে প্রাণের আশঙ্কা করছে, কিন্তু পুলিশের কাছে যাবে না! এতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় সে পুলিশকে দৃঢ়ভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কেন—? তারপর দেখ, নরেন একজন খারাপ লোক জেনেও, তাকে সেখানে রেখে নিজে এখানে চলে এসেছে। যেক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে সহজেই একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া যেত। অর্থাৎ আইন-আদালতকেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা। হয়ত নরেনকে না ঘাঁটানোর পিছনেও একটা ঘোরাল যুক্তি থাকতে পারে। কথা হচ্ছে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে, ব্যাপারটা সরল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সেন বললেন, তুমি ওঁর অতীত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে চাও নাকি?

—প্রয়োজন দেখা দিলে নিতে হবে।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বাসব উঠে পড়ে বলল, আর কথা নয়। এবার বিছানায় যেতে হবে। ঘুমের বাড়ি পাড়ি দেবার তাগিদ অনুভব করছি।

হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যি বাসবের ঘুম এসে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গেছে। দীর্ঘ রাত্রি কি ভাবে কেটে গেছে বুঝতেই পারেনি। কিন্তু এই সাতসকালে এত ধাক্কাধাক্কি কেন? চোখ কচলে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই ভীত-ত্রস্ত দুলাল সেনকে দেখতে পেল।

—কি ব্যাপার?

—রামশঙ্করবাবু খুন হয়েছেন।

বাসব দ্রুত উঠে বসল বিছানায়।

—বল কি—?

—পুলিশ পর্যন্ত এসে গেছে।

—এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটবে আশা করিনি। তুমি কখন জানতে পারলে ব্যাপারটা?

—এই তো মিনিট পাঁচেক আগে। রামশঙ্করবাবুর খুব ভোরবেলায় চা খাওয়ার অভ্যাস। রোজকারমত চাকর চা দিতে যায়। দরজা ধাকাধাকি করে তাঁর সাড়া না পেয়ে চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পায়, তিনি রক্তাক্ত শরীরে কার্পেটের উপর পড়ে আছেন।

—দেখল কি ভাবে? ঘরে আলো জ্বলছিল নাকি?

—হ্যাঁ। তুমি যাবে নাকি ওখানে?

রামশঙ্করবাবু আমার কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁকে অবশ্য বাঁচাতে পারলাম না। তবে—চল, ঘুরেই আসা যাক।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দুজনে রামশঙ্করবাবুর বাড়ি পেঁছাল। থানার কর্তা সুখময় দত্ত তখন চাকরদের এজাহার নিচ্ছিলেন। বাসবের পরিচয় পেয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হলেন মনে হল। এরকমটা সবক্ষেত্রে দেখা যায় না। দত্ত মৃদু হেসে বললেন, সুখের কথা ঠিক সময়েই আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন।

বাসব জানাল কিরকম পরিস্থিতিতে রামশঙ্করবাবু তার সহযোগিতা চেয়েছিলেন। যা ঘটবার তা অবশ্য রোধ করা গেল না। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে পুলিশকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত আছে। সুখময় উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি জানালেন। এবং এজাহারের পালা শেষ করেই তাকে নিয়ে গেলেন মৃতের কক্ষে।

…বাসবের মনে নানা কথা ওঠানামা করছে। চাকর-বাকররা বিশেষ কিছু জানে না এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাদের বক্তব্য হল, আন্দাজ সাড়ে নটার সময় একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক আসেন। তিনি কার্ড পাঠিয়ে দেন রামশঙ্করবাবুর কাছে। কর্তা ডেকে পাঠান তাকে নিজের ঘরে। তারপর তারা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভদ্রলোক চলে গেছেন ভেবে আর খোঁজখবর না নিয়ে শুতে চলে যায়। আগন্তুকের মুখ কেউই মনে করতে পারছে না। কারণ মাথা ও মুখের কিছুটা অংশ মাফলার দিয়ে জড়ানো ছিল।

সুখময় বললেন, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা একটু শক্ত হবে।

—আমার মনে হয় হত্যার মোটিভ যদি জানা যায় তাহলে কেসটা অনেক সরল হয়ে যাবে।

—কিন্তু তাও তো সহজ ব্যাপার নয়। চুরির উদ্দেশে যে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়নি তাতো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। তাছাড়া…

—রামশঙ্করবাবুর অতীত সম্পর্কে খোঁজ খবর ঠিকমত নিতে পারলে হয়ত আমরা মোটিভের সন্ধান পেতে পারি। কিভাবে এগুলে কাজ হবে তার রাস্তা আমার জানা আছে। আজই আগ্রায় পাঠাতে পারেন এমন কোন লোক হাতে আছে ?

—আগ্রা !

—রামশঙ্করবাবুর ওখানে হোটেলের ব্যবসা ছিল। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন ওখানেই।

—আমি রথীনকে পাঠাতে পারি। তবে একজন এল. সির পক্ষে কাজটা একটু শক্ত হয়ে পড়বে না কি ?

—তাহলে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। কিভাবে অনুসন্ধান নিতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি। আপনি আগ্রা পুলিশের সহযোগিতা গ্রহণ করুন। এছাড়া রামশঙ্করবাবুর ভাইপোকে খবর পাঠান।

সুখময় দত্ত সম্মতি জানালেন।

দুলাল সেনের বাড়িতে সান্ধ্য আসরে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কথাবার্তা তেমন জমছে না। বারংবার তাল কেটে যাচ্ছে। রামশঙ্করবাবুর মর্মন্তুদ মৃত্যুই সকলের মনোভাবকে কেমন খাপছাড়া করে তুলেছে। ছোট এই জনপদে কোন অভিজাত মানুষের খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনা আগে ঘটেনি।

ছকু রায় বলল, চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে। পুলিশ হত্যাকারীকে ধরতে না পারলে খুবই লজ্জার কথা হবে।

অতুলবাবু হেঁ হেঁ মার্কা হাসি দিয়ে বললেন, বাসববাবু রয়েছেন। লজ্জাকে ঢাকতে তিনি কসুর করবেন না।

বাসব অনেকক্ষণ ধরেই কোন কথা বলেনি। পাইপ টেনে যাচ্ছিল অবিরাম।

—আপনার কথায় কিছুটা শ্লেষের সুর আছে। এই কেসে আমাকে মাথা গলাতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নৈতিক দায়িত্বকে আমি এড়িয়ে যেতে চাই না। সাধ্যমত সাহায্য অবশ্যই করব। আশা করি আপনারাও আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সকলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

—তাহলে আমি অতুলবাবুকে দিয়েই আরম্ভ করি। গত সোমবার অর্থাৎ রামশঙ্করবাবু যেদিন খুন হন, সেই রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন ?

ঢোক গিলে অতুলবাবু বললেন, কি ঝামেলা, আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন ? শীতের রাত্রে কোথায় টো টো করে বেড়াব ? বাড়িতেই ছিলাম।

—বাকি রাতের কথা ছেড়ে দিন। দশটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন সেটুকু জানতে পারলেই আমি খুশি।

—বাড়িতে লেপের তলায় ছিলাম।

—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন অতুলবাবু। এমন দুজন সাক্ষী আছে যাদের একজন আপনাকে দশটার সময় রামশঙ্করবাবুর বাড়ির সামনে দেখেছে। দ্বিতীয়জন আপনার চাকর, সে রাত দুটোর সময় দরজা খুলে দিয়ে আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেছিল।

—প্রথমজন কে জানতে পারি ?

—নিশ্চয়। ডাঃ রক্ষিত আপনি এবার বলুন—

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে ডাঃ রক্ষিত বললেন, সেদিন রাত দশটা নাগাত কলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম অতুলবাবু রামশংকরবাবুর বাগানের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। একটু আশ্চর্য লেগেছিল। কারণ, আমি জানতাম, তাঁর সঙ্গে রামশংকরবাবুর আলাপ নেই।

নির্বিকার গলায় বাসব বলল, আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন ডাঃ রক্ষিত, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে ঠিক ওই সময়েই রামশংকরবাবু খুন হয়েছেন।

অতুলবাবু এবার ভেঙ্গে পড়লেন।

—বিশ্বাস করুন আমি এ সমস্তর কিছুই জানি না। ডাক্তারবাবু ঠিকই দেখেছেন। আমি সে সময় ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার কিন্তু কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। আমার ড্রিংক করার অভ্যাস আছে। সকলের চোখ বাঁচিয়ে রাত্রে আমি ঝাণ্ডাচকের লালচাঁদের দোকানে বোতল নিয়ে বসি। সেদিনও তাই গিয়েছিলাম। আমি যে মিথ্যে বলছি না, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

—আপনারা আর কোন কথা জানেন যা খুনের তদন্তে কাজে লাগতে পারে।

পরিমল ভদ্র বললেন, কাজে লাগবে কিনা জানি না। তবে—

—বলুন— ?

—সোমবার দিন দুপুরে আমি শংকরবাবুর ভাইপোকে বাজারে দেখেছিলাম।

—তাই নাকি। অথচ এই চারদিনের মধ্যে পুলিশের কাছে সে এ্যাপিয়ার হয়নি ! খুড়োর সঙ্গে ভাইপোর কেমন সম্পর্ক ছিল। বলতে পারেন ডাঃ রক্ষিত ?

—আমি যতদূর জানি ভাল ছিল না।

এই সময় একজন কনেস্টবল বাসবকে সেলাম দিয়ে, এসে দাঁড়াল।

—আপনাকে দারোগাবাবু একবার থানায় ডেকেছেন। বিশেষ জরুরী।

—আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। দুলাল, আমি থানা থেকে ঘুরে আসছি। বাসব কনেস্টবলকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসব থানায় পেঁৗছে লক্ষ্য করল, সুখময় দত্তর সামনের চেয়ারটি যে অধিকার করে আছে তাকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বয়স আন্দাজ বছর চল্লিশ। মুখচোখ চলনসই হলেও, দেহটি চমৎকার।

ওকে দেখেই দত্ত বললেন, ইনিই নরেন নাগ।

বাসব মনে মনে খুশি হল। রামশংকরবাবু গুরুতর অসুস্থ—একবার শেষ দেখা করতে চান, এই মর্মে তাঁর ভাইপোর বেনামীতে একটা তার করা হয়েছিল নরেন নাগকে আগ্রায়। দেখা যাচ্ছে আশানুরূপ কাজ হয়েছে।

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, আসল কথাটা বোধহয় এতক্ষণে উনি জানতে পেরেছেন।

—হ্যাঁ। ওঁকে আমি বলেছি। তবে কোন কাজের কথা হয়নি। আপনি কথা আরম্ভ করবেন এটাই আমার ইচ্ছে।

নরেন নাগ তীক্ষ্ন চোখে এতক্ষণ বাসবকে দেখে নিচ্ছিলেন। এখানে এসে থানার খপ্পরে পড়বেন ভাবতে পারেননি। স্টেশনে নেমে সোজা চলে গিয়েছিলেন রামশঙ্করবাবুর বাড়িতে, ওখানকার পুলিশ পাহারা তাঁকে বিচলিত করে তোলে। তারপরই তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

—রামশঙ্করবাবুর শোচনীয় মৃত্যু আপনাকে আহত করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনি একথাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমরা কিরকম জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। এক্ষেত্রে আপনাকে আগ্রা থেকে ডাকিয়ে পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বাসবের কথার উত্তরে নরেনবাবু বললেন, চৌধুরীমশাই যে খুন হতে পারেন আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। তবে সে ব্যাপারে আমাকে কেন ডেকে পাঠানো হল বুঝতে পারছি না।

—আপনি হত্যাকারীর নাম বলে দিতে যে পারবেন না তা আমি জানি। আপনাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য অন্য। রামশংকরবাবুর সম্পর্কে কিছু কথা জানা দরকার। আপনি সে ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করতে পারবেন।

—কি জানতে চান বলুন?

—আপনি তাঁকে কতদিন থেকে জানতেন?

—বছর দশেক তো বটেই।

—কি ভাবে আপনাদের আলাপ হয়েছিল?

—আমি "ন্যাশানাল বোর্ডিং"-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওঁর হোটেলে ম্যানেজার হয়ে আসি। সেই থেকেই উনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেন। এমন কি ব্যবসার অংশীদার পর্যন্ত করে নেন। তবে ইদানিং—

—আমি জানি তিনি ইদানিং আপনাকে বিশ্বাস করতেন না।—পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বাসব বলল, কফিতে বিষ মিশিয়ে আপনি তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এই ধারণা তাঁর হয়েছিল।

নরেনবাবু বিস্মিতগলায় বললেন, আপনি জানেন একথা! বিশ্বাস করুন আমি তাঁকে মারতে চাইনি। কে একাজ করেছিল তাও আমার জানা নেই।

—কেন? বয় মাইকেল—যে তাঁকে কফি পরিবেশন করেছিল?

—লোকটা যে দুধে-ধোয়া একথা আমি বলছি না। তবে চৌধুরীমশাইকে

খুন করায় তার কি স্বার্থ থাকতে পারে বলুন ?

—মোটা টাকার বিনিময়ে কেউ তাকে দিয়ে একাজ করিয়ে থাকতে পারে ?

—তা অবশ্য পারে। এখন আর সে আমাদের হোটেলে নেই। চৌধুরী-মশাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে মিনিট দুয়েক একমনে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, এবার একটা কথার উত্তর খুব ভেবেচিন্তে দিন মিঃ নাগ। এরকম একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটল অথচ রামশংকরবাবু পুলিশে খবর দিলেন না কেন ?

—আমি পুলিশে খবর দিতে বলেছিলাম। মাইকেলকে তারা চেপে ধরলে আসল কথা বেরিয়ে পড়তে পারত, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

—কেন ?

—পুলিশকে তিনি এড়িয়ে চলতে চাইতেন।

—কারণটা কি ?

—জোর দিয়ে কিছু বলতে পারি না···আমার মনে হয়······

—থামলেন কেন ? আপনার অনুমানও এই কেসে বড়রকম সূত্র হতে পারে। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে আপনি সমস্ত কথা খুলে বলুন।

নরেন নাগ ইতস্ততঃ করে বললেন, ওর স্ত্রীর মৃত্যু অনেকাংশে এই মনোভাবের জন্য দায়ী বলে মনে করি।

—ঠিক বুঝলাম না।

ওঁর স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। একথা বুঝতে পেরেছিলাম মৃতদেহ দেখেই। বিষপ্রয়োগের দরুণ সমস্ত শরীর কালো হয়ে উঠেছিল। আমি নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয়ে তখন কাউকে একথা বলতে পারিনি। টাকা দিয়েই বোধহয় ডেথ-সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

—এতক্ষণে একটা মূল্যবান কথা জানা গেল। কে তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছিল বলে আপনার মনে হয় ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি নিজেই।

—বলেন কি ?

—ও'র জায়গায় আর কেউ থাকলে সে ওই কাজ করত।

—কেন ?

—চৌধুরীমশাই প্রৌঢ় বয়সে খোঁজ খবর না নিয়েই একটি যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। তার চরিত্র একেবারেই ভাল ছিল না। সে স্বামীকে তোয়াক্কা না করে যার-তার সঙ্গে ঢলাঢলি করত। এমন কি—

এমন কি ?

—ও'র ভাইপোকেও স্ত্রী নিজের শিকার করে তুলেছিলেন। শেষে আর থাকতে না পেরে স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন চৌধুরী

মশাই।

—তাই বোধহয় পুলিশকে ভয় পেতেন?

—আমার তো তাই মনে হয়। বিশ্বাস না করেও আমার উপর ব্যবসার ভার ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছিলেন দুটো কারণে—নিজের জীবনের ভয় ও পুলিশের ভয়ে।

—ওঁর স্ত্রীর কোন আত্মীয়স্বজন আছে?

—এক বড় ভাই ছিল জানি।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—আগ্রায় থাকতেন জানি। এখন কোথায় আছেন বলতে পারব না। আমি কোনদিন তাঁকে চোখে দেখিনি।

—ধন্যবাদ মিঃ নাগ। আপনি অনেক কাজের কথা বলেছেন আমাদের। বর্তমানে আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তবে এখানেই কয়েকদিন থাকতে হবে। মিঃ দত্ত, এঁর থাকার কি ব্যবস্থা হবে বলুন তো।

সুখময় দত্ত এতক্ষণ নীরবে বসে সমস্ত শুনছিলেন। বললেন, মিলন বোর্ডিং এ থাকতে পারেন। আমার লোক ওঁকে ওখানে পোঁছে দিয়ে আসবে।

সেই ব্যবস্থাই হল। নরেনবাবু আপত্তি করলেন না। আপত্তি করে যে ফল হবে না বুঝতে পেরেছেন। ওঁকে নিয়ে একজন কনেস্টবল মিলন বোর্ডিং এর উদ্দেশে রওনা হবার পর চা এসে পড়ল!

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বাসব বলল, দেখছেন তো ব্যাপার সামান্য নয়, জল অনেক গভীরে চলে গেছে।

—তাইতো দেখছি। মোটিভের জন্ম এখানে না আগ্রায় তা এখন বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

—আমি একটা ক্ষীণ আলোর সন্ধান পেয়েছি, তবে—ওকথা এখন থাক। রামশংকরবাবুর ভাইপোর সন্ধান পেলেন নাকি?

—দুমকায় সে পোস্টেড। তাকে পাওয়া যায়নি অবশ্য। রামশঙ্করবাবু মারা যাবার দিনকয়েক আগেই সে এক মাস ছুটি নিয়ে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গেছে।

—কথাটা সত্যি হলে, আমাকে অন্য দিক নিয়ে আবার চিন্তা করে দেখতে হবে। আমাকে একজন বিশ্বাসী ইনফর্মার দিতে পারেন?

—ইনফর্মার!

—হ্যাঁ। যারা আপনাদের ডিপার্টমেন্টের লোক নয়।

—আছে দু-একজন। কিন্তু—

—পরে আপনাকে সব কথা বলব। এখুনি ডেকে পাঠান না একজনকে। আজ রাত থেকেই কাজ আরম্ভ করতে পারবে।

—আপনি বসুন। আমি দুবেকে খবর পাঠাচ্ছি।

চিন্তিতমুখে সুখময় দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাত তখন অনেক।

রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। ঠাণ্ডায় চতুর্দিক যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। একজন বিটের কনেস্টবলকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ডিউটি দেবার নাম করে থানা থেকে বেরিয়ে তারা কোথাও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম মারছে বোধহয়। হঠাৎ গলি থেকে বেরিয়ে একজনকে স্টাফ রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। ওভারকোটে মোড়া এই মানুষটিকে অন্ধকারের দরুণ চেনা যায় না।

সে স্টাফ রোড ধরেই এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। তার চলার গতি কিছুটা দ্রুত। রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার মোড়েই মিলন বোর্ডিং। এখানে নবাগতদের মাথা গোঁজার একমাত্র স্থান। হরিপদ গড়াই বর্ধমান থেকে এসে এই হোটেল খুলেছেন। তিনিই মালিক, তিনিই ম্যানেজার।

মিলন বোর্ডিংয়ের কর্ম-কোলাহল ঘণ্টাতিনেক আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে হরিপদবাবু শুতে যেতে পারেননি। খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে বিছানায় আশ্রয় নিতে প্রত্যহই তাঁর দেরি হয়ে যায়। ওয়ালক্লকের দিকে তাকালেন—বারটা দশ। হাই তুলতে তুলতে হরিপদবাবু কাউণ্টারের কাছ থেকে সরে এসে কাঁচের পাল্লা দেওয়া জানলার সামনে দাঁড়ালেন।

সামনে ফালি বাগানটা শীতের প্রতাপে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। পাঁচিল ঘেঁসা পাকুর গাছ থেকে টপ টপ করে হিম ঝরে পড়ছে। হরিপদবাবু জানলার কাছ থেকে সরে আসার মুখে লক্ষ্য করলেন, ওভারকোট গায়ে দেওয়া একজন লোক গেট খুলে বাগানে ঢুকছে। কোন বোর্ডার নিশ্চয়ই। এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরছে? হরিপদবাবু কিছুটা বিরক্তভাব নিয়েই দরজা খুলে দেবার জন্য তৎপর হলেন।

ওদিকে—

ওভারকোট মোড়া লোকটা বাগান পেরিয়ে বারান্দায় পা দেবার মুখে শুনতে পেল পিছনে পায়ের শব্দ। মুখ ফিরিয়ে দেখল মাথায় মাফলার জড়ানো, কম্বল গায়ে দেওয়া একজন হাতকয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না তবে হাবভাব সন্দেহজনক।

—দাঁড়ান—

ওভারকোট থামল।

কম্বল আরো এগিয়ে এসে বলল, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন আমি জানি। কিন্তু যা চাইছেন তা হতে দেওয়া হবে না।

—কে আপনি?

—অতি চালাকি করার ফল আপনাকে এক্ষুণি পেতে হবে।

কথা শেষ করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওভারকোটধারীর উপর। এপক্ষ অসতর্ক ছিল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে মুষ্ঠাঘাত করল প্রতিপক্ষকে। তারপর আরম্ভ হয়ে গেল ঝটাপটি। অবশ্য খুব বেশিক্ষণ

স্থায়ী হল না এই শক্তিপরীক্ষা। অল্পায়াসেই কম্বলধারী কাবু করে ফেলল অন্যজনকে। তারপর—

তীক্ষ্ন চিৎকারে রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে গেল। একবার নয়, পরপর দুবার। দরজার এপারে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুনছিল হরিপদ গড়াই। বারান্দায় যে এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। ওদিকে কম্বলধারী রক্ত মাখানো ছুরিটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়েছে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা অনড় দেহটার দিকে একবার তাকাল। তারপর দ্রুত বাগান পেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মিলন বোর্ডিং একটু নির্জন অঞ্চলে। চিৎকার তাই প্রতিবেশীদের সচকিত করতে পারেনি। কিন্তু বোর্ডারদের অনেকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কেউ কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ভীতভাবে। গড়াই তখনও ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। একজন ছোকরা বয় চোখ কচলাতে কচলাতে এসে উপস্থিত হল। চিৎকার তার কানেও গেছে। অনুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে এখানে এসে কর্তাকে ওই ভাবে দেখে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল।

—কি হয়েছে কর্তা?

কর্তা কোনরকমে বললেন, বারান্দায় বোধহয় খুনোখুনি হয়ে গেছে রে ভজু।

—বলেন কি! খুন!

—একা দরজা খুলতে যাস না যেন। লোকজন আসুক, তারপর—

ভজুর মারফৎ সংবাদ প্রচারিত হতে বিলম্ব হল না। সমস্ত হোটেল ভেঙ্গে পড়ল অফিসঘরে। বারান্দায় আলো জেবলে দিয়ে দরজা খোলা হল। হুড়মুড় করে সকলে বেরিয়ে এসেই এক মর্মন্তুদ দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন। হরিপদ গড়াইয়ের অনুমান মিথ্যা নয়। নিথর একটা দেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। ভারি ওভারকোট গায়ে থাকায় রক্ত দেখা যাচ্ছে না তবে একপাশটা ভিজে উঠেছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেই হরিপদ গড়াই কঁকিয়ে উঠলেন।

—অ্যাঁ—একি! আমার হোটেলের একি সর্বনাশ হল? ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, লোকটা কে মশাই?

—নরেন নাগ। আগ্রা থেকে এসেছিলেন।

—আর দেরি করবেন না। পুলিশে খবর দিন।

—পুলিশ!

হরিপদ গড়াইয়ের মাথা ঘুরতে লাগল।

—আমার হোটেলের দফারফা হয়ে গেল। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম?

পুলিশে খবর অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠাতেই হল।

দলবল নিয়ে সুখময় দত্ত যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এলেন। মুখে তার জলদগাম্ভীর্য, কিন্তু মনে মনে অসম্ভব বিব্রত। তাঁর এলাকায় এ সমস্ত কি আরম্ভ হয়েছে? রামশঙ্করের খুনের ব্যাপারে নরেন নাগকে আগ্রা থেকে এখানে কৌশল করে আনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেও খুন হয়ে গেল! বেশ

গোলমেলে কাণ্ড। আগের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

মৃতদেহ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন দত্ত। তারপর বারান্দার চতুর্দিকে ভাল করে দেখলেন। পুলিশ আসার পরই সকলে যে যার ঘরে চলে গিয়েছিলেন। টিনের তৈরি ছোট্ট একটা ক্রুশ পাওয়া গেল। এই ধরনের খৃষ্টধর্মীয়দের গলায় চেনের সঙ্গে আটকানো থাকে। দত্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্রুশটা দেখে নিয়ে পকেটে রাখলেন। খোঁজাখুঁজি করে আর কিছু পাওয়া গেল না।

এবার জেরার পালা।

দত্ত গড়াইকে নিয়ে পড়লেন।

অসম্ভব বিচলিত গড়াই যা ভেবেছিলেন, যা শুনেছিলেন সমস্ত বললেন। হত্যাকারীকে তিনি দেখেননি—দেখেছেন নাগকে। নাগ কখন হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন তা তাঁর জানা নেই। যে বয় ও'র ঘরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সে বললেও বলতে পারে—ইত্যাদি।

নরেন নাগকে দেখাশুনোর ভার ভজুর উপর ছিল। তাকে ডাকা হল। বেশ ভয় পেয়ে গেছে ছোকরা। প্রশ্নের উত্তরে সে যা বলল তার সারমর্ম হল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নরেন নাগ পুরোদস্তুর শীতের পোশাক পরে, আন্দাজ সাড়ে নটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন। ভজু প্রশ্ন করেছিল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন বাবু। তিনি উত্তর দিলেন, বাজারের দিকে যাচ্ছি, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।

আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, মৃতদেহ চালান করে দিয়ে যখন সুখময় দত্ত মিলন বোর্ডিং ত্যাগ করলেন তখন ভোর হয়ে গেছে। মহাচিন্তিত-ভাবে থানায় ফিরলেন। রাতভোর ধকলে শরীর ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসছে। বাসবকে সংবাদটা দেওয়া দরকার। একজন কনেস্টবলকে দুলাল সেনের বাসার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ালেন।

বাসব ক্রুশটা নেড়েচেড়ে বলল, হত্যাকারীর গলা থেকেই এটা খুলে পড়ে গেছে ধস্তাধস্তি করার সময়। তার মানে সে একজন ক্রিশ্চান। আমাদের তদন্তের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে।

বিমর্ষভাবে সুখময় বললেন, কই আর ছোট হয়ে আসছে। আপনার মতে তাহলে দুটো খুন একই সূত্রে গাঁথা?

—নিঃসন্দেহে। নইলে নরেন নাগের মত নবাগত হঠাৎ এখানে খুন হয়ে যাবে কেন? হত্যাকারী খুন করার আগে কি বলেছিল মনে করে দেখুন। সে বলেছিল, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন আমি জানি। কিন্তু যা চাইছেন তা হতে দেওয়া হবে না। এই কথাগুলি আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সূত্রবিশেষ। আমার কি মনে হয় জানেন, নরেন নাগ আমাদের কাছে স্বীকার না করলেও হত্যাকারী কে তা সে জানত।

—তবে কি সে—

—হ্যাঁ। সে হত্যাকারীর কাছেই গিয়েছিল। হয়ত ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্য নিয়ে। বলে এসেছিল, অমুক অঙ্কের টাকা না দিলে পুলিশের কাছে তার পরিচয় প্রকাশ করে দেবে ; হত্যাকারী এমন একজন লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

উত্তেজিত ভাবে সুখময় দত্ত বললেন, নরেন নাগ বাজারে গিয়েছিল! তবে হত্যাকারী ওই অঞ্চলে থাকে?

—হয়ত। আচ্ছা, যে লোকটা আগ্রায় কফিতে বিষ মিশিয়ে রামশঙ্করবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল—তার নাম বলেছিল নরেন নাগ, এব্রাহাম?

—না মাইকেল।

—মাইকেলকে রামশংকরবাবু এখানেও একদিন দেখেছিলেন। আমরা ক্রুশ-চিহ্নটা কুড়িয়ে পেয়েছি। এর মানে দাঁড়াচ্ছে সেই লোকটাই দুটোই খুন করেছে।

···একজন বয় কি স্বার্থে রামশংকরবাবুকে খুন করতে যাবে?

—কিছু স্বার্থ নিশ্চয় আছে। এখন মিলন বোর্ডিং-এ চলুন। নরেন নাগের ঘরটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

—চলুন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা গন্তব্যস্থলে পেঁছাল। হরিপদ গড়াই অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর মুখ ভয়ে শুকিয়ে রয়েছে। তাঁর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হল না। দুজনে দোতলায় গিয়ে উঠল। সীল ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে সুখময় সমস্ত জানলা খুলে দিলেন। বাসব দেখল, একটা মাঝারি সাইজের সুটকেশ ছাড়া নরেন নাগ আগ্রা থেকে আর কিছু সঙ্গে আনেননি।

সুটকেশের চাবি সঙ্গেই ছিল। নাগের ওভারকোটের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। তালা খুলে সুটকেশের মধ্যেকার সমস্ত কিছু উজাড় করে রাখা হল বিছানার উপর। জামাকাপড় ও নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ছাড়া একটা চ্যাপ্টা বইয়ের আকারের প্লাস্টিকের বাক্স পাওয়া গেল।

বাক্স খুলতেই একটা ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল। রামশংকরবাবু ও মহিলা, দুজনেরই মুখ হাসি হাসি। মহিলা সুরূপা এবং যুবতী। স্বামী-স্ত্রীর ছবি দেখলেই বোঝা যায়। বাসব ভাল করে দেখে নিয়ে সুখময়ের দিকে এগিয়ে ধরল।

—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, ছবিতে বিশেষ কিছু দেখলেন?

—বিশেষ কিছু?

হ্যাঁ।

—কই, তেমন তো কিছু চোখে পড়ছে না।

—মহিলার বুকে ক্রুশযুক্ত হারটা দেখেছেন? অর্থাৎ ইনিও খৃষ্টান। এবার মোটিভ উঁকিঝুঁকি মারছে।

—মোটিভ!

—জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার মনে হয়, এই মহিলা ও মাইকেল, দুজনেই খৃস্টান হওয়ায় সম্পর্কযুক্ত। রামশংকরবাবু চরিত্রহীনা স্ত্রীকে খুন করেছিলেন—মাইকেল আত্মীয় হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে তাঁকে হত্যা করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ অপরাধীর সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন? এবার বাক্সর মধ্যেকার অন্যান্য জিনিসগুলো দেখা যাক।

অন্যান্য জিনিস বলতে অবশ্য বিশেষ কিছু ছিল না, গোটাকয়েক খামে মোড়া চিঠি। দুজনে ভাগভাগি করে চিঠিগুলো পড়ে ফেলল। দুজনের অনুভব একই রকম। সাদা কাগজের উপরকার রু অক্ষরগুলি নিঃসন্দেহে কাজে লাগাবার মত। প্রথম চিঠিখানা নিম্নরূপ—

মাননীয় চৌধুরীমশাই,

আমার বোন রুমাকে আপনি বিয়ে করেছেন জেনে বিশেষ আনন্দিত হলাম। ভাগ্যদোষে অবস্থা এখন খারাপ হয়ে পড়লেও আমরা ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে। আরো একটু অনুগ্রহ আপনার কাছ থেকে চাইছি। বর্তমানে আমি বেকার। অনুগ্রহ করে এই অপরিচিত শ্যালককে আপনার হোটেলে যদি চাকরি দেন তাহলে উপকৃত হব। যে কোন চাকরি হলে চলবে। উত্তরের অপেক্ষা করছি। নমস্কার গ্রহণ করুন।—মাইকেল।

কলকাতার দমদম অঞ্চলের একটা ঠিকানা থেকে বছর পাঁচেক আগে এই চিঠির বক্তব্য অন্যরকম।

চৌধুরীমশাই,

আপনি আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করে হোটেল থেকে তাড়িয়েছেন। আসল অপরাধী নরেন নাগ। সেই আপনাকে কফিতে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিল। অবশ্য আপনি খুন হলে আমি খুশি হতাম।

পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিলেও আমি জানি আপনিই রুমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছেন। ভেবেছিলাম ক্ষমা করব। কিন্তু আর আপনি আমার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। এখান থেকে সরে পড়বার তোড়জোড় করছেন। খবর পেয়েছি। পালিয়েও প্রাণ বাঁচানো যাবে না।—মাইকেল।

এই চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই তবে খামের উপরকার পোস্টমার্ক দেখে জানা গেল, আগ্রাতেই ডাকে দেওয়া হয়েছিল। বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কয়েক মিনিট কি ভাবল, তারপর বলল, দেখা যাচ্ছে আমার অনুমান মিথ্যা নয়। উত্তেজনার দরুণ দ্বিতীয় চিঠিতে মাইকেল স্বীকার করে নিয়েছে ভগ্নীপতিকে খুন করার ইচ্ছের কথা। সুবিধাবাদী নরেন নাগ এই সমস্ত চিঠি কৌশলে সংগ্রহ করে রেখেছিল ভবিষ্যতের জন্য।

—হত্যাকারী কে হতে পারে কিছু আন্দাজ পেলেন?

—না। তবে তাকে হাতে পাবার উপায় মাথার মধ্যে এসেছে।

—কি বলুন তো?

—ওই বিষয় নিয়ে আরো একটু ভাবতে হবে। দুপুরে আপনাকে প্ল্যানটা বলতে পারব মনে হয়। চলুন, এবার যাওয়া যাক, এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

সন্ধ্যা তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে।

দুলাল সেনের বাইরের ঘরে জমে উঠেছে আসর। কিছুক্ষণ আগে তাস খেলা চলছিল। ডাঃ রক্ষিত ও পরিমল ভদ্র এসে পড়ার পর গল্প-গুজব আরম্ভ হয়েছে।

অবশ্য ঠিক গল্প-গুজব নয়—কথাবার্তা চলছে নরেন নাগের হত্যাকে কেন্দ্র করেই। বাসব অবশ্য চুপচাপ আছে। চুপচাপ রয়েছে আরো একজন। ছকু রায়। তার চোখমুখের ভাব কেমন সচকিত।

ডাঃ রক্ষিত বললেন, লোকটা বোধহয় এখানে আগ্রা থেকে মরার জন্যেই এসেছিল।

—ভাগ্যকে তো আর খণ্ডানো যায় না। পরিমল ভদ্র বললেন, মাঝে থেকে হরিপদ বিপাকে পড়লেন। তাঁর ফলাও হোটেলের ব্যবসাটা এবার গেল।

দুলাল সেন বললেন, তা ঠিক। ছোট শহরে এই হয় মুশকিল। ওখানে খুন হয়েছে এ কথা শুনলে, নতুন বোর্ডার ও-পথ মাড়াবে না।

—অথচ ও-লোকটার কোন অপরাধ নেই।

এসব ক্ষেত্রে অপরাধের বিচার কেউ করে না। এমন কথা রটে যাওয়াও বিচিত্র নয়, গভীর রাতে নরেন নাগকে কেউ কেউ "মিলন বোর্ডিং"-এ ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

দুলাল সেনের কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

অতুল কর বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা তো ভেবেছিলাম রাম-শঙ্করবাবুর খুনীকে আপনি সহজেই ধরে ফেলবেন। কিন্তু ব্যাপার তো আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। ধরা দূরের কথা, সে তো আরো একটা খুন করে বসে আছে। আপনার মত ধুরন্ধর গোয়েন্দাকে যাকে বলে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

বাসব কিছু বলার আগে দুলাল সেন বিরক্তির সুরে বললেন, আপনি কি মনে করেন সমস্ত ব্যাপারটা জল-ভাত? এরকম কেস সলভ্ করতে সময় লাগবেই।

—তাছাড়া—পরিমল ভদ্র বললেন, দুটো খুনের মধ্যে যে যোগাযোগ আছে তাও তো এখন মেনে নেওয়া যায় না।

বাসব বলল, মিঃ কর ঠিকই বলেছেন। দুটো খুনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। কাজটা যে একই লোকের এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। তবে কি জানেন যে এই সমস্ত গুরুতর কাজ করেছে—নিঃসন্দেহে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে করেছে। কাজেই তাকে হাতের মুঠোয় পেতে একটু সময় লাগবেই। ও কথা যাক। ছকুবাবু আজ এত চুপচাপ কেন! কি ব্যাপার মশাই?

ছকু রায় বলল, আমি একটু অস্বস্তির মধ্যে আছি।

তার কথা শুনে সকলেই অবাক। দিলখোলা ছকু রায় হৈ হৈ করে বেড়াতেই ভালবাসে। সে যখন অস্বস্তির আওতায় রয়েছে তখন বিশেষ কিছু না হয়ে যায় না।

ডাঃ রক্ষিত বললেন, মনে অস্বস্তি পুষে রাখলে শরীর খারাপ হতে পারে। ব্যাপারটা কি আমাদের বলে ফেলুন বরং।

—নরেন নাগের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। তবে আপনারা শুনলে অবাক হবেন, আমি একটু সতর্ক হলে সে ভদ্রলোক মারা পড়তেন না।

পরিমল ভদ্র সবিস্ময়ে বললেন, বলেন কি?

আর সকলেও কম বিস্মিত নন।

—তাইতো অস্বস্তি বোধ করছি। কেন যে আমি তাঁকে একা একা হোটেলে ফিরে যেতে দিলাম।

বাসব বলল, বললেন যে আপনার সঙ্গে নরেন নাগের আলাপ ছিল না?

—ঠিকই বলছি। সে রাত্রে আমরা হঠাৎ কাছাকাছি হয়ে পড়েছিলাম। তারপর—

—আপনি তো হেঁয়ালি আরম্ভ করলেন মশাই। পরিষ্কার করে বলুন না ব্যাপারটা। আমরা দারুণ আগ্রহ বোধ করছি, বুঝতে পারছেন না?

দুলাল সেনের কথায় ছকু রায় একটু ইতস্ততঃ করল। নিজের বাহারে টেরির উপর আলতোভাবে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওখান থেকে বেরুতে বেশ রাত হয়ে গেল। পা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। ঝাণ্ডাচক পেরিয়ে একটু এগিয়েছি—এমন সময় একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। লোকটা জড়ানো গলায় কি একটা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সকলে আগ্রহের সঙ্গে শুনছে।

অতুল কর বললেন, নরেন নাগ নাকি?

—হ্যাঁ। মিলন বোর্ডিং-এ দুপুরে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম।

—তারপর?

—আমি আবার এগুতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, মাটিতে কি একটা পড়ে রয়েছে; ঝুঁকে তুলে নিলাম—ভারি একটা খাম। নরেন নাগের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। তিনি অদৃশ্য হয়েছেন।

বাসব প্রশ্ন করল, তিনি কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?

—বাজারের দিকে। আমি একটু খোঁজাখুঁজি করলেই তার দেখা পেতাম খামটা পেয়ে হয়ত তিনি আমার সঙ্গে ফিরে আসতে পারতেন। হত্যাকারী তাহলে আর হোটেল পর্যন্ত অনুসরণ করে তাঁকে খুন করতে পারত না।

পরিমল ভদ্র বললেন, খামটার মধ্যে কি ছিল দেখেছেন ?

—খানকয়েক চিঠি ছিল। মাইকেল নামে কোন লোক লিখেছে। আমি ভাল করে পড়ে দেখিনি। আর একটা ছবি ছিল।

অতুল কর সাগ্রহে বললেন, কার ছবি ?

—সস্ত্রীক রামশঙ্করবাবু।

ডাঃ রক্ষিত এতক্ষণ চুপ করেছিলেন।

এবার বললেন, আপনার কথা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারলাম না। ছকুবাবু। আপনি হারিয়ে যাওয়া খামটা ফিরিয়ে দিলেই নরেন নাগ আপনার সঙ্গে ফিরে আসতেন একথা জোর দিয়ে বলা চলে না। খামটা পেয়ে তিনি খুশি হতেন, তারপর আবার নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে এগোতেন এটাই স্বাভাবিক।

—আমি তো জোর দিয়ে কিছু বলিনি। আমার মন বলছে হয়ত তিনি ফিরে আসতেন। আরেকজন লোক সঙ্গে আছে দেখে, হত্যাকারী কাছাকাছি ঘেঁসতে আর সাহস পেত না !

দুলাল সেন বললেন, আপনি তো তাঁর যাবার সময়ের কথা বলছেন। খুন হয়েছেন তিনি হোটেলে ফিরে এসে। তার মানে হত্যাকারী হোটেলের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল।

বাসব বলল, ও নিয়ে এখন আর গবেষণা করে কি লাভ ? ছকুবাবু আপনি কিন্তু একটা অন্যায় করেছেন। কুড়িয়ে পাওয়া খামটা নিজের কাছে রেখে দেওয়া উচিত হয়নি। নরেনবাবু খুন হয়ে গেছেন খবর পেয়েই থানায় ওটা জমা দিয়ে এলে ভাল করতেন।

অপ্রস্তুতের মত হাসি হেসে ছকু রায় বললেন, আমার মাথায় ওটা আসেনি। থানায় দিয়ে আসাই উচিত ছিল। খামের মধ্যেকার কাগজপত্র থেকে হয়ত কোন জোরাল সূত্র বেরুতে পারে।

—খামটা আছে, না আপনিও হারিয়ে ফেলেছেন ?

—আছে।

—কাল ভোরেই আমি আপনার কাছে যাব। খামটা আমায় দেবেন।

—বেশ।

আরো কিছুক্ষণ অসংলগ্ন আলাপ আলোচনার পর আসর ভাঙল। বাসব কিন্তু একই জায়গায় বসে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে যেতে লাগল। ওকে এখন বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। দুলাল সেনও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

—কিছু আলো দেখতে পাচ্ছ ?

—খুনদুটো কে করেছে আমি জানি।

—বল কি ! লোকটা কে ?

—ধৈর্য ধর বন্ধু ! কাল সবই জানতে পারবে। আর কথা নয়, চল.

এবার খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

কথা শেষ করে বাসব উঠে দাঁড়াল।

খাওয়া দাওয়া সেরে আন্দাজ রাত দশটার সময় ছকু রায় শোবার আয়োজন করছে।

দরজায় করাঘাত হল। কৃপারাম পুল রোডের ছোট একটা বাড়িতে সে থাকে। অবশ্য ঠিক বলা হল না। ওই বাড়ির সামনের দিকের ঘরে সে ভাড়াটে। ব্যাংকে যা পৈতৃক টাকা জমা আছে তার সুদে একটা পেট ভাল ভাবেই কেটে যায়। কাজেই কাজকর্ম করার বালাই নেই। খায় দায় আর টোটো করে বেড়ায়। রাত্রের আশ্রয়ের জন্য এই ঘর তো রয়েছেই।

আবার দরজায় করাঘাত হল। ছকু রায় দরজা খুলে দিল। একজন প্রবেশ করল ঘরে।

রাত ক্রমে বেড়ে চলেছে।

শীতের ভারে নুয়ে পড়া রাত। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। এখন যে যার উষ্ণ-শয্যায় একান্ত হয়ে রয়েছে। ঝাণ্ডাচক থেকে যে গলিটা কৃপারামপুল রোডের দিকে গেছে—সেখানে একজনকে দেখা গেল। ভারি গ্রেটকোট গায়ে দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

গলিটা পার হয়ে সে কৃপারামপুল রোডে এসে পড়ল।

তাকাল এধার ওধার। কেউ নেই—যতদূর চোখ পড়ে হাল্কা কুয়াশায় ঘেরা পথ সম্পূর্ণ খালি। নিশ্চিন্ত মনে সে এগিয়ে চলল। পুরো রাস্তা অতিক্রম করার অবশ্য প্রয়োজন পড়ল না। তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গ্রেটকোটধারী আবার তাকিয়ে নিল চারিধার।

কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

মৃদু ধাক্কা দিল দরজায়। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক ভাবেই গৃহকর্তা ঘুমে অচেতন। এক ডাকে সাড়া পাওয়া যাবে না আগন্তুক তা জানে। এবার আর মৃদু ধাক্কা নয়, একটু জোরে কড়া নাড়ল। বারকয়েক কড়া নাড়ার পর, ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

—কে ?

—দরজা খুলুন।

—কে আপনি ?

—দুলাল সেন। দরজাটা খুলুন দয়া করে।

দরজা খুলে গেল।

আগন্তুক ভেতরে ঢুকেই এমন একটা কাজ করল যা অভাবনীয়। মুষ্ট্যাঘাতে ছকু রায়কে ধরাশায়ী করল প্রথমে, তারপর মাটি থেকে তাকে তুলে ঠেসে ধরল

দেওয়ালের সঙ্গে। ঘর অন্ধকার থাকায় আগন্তুকের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছকু রায়ের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে।

কাঁপা গলায় সে বলল, কি চান আপনি? আমায় মারলেন কেন?

—কুড়িয়ে পাওয়া খামটা আমায় দাও। অবাধ্যতা করলে প্রাণে বাঁচবে না।

—আমার কাছে তো কোন খাম নেই।

—মিথ্যাবাদী—।

—বিশ্বাস করুন, আমি কোন খাম কুড়িয়ে পাইনি। ওটা আমার বানানো গল্প।

প্রবলভাবে ছকু রায়কে ঝাঁকুনি দিয়ে আগন্তুক বলল, হঠাৎ তুমি বানিয়েই বা বলতে গেলে কেন? নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত করার চেষ্টা কর না। আরেকটা খুন করা আমার পক্ষে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

ঠিক এই সময় আলো জ্বলে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কে বলে উঠল, তা আমরা জানি পরিমলবাবু। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য, তৃতীয় খুনটা আর করতে পারবেন না।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন পরিমল ভদ্র।

বাসব মৃদু হেসে বলল, কয়েকঘণ্টা ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। অতি বুদ্ধিমানও সময় সময় বোকামি করে। না ভেবেচিন্তেই আমার টোপ গিলে এখন নিশ্চয়ই আফশোষ করছেন?

পরিমল ভদ্র লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। দরজা খুলে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হল না। সুখময় দত্ত সদলে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। ও'কে ঠেলতে ঠেলতেই তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। বলা বাহুল্য, কালবিলম্ব না করে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিলেন।

—মুখ দেখে লোক চেনা ভার—সুখময় দত্ত বললেন, এমন শান্তশিষ্ট চেহারা অথচ—

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, দু-দুটো খুন করার নার্ভ যে তাঁর আছে তা তো দেখাই গেল। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন মিঃ দত্ত, উনি শুধু পরিমল ভদ্র নন, নামের আগে মাইকেল শব্দটাও যোগ করতে হবে। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনিও আসামীকে নিয়ে থানার পথে রওনা দিন।

মাইকেল ভদ্র চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বলার আগ্রহ তাঁর আছে বলে মনে হয় না। বোধহয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে মুখ খুলবেন না। ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাত শেষ হতে চলেছে।

মুখোমুখি বসে বাসব ও দুলাল সেনের মধ্যে কথা হচ্ছে।

—প্রতিহিংসার তাড়না একবার মনকে পেয়ে বসলে মানুষ দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অতিষ্ঠ হয়েই রামশংকরবাবু নিজের চরিত্রহীনা স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একজনের মনে আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে স্থির করে ফেলল এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। একটা কথা অবশ্য বুঝতে পারা যায় না, রামশংকরবাবু শালাকে সামান্য বয়ের চাকরি কেন দিয়েছিলেন—তার সেই বা ওই চাকরি করতে রাজি হয়েছিল কেন? যা হোক মাইকেল প্রথমে কফিতে বিষ দিয়ে মারতে চেষ্টা করল। তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও বুঝতে পারলেন, আগ্রা আর নিরাপদ নয়। তল্পিতল্পা গুটিয়ে নরেন নাগকে হোটেলের সর্বেসর্বা করে দিয়ে এখানে চলে এলেন। নিজের নামের প্রথমাংশ অর্থাৎ মাইকেলটা কেটে শুধুমাত্র পরিমল ভদ্র হয়ে শ্যালকপ্রবরও এখানে এসে উপস্থিত হল। তারপর সুযোগ পেয়েই সে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে।

দুলাল সেন বললেন, পরিমল ভদ্র যে হত্যাকারী প্রথমে তুমি বুঝলে কি ভাবে?

—আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম মাত্র। খড়ের গাদায় ছুঁচের খোঁজ করতে যাওয়ার মত অবস্থা। আলোর সন্ধান পেলাম নরেন নাগের মৃত্যুর পর। রামশংকরবাবুকে লেখা মাইকেলের গোটাকয়েক চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তার থেকে তিনজন লোকের ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেল। যে চিঠি দিয়েছে, যে চিঠি পেয়েছে আর যার কাছে চিঠি ছিল। তোমার বাসায় যারা আসা-যাওয়া করেন তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেয়ারের হাতল থেকে তুলে নিতে আমার অসুবিধা হয়নি। মিলিয়ে দেখলাম, চিঠিতে পাওয়া একজনের হাতের ছাপের সঙ্গে পরিমল ভদ্রের ছাপ মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ মাইকেলকে চিহ্নিত করা সম্ভব হল। কিন্তু চিনতে পারলেই তো শুধু হল না, আসামীকে খেলিয়ে তুলতে হবে। কাজেই একটা টোপ ফেললাম। ছকু রায়কে ডেকে পাঠানো হল থানায়। সে সাহায্য করতে রাজি হল। সন্ধ্যাবেলায় কি ভাবে চিঠি প্রাপ্তির কথা বলেছিল তোমরা শুনেছ। পরিমল ভদ্র ভয় পেয়ে গেলেন। নরেন নাগ অনেক কথা জানত—ধরিয়ে দিতে পারে বলেই তাকে খুন করতে হয়েছে। এখন আবার এক নতুন সমস্যা। ছকু রায় 'মাইকেল' নামটা উল্লেখ করতেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন তাঁর লেখা চিঠিগুলি সম্পর্কে। পুলিশের কাছে ওগুলি পেঁছালে, হাতের লেখার সূত্র ধরে তারা তাঁকে চিনে ফেলবে। সুতরাং ওগুলি উদ্ধার করা চাই। এর পরের কথা তো তুমি জানো। আমি আগে-ভাগেই ছকু রায়ের ঘরে লুকিয়েছিলাম। হিসাবমত যথাসময় মহাপ্রভু দেখা দিলেন! কিন্তু আর নয়। এবার একটু বিছানা নেওয়া দরকার। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে না নিলে শরীর ঝরঝরে হবে না।

কথা শেষ করে বাসব হাই তুলল।

দুলাল সেন চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করলেন।